অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

পঞ্চম খন্ড

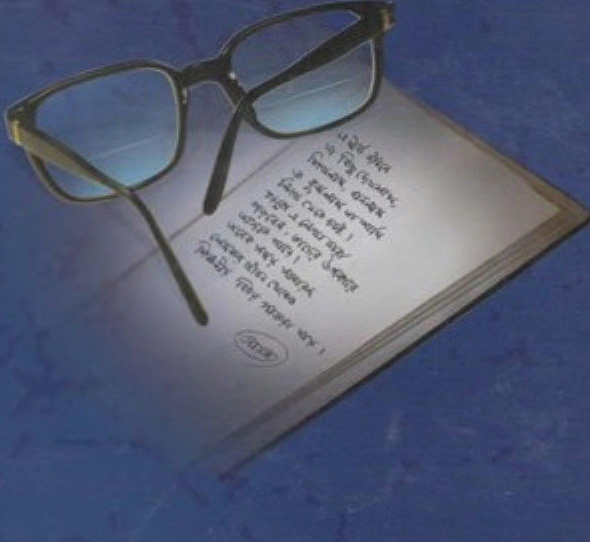

জীবনে যা দেখলাম

পঞ্চম খণ্ড

(১৯৭৫-১৯৮৪)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

পঞ্চম খণ্ড

(১৯৭৫-১৯৮৪)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

চতুর্থ মুদ্রণ : মে ২০১৪

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৫

জীবনে যা দেখলাম (পঞ্চম খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : পি এ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 43 0

সূচিপত্র

'৭৫ সালের বাদশাহ্ ফায়সাল প্রসঙ্গ ১৫
বাদশাহ্ খালেদের সাথে সাক্ষাৎকার ১৬
জর্ডান সফর ১৭
বাংলাদেশে আগস্ট বিপ্লবের পর আমার ভাবনা ২০
'৭৫-এর নভেম্বর বিপ্লব ২১
বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ২১
ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন সম্মেলন ২২
১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য ২৩
শেখ হাসিনার ক্ষমতা ত্যাগ ২৫
নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৫
নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার বিস্ময়কর আচরণ ২৬
শেখ হাসিনার পুনর্নির্বাচন দাবি ২৭
শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার সুযোগ ২৮
জামায়াতে ইসলামীর সংকট ২৮
এ আন্দোলনই আওয়ামী লীগের সৌভাগ্যের ভিত্তি ২৯
নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আরও কারণ ৩০
কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ভূমিকা ৩১
বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অভিমত ৩১
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে প্রেরিত রিপোর্ট ৩৩
জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ানস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রিপোর্ট ৩৪
বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেরিত চিঠি ৩৫
সেনাপ্রধানের চিঠি ৩৬
আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অভিনন্দনপত্র ৩৭
দেশীয় পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার স্বীকৃতি ৩৯
বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে আমার একান্ত সাক্ষাৎ ৪০
অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি ৪১
কেয়ারটেকার সরকারের সংজ্ঞা ৪১
বাংলাদেশের নির্বাচন ৪২
অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার ৪৩
জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবি উত্থাপন ৪৪
স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ৪৪
সংলাপে জামায়াতের লিখিত দাবি ৪৪

সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল	৪৫
যুগপৎ আন্দোলনের অবস্থা	৪৬
কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন	৪৬
নতুন সরকার গঠন	৪৭
আবার কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে আন্দোলন	৪৭
বিএনপি '৯৪ সালে দাবি মেনে নিলে	৪৮
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুফল	৪৯
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবকের কৃতিত্ব দাবি	৪৯
এ পদ্ধতি চালু না হলে	৫০
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ	৫০
বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য	৫১
দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর	৫১
শেখ হাসিনা দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন	৫২
প্রথম সর্বনাশ : বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি বানানো	৫৩
আওয়ামী শাসন সম্পর্কে নতুন ভোটারদের অজ্ঞতা	৫৪
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু	৫৪
শেখ হাসিনার ৩ দফা কর্মসূচি	৫৬
জাতির পিতা ইস্যু	৫৬
১৫ আগস্টের প্রতিক্রিয়া	৫৬
আওয়ামী লীগ কেন প্রতিবাদ করল না	৫৭
ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুজিব হত্যার বিচার দাবি	৫৭
শেখ হাসিনার দ্বিতীয় কর্মসূচি	৫৮
পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলি স্বত্ব চাই	৫৯
দ্বিতীয় সর্বনাশ : গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা	৬১
বাকশালী সংসদ	৬২
বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা	৬৩
সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা	৬৪
গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক	৬৪
রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ	৬৫
গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা	৬৫
তৃতীয় সর্বনাশ : ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র	৬৬
তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়	৬৭
শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন	৬৮
তথাকথিত 'মৌলবাদী' গালি	৬৮
ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ	৬৯
চতুর্থ সর্বনাশ : আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা	৬৯

পঞ্চম সর্বনাশ : জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ৭২
কয়েকটি উদাহরণ ৭২
জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা ৭৩
শেখ হাসিনার ভূমিকা ৭৪
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া ৭৫
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ৭৬
পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের নীলনকশা ৭৬
জোট সরকার পতনের আন্দোলন ৭৭
জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি ৭৮
পদত্যাগ দাবির যুক্তি ৭৯
আজব দেশপ্রেম ৮০
নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর শেখ হাসিনার ভূমিকা ৮০
এ অপপ্রচারের হীন উদ্দেশ্য ৮২
শেখ হাসিনার রাজনীতি কার স্বার্থে ৮২
১৯৭৫ সালের হজ্জ ৮৩
আন্দোলনের পুরনো সাথীদের সাথে ৮৩
নাগরিকত্ব বহালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি ৮৪
আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন লন্ডন ৮৫
সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন ৮৬
উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তাগণের পরিচিতি ৮৭
প্ল্যানারি সেশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৮৮
বক্তা ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু ৮৮
সম্মেলনের অতিথি বক্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ৯২
সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীসমূহ ৯৩
সম্মেলনের ফাঁকে দুলাভাই-এর সাথে পরামর্শ ৯৩
নাগরিকত্ব বহালের দরখাস্ত ৯৪
দেশে আসার NOC ৯৫
ইংল্যান্ডে আমার গোটা পরিবার একসাথে ৯৬
ছোট দু'ছেলের লেখাপড়া ৯৭
প্রবাস জীবনে সরকারি অনুমতির বিড়ম্বনা ৯৮
'৭৬ সালের হজ্জ ৯৯
একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা হলো ১০০
ঐ বছর হজ্জে বাংলাদেশ থেকে যারা গেলেন ১০১
'৭৬ সালের একটি ঘটনা ১০৩
বাদশাহ খালেদের সাথে জেনারেল জিয়ার সাক্ষাৎ ১০৪
শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর পথে সমস্যা ১০৪

তখনকার সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা ১০৪
'৭৭ সালের ঘটনাবলি ১০৫
'৭৭-এর জুন মাসে এক সমস্যায় পড়লাম ১০৫
একজন ছাত্রদরদি শিক্ষক ১০৬
স্ত্রী ও ছোট ছেলের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ১০৬
কুয়েতে দশ মাস ১০৭
আমাদের খাবার ব্যবস্থা ১০৮
ইস্তাম্বুলে ইফসু সম্মেলন ১০৮
ইস্তাম্বুলে পৌঁছলাম ১০৯
জনাব আবদুল খালেক ১০৯
সম্মেলনের অনুষ্ঠান ১১০
তুরস্কের উত্থান ও পতন ১১১
ইসলামী শক্তির উত্থান-পতন ১১৩
খিলাফত আন্দোলন ১১৪
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন ১১৫
পঞ্চম সংশোধনীর বিবরণ ১১৫
এ কয়টি সংশোধনের তাৎপর্য ১১৬
এ মৌলিক পরিবর্তনে বাদশাহ ফায়সালের অবদান ১১৬
বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ১১৭
লন্ডনে ফিরে গেলাম ১১৮
প্রেসিডেন্ট জিয়ার রেফারেন্ডাম ১১৯
রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ ১২০
হৃদয়বিদারক মৃত্যু ১২১
শোকের বেদনা আল্লাহর অজানা নয় ১২২
এ বৌমার জন্য কেন এত কাঁদলাম ১২২
আমি ওকে 'মা' ডাকতাম ১২৪
মুন্নী বড়ই কষ্ট ভোগ করে গেল ১২৬
মা মুন্নীর অবদান ১২৮
সন্তানদের প্রতি অবদান ১২৮
আমার বাড়ি নির্মাণে মা মুন্নীর অবদান ১৩০
মা মুন্নীর অন্তিম অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের আগমন ১৩০
সকল আত্মীয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা সে পেয়েছে ১৩১
মামূন-মুন্নী মানিকজোড় ১৩১
মা মুন্নী আন্দোলনের নেতাদের স্নেহধন্য ১৩২
মা মুন্নীর ইন্তিকাল ১৩৩
মুন্নীর একটি স্মৃতি ১৩৪

মা মুন্নীর অপূর্ণ সাধ ১৩৪
আইডিএল গঠন ১৩৫
কুয়েত থেকে সপরিবারে হজ্জ যাত্রা ১৩৬
রিয়াদ পৌঁছলাম ১৩৭
রিয়াদে এক সপ্তাহ ১৩৮
মক্কা শরীফে জামায়াত ও শিবিরের প্রতিনিধি ১৩৮
'৭৭ সালের হজ্জ ১৩৯
আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ১৩৯
কুয়েতে মাওলানা আযহারী ১৪১
মাওলানা আযহারীর সাথে সম্পর্কের সূচনা ১৪১
এক বহুমুখী প্রতিভা ১৪২
মাওলানা আযহারীর ইন্তিকাল ১৪৩
আযহারীর প্রিয় দাদা ১৪৪
খতীব মাওলানা আযহারী ১৪৫
প্রতিভার মূল্যায়ন ১৪৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুবারকবাদ ১৪৬
আনন্দ ও বিষাদ মিলেই দুনিয়ার জীবন ১৪৭
দেশে ফিরে আসার প্রস্তুতি ১৪৮
লন্ডনে দেশে ফেরার তৎপরতা ১৪৯
ঢাকা পৌঁছলাম ১৫০
বিদেশী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ১৫০
বিমান থেকে নীরবে বাড়িতে গমন ১৫২
আমার একান্ত সচিব হিসেবে আবদুল কাদের মোল্লা ১৫৩
সেক্রেটারি হিসেবে ফযলুর রহমান ১৫৩
জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ ১৫৪
নাগরিকত্ব বহালের জন্য পরামর্শ ১৫৪
ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ১৫৫
এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধুর কথা ১৫৬
মুজিব হত্যার পর প্রথম নির্বাচনী ঘোষণা ১৫৭
রমযানে প্রথম ই'তিকাফের সুযোগ ১৫৭
উক্ত ফর্মুলার সারকথা ১৫৯
বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হাসিলের দরখাস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত ১৬০
নাগরিকত্ব বহাল না হওয়া পর্যন্ত দেশে থাকার অনুমতি প্রার্থনা ১৬১
আমার বাড়িতে পুলিশ ইন্সপেক্টর ১৬১
প্রেসিডেন্টের সাথে আইডিএল নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ১৬২
সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ১৬২

জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ ১৬৩
আমার ভাষণের সারকথা ১৬৫
বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ১৬৫
জনগণের সাথে সম্পর্ক ১৬৫
বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি ১৬৫
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ১৬৬
জামায়াতের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৬৬
রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক ১৬৬
সরকারি দলের সাথে সম্পর্ক ১৬৭
সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নীতিমালা ১৬৮
জামায়াতে একটা সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হলো ১৬৯
মজলিসে শূরার বৈঠক ১৭০
মজলিসে শূরার অভিমতের যৌক্তিক ভিত্তি ১৭১
মাওলানা আবদুর রহীমকে চিঠি দিলাম ১৭১
জামায়াত তাদেরকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয় ১৭২
মাওলানা আবদুস্ সুব্হানের প্রত্যাবর্তন ১৭৩
আবদুল খালেক সাহেবের ইন্তিকাল ১৭৩
আবদুল খালেক সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ১৭৪
আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু ১৭৫
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৭৫
বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা ১৭৬
বিএনপি গঠন ১৭৬
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দল গঠনের পদ্ধতি ১৭৭
বিএনপি গঠনের পদ্ধতি ১৭৭
বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ১৭৮
জাতীয়তা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৯
খন্দকার আবদুল হামীদ ১৮০
বাংলাদেশের মানুষ কোন্ জাতি? ১৮১
প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে প্রথম সংসদ নির্বাচন ১৮২
বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ১৮৩
সংসদে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্নোত্তর ১৮৪
প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল ১৮৪
প্রেসিডেন্ট জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্র ১৮৫
নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সন্ধান ১৮৫
অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি ১৮৬
জামায়াতের কর্মপরিষদে কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ১৮৭

নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটি গঠন ১৮৮
জামায়াতে ইসলামীর ৭ দফা গণদাবি ১৮৮
বাংলাদেশের উপযোগী রাজনৈতিক পদ্ধতি ১৮৯
প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্র ১৮৯
বাংলাদেশের তখনকার পলিটিক্যাল সিস্টেম সম্পর্কে
জামায়াতে ইসলামীর অভিমত ১৯০
পলিটিক্যাল সিস্টেমের প্রস্তাবনা ১৯১
ব্রিটেনে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি ১৯১
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি ১৯২
প্রেসিডেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি কী হওয়া উচিত ১৯৩
নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলন ১৯৩
নাগরিকত্ব বহালের দাবির প্রতিক্রিয়া ১৯৪
রমনা গ্রিনে কর্মী সম্মেলন ১৯৪
৭ দফার বিস্তারিত দাবি ১৯৫
ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি ১৯৫
রমনা গ্রিনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী সম্মেলন ১৯৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে শিবিরের বিজয় ১৯৭
জামায়াত উৎখাতের হুমকি ১৯৮
২৬ মার্চের বিবরণ ১৯৮
প্রেসিডেন্ট জিয়ার অসতর্ক উচ্চারণ ২০০
জিয়া হত্যা পর্যন্ত জামায়াত-শিবির নির্যাতিত ২০০
জিয়া হত্যা এক মহারহস্য ২০১
জিয়া হত্যা মামুলি ঘটনা নয় ২০২
জিয়া হত্যা সম্পর্কে লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ পিএসসি'র বিবরণ ২০৩
জিয়া হত্যাকাণ্ড : চট্টগ্রাম সেনা-অভ্যুত্থান ২০৩
বন্দি জেনারেল ২০৬
কর্নেল আবদুল হামীদের তথ্যাবলির বিশ্লেষণ ২০৮
মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীরবিক্রম-এর পরিচয় ২০৯
জিয়া হত্যা সম্পর্কে মেজর জেনারেল মইনুল ২০৯
এরশাদের উচ্চাভিলাষ ও ক্রমোন্নতি ২১০
ছলনা ও চাতুর্য দিয়ে এরশাদ জিয়ার আস্থাভাজন হন ২১১
জিয়ার হত্যাকাণ্ড ও এরশাদের তৎপরতা ২১২
হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খালেদ ও মুজাফফর যা বলেন ২১২
মঞ্জুর হত্যা ছিল পরিকল্পিত ২১৩
আর্মির মুক্তিযোদ্ধা অফিসার নিধনের নীলনকশা ২১৩
এরশাদের প্রকাশ্য তৎপরতা ২১৪

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের বক্তব্যের বিশ্লেষণ ২১৬
ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্যোগ ২১৬
বই বিলির ব্যবস্থা হলো ২১৭
কমিটি গঠিত হলো ২১৯
ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ২২০
ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ ২২১
ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ : এক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ ২২২
কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের সদস্যবৃন্দ ২২৩
সম্মেলনে যারা বক্তব্য রাখেন ২২৪
ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মসূচি ২২৪
প্রাথমিক পাঁচ দফা কর্মসূচি ২২৫
ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতি ২২৬
সম্মেলনের সাফল্যে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম ২২৭
মাওলানা সাঈদীর বিশেষ বিবরণ ২২৭
ইত্তেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি ২২৯
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ল ২৩০
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীগণ ২৩০
নির্বাচনী প্রচারাভিযান ২৩১
নির্বাচনের প্রচারাভিযানে সহযোগিতার অনুরোধ ২৩২
নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের বক্তব্য ২৩২
নির্বাচনী ফলাফল ২৩৩
নির্বাচনে অন্য প্রার্থীদের হাল ২৩৩
নির্বাচনোত্তর সরকার গঠন ২৩৪
সেনাপ্রধানের রাজনীতি চর্চা ২৩৫
সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৩৯
বিচারপতি আবদুস সাত্তারের দুর্বলতার সুযোগ ২৪০
প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণ ২৪১
প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ২৪২
এরশাদের ক্ষমতা দখল ২৪২
প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ২৪৫
সেনা-অফিসারদের মধ্যে বিভেদ ২৪৬
এরশাদ সম্পর্কে কতক তথ্য ২৪৭
প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা ও জেনারেল মঞ্জুর হত্যা ২৪৮
জিয়া হত্যার জন্য দায়ী কে ২৪৯
মঞ্জুর হত্যার জন্য দায়ী কে ২৫১
অভিনেতার ভূমিকায় এরশাদ ২৫৩

ক্ষমতা সুসংহত করার কৌশল ২৫৪
সামরিক শাসন জারির কোন পরিস্থিতি ছিল না ২৫৬
কোন্ পরিস্থিতিতে সামরিক শাসনের প্রয়োজন হয় ২৫৬
এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২৫৭
ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন ২৫৮
হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা ২৫৮
হাফেযজী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ ২৫৯
এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ২৬০
ঘরোয়া রাজনীতি শুরু ২৬২
এসব দাবির যৌক্তিকতা ২৬২
এসব দাবির মারাত্মক পরিণতির কথা তারা ভাবেননি ২৬৩
জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ২৬৩
হ্যান্ডবিলের বক্তব্য ২৬৩
হ্যান্ডবিলের সুদূরপ্রসারী অবদান ২৬৪
একটি বিশেষ ঘটনা ২৬৫
এরশাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা ২৬৬
জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির তৎপরতা ২৬৭
জনসভায় প্রথম কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি ঘোষণা ২৬৮
আন্দোলনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ২৬৯
যুগপৎ আন্দোলন জোরদার হলো ২৬৯
অর্থবহ রাজনৈতিক সংলাপের আয়োজন ২৭০
সংলাপে ২৩ দলের একই রকম বক্তব্য প্রদান সম্ভব হলো না ২৭১
এরশাদ সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ ২৭২
সামরিক সরকারের সাথে সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য ২৭৩
জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতের প্রতিনিধি দল ২৭৯
১১ এপ্রিল জামায়াতের সাথে মন্ত্রীদের বৈঠক ২৮০
সংলাপে সবাই একসাথে না যাওয়ার পরিণাম ২৮০
এরশাদের দাপট ২৮১
নতুন করে যুগপৎ আন্দোলন ২৮১
'প্রেরণার বাতিঘর' শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা ২৮২
শাহাদাতের ঘটনা ২৮২
আমি তখন সিলেটে সুধী সমাবেশে ২৮৩
শহীদের জানাযা ২৮৪
বিধবা মায়ের কোলে শহীদের লাশ ২৮৫
শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া ২৮৫
ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে ২৮৬

'শহীদ আবদুল মালেক' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে ২৮৯
ইরান বিপ্লব ২৯১
জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা সম্পর্কে মাওলানার ব্যাখ্যা ২৯২
ইরান বিপ্লব কি শিয়া বিপ্লব? ২৯৩
শিয়াদের সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা ২৯৩
ইরান বিপ্লবে পরাশক্তির প্রতিক্রিয়া ২৯৫
বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের প্রতিক্রিয়া ২৯৫
ইসলামী নেতৃবৃন্দের ইরান সফর ২৯৬
ইরান বিপ্লবের পর্যালোচনা ২৯৯
পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি ৩০৪
হাফিযা আসমা এমপি'র পুস্তক থেকে ৩০৫
ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান ৩০৫
মেয়ের বর্ণনায় ইরানী বিপ্লব ৩০৬
মহিলা অঙ্গনে ইরান বিপ্লবের প্রভাব ৩০৭
কে. এম. আমীনুল হকের ইরান সফর ৩০৮
ইরান বিপ্লবের প্রধান তথ্যাবলি ৩১১
ইরান বিপ্লব কি ইসলামী বিপ্লব? ৩১১
ইরান বিপ্লবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ৩১২
আল্লাহর সাহায্যের কয়েকটি উদাহরণ ৩১৩
ইরাক-ইরান যুদ্ধের সূচনা ৩১৪
ইরানে সাদ্দামের হামলা ৩১৫
সাদ্দামের কুয়েত দখল ৩১৬
মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্গতিতে সাদ্দামের অবদান ৩১৭
আমেরিকার কুয়েত উদ্ধারকালে মুসলিম উম্মাহর আবেগ ৩১৮
আমেরিকার আফগানিস্তান দখল ৩১৯
টুইন টাওয়ার গলে যেতে দেখলাম ৩২১
এসব প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ৩২১
তালেবান সরকারের বক্তব্য ৩২২
আফগানিস্তানে পুতুল সরকারের ভবিষ্যৎ ৩২৩
তালেবান সরকার ৩২৩
তালেবান সরকারের মূল্যায়ন ৩২৫
আফগানিস্তানে ইসলামের ভবিষ্যৎ ৩২৭
রাব্বানীদের বাহিনী আগেও ব্যর্থ হয়েছে, আবারও হবে ৩২৭
পাকিস্তানই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো ৩২৭
বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ভাবনার বিষয় ৩২৮

১৭৭.

'৭৫ সালের বাদশাহ্ ফায়সাল প্রসঙ্গ

১৯৭৫ সালের আলোচনায় দু'টি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে শেখ মুজিব হত্যা সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম' চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাদশাহ ফায়সাল নিহত হওয়ার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হলেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এখন আলোচনা করছি।

আমি তখন লন্ডনে। বাদশাহ্ ফায়সাল ক্ষমতাসীন থাকাকালে প্রিন্স খালেদ ক্রাউন-প্রিন্স পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি বাদশাহ্ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বাদশাহ্ ফায়সালের নীতি আমার ভালোভাবেই জানা ছিল। বাদশাহ্ খালেদ বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর ভাইয়ের পলিসিতে কোন পরিবর্তন করবেন কি-না তা জানার জন্য সৌদি আরব যাওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে উল্লেখ থাকায় বাদশাহ্ ফায়সালের আমলে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ নীতির ব্যাপারে বাদশাহ্ খালেদের সিদ্ধান্ত জানার উদ্দেশ্যে ১১ মে (১৯৭৫) সৌদি আরব গেলাম।

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বাদশাহ্ ফায়সালের মন্ত্রিসভার এককালীন মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ্ জামজুমের সাথে দেখা করলাম। তিনি রাজধানী রিয়াদে যোগাযোগ করে জানালেন, বাদশাহ্ খালেদ সারা দেশে বাইআত গ্রহণের জন্য সফরে যাচ্ছেন। সফরের এক পর্যায়ে তিনি জেদ্দায় আসবেন। ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি চিফ প্রটোকল অফিসার জনাব আবদুল ওয়াহাবকে জানিয়ে রাখলেন, যাতে যথাসময়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে বাদশাহ্ ফায়সালের সাথে আমার দু'বার সাক্ষাতের সময় তিনি দোভাষীর দায়িত্বও পালন করায় আমার কথা তাঁর মনে আছে বলেও শায়খ জামজুমকে বললেন।

জানা গেল, জুনের শেষ সপ্তাহে বাদশাহ্ জেদ্দায় পৌঁছবেন। হিসাব করে দেখলাম, পাঁচ সপ্তাহ্ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়টা মক্কা ও মদীনা শরীফে এক সপ্তাহ্ করে থেকে রাজধানী রিয়াদ ও শীতকালীন রাজধানী তায়েফ সফর করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে তখনও সৌদি আরবে বাংলাদেশীদের চাকরি উপলক্ষে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। শুধু হজ্জের সময়ে মিসর দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশী হাজীদের যাওয়ার ব্যবস্থা হতো।

কিন্তু মক্কা, জেদ্দা, মদীনা, রিয়াদ, তায়েফ ও অন্যান্য সৌদি শহরে পাকিস্তানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার লোক বেশ সংখ্যায় চাকরিরত ছিল। এসব পেশায় ইতঃপূর্বে মিসরীয়রাই বেশি ছিল। মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক জামাল নাসেরের আরব-জাতীয়তাবাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে মিসরীয়দের স্থানে সৌদি সরকার পাকিস্তানিদের অগ্রাধিকার দেয়। পাকিস্তানি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষকদের মধ্যে যারা

জামায়াতে ইসলামীর লোক ছিলেন তারা সংগঠিত হয়ে দীনী চর্চা করতেন। আমি সৌদি আরবে গেলে তারা আমাকে তাদের কর্মী বৈঠকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিতেন। সাংগঠনিক ও তারবিয়্যাতী কর্মসূচিতে আমাকে পেলে তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হতেন। আমিও দীনী কাজ পেয়ে খুশি হয়ে তাদের সময় দিতাম।

আমার এ সফরে পাঁচ সপ্তাহ সময় বেকার আছি জানতে পেরে তারা মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, রিয়াদ ও তায়েফে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে আমাকে রীতিমতো কর্মব্যস্ত রাখলেন। তা ছাড়া মক্কায় রাবেতা আলমে ইসলামী ও রিয়াদে ওয়ামী (WAMY- World Assembly of Muslim Youth) নামক সংস্থার দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ এবং বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগের সুযোগও পেলাম।

বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাৎকার

২৬ জুন (১৯৭৫) জেদ্দা রাজপ্রাসাদে বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। আমি আরও দু'জন বাংলাদেশী দীনী ভাইকে সাথে নিয়ে গেলাম। তাদের একজন মরহুম ব্যারিস্টার আখতারুদ্দীন আহমদ। তিনি তখন সৌদি এয়ারলাইন্সে আইন উপদেষ্টা হিসেবে চাকরিরত। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের শাসনামলে বেসিক ডেমোক্রেসি সিস্টেমে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে জামায়াতের যে চারজন পাকিস্তান পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার সাহেব অন্যতম। তাদের মধ্যে জনাব আব্বাস আলী খান গ্রুপ-লিডার এবং ব্যারিস্টার সাহেব সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করতেন। অপর দু'জন ছিলেন জনাব শামসুর রহমান ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময়ে আরেকজন ছিলেন ঢাকাস্থ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস চ্যান্সেলর মরহুম ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ। তখন তিনি জেদ্দায় কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি মক্কায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছলে চিফ প্রটোকল অফিসার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেলেন। আমরা সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে হাত বাড়ালেন। আমরা মুসাফাহা করলাম। তিনিই ইশারায় বসতে বললেন। প্রটোকল অফিসার আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, এঁরা বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি। তিনি আমার পরিচয় দিয়ে জানালেন, ইতঃপূর্বে দু'বার আমি শহীদ বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি আমার দু'সাথীর পরিচয় দিলাম। তাঁরা দু'জনই সৌদি আরবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন শুনে বাদশাহ খুশি হলেন।

আমি বাদশাহ ফায়সালের সাথে আলোচনার সারকথা তাঁকে অবহিত করলাম এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে শহীদ বাদশাহর নীতি উল্লেখ করে বললাম, বাংলাদেশে সৌদি দূতাবাস না থাকায় হজ্জযাত্রীদের হজ্জে পাঠাতে বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত কঠিন

সমস্যায় পড়তে হয়। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার সরকার কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে সরকারকে বাধ্য করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানার জন্যই আমরা হাজির হয়েছি।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার মরহুম ভাইয়ের গৃহীত পলিসিকেই আমি সঠিক মনে করি। আপনারা যে কূটনৈতিক চাপের কথা বলছেন, আমাদের এ পলিসির তা-ই উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ যদি সৌদি আরবের স্বীকৃতি সত্যিই জরুরি মনে করে, তাহলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করাও জরুরি মনে করবে। আমরা সে অপেক্ষায়ই আছি।

আমি বললাম, আমরা আশঙ্কা করি যে, চীন ও সৌদি আরব স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশে ভারত আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা করতে পারে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে ভারত যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে আধিপত্য বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মযবুত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, তা ভারত চায় না। ভারত বাংলাদেশকে যেসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে তা থেকে ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

তিনি বললেন, তোমাদের সরকার যদি স্বাধীনচেতা না হয় তাহলে বাইরের কোন শক্তি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। সরকার যদি জনগণকে সাথে নিয়ে বলিষ্ঠ মনোভাব পোষণ করে, তাহলে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

আমাদেরকে সাক্ষাতের সময় দান করার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় হলাম।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা তিন জন বলাবলি করলাম, জনগণ তো শেখ মুজিবের সাথে নেই। তাহলে তাঁর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কেমন করে সম্ভব হবে?

সৌদি আরবে এ সফরের আসল উদ্দেশ্যই ছিল বাদশাহর সাথে দেখা করা। তাই এর কয়েকদিন পরই লন্ডন যাওয়ার পথে জর্ডান গেলাম। রাজধানী আম্মানে চার-পাঁচ দিন থেকে ৭ জুলাই লন্ডন পৌঁছলাম।

জর্ডান সফর

রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনের বিবরণে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সেখানে জর্ডানের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এলেন তিনি পুরনো বন্ধু শায়খ কামিল আল-শরীফ। তিনি পাকিস্তানে জর্ডানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে আমি পাকিস্তানে আটকা পড়ার সময় ইসলামাবাদে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অবশ্য ১৯৭১ সালে ঢাকা আসায় তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাঁরই উদ্যোগে ইসলামাবাদে যোগাযোগ হয়।

১৯৭৪ সালে রাবেতার সম্মেলনে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, ফিলিস্তিনকে ইসরাঈলের দখল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে তিনি জর্ডানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এ উদ্দেশ্যে আল-কুদস্ কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি একটি

প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও ঐ আন্দোলনে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি রাবেতা'র সম্মেলনে আমাকে দাওয়াত দিলেন জর্ডান যাওয়ার জন্য। সে দাওয়াতে এ সময় সাড়া দিয়ে তাঁকে জানালাম। তিনি জানালেন, আম্মান বিমানবন্দরে এলে ভিসার ব্যবস্থা হবে।

২ জুলাই আম্মান পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে কামিল আল-শরীফ ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছেই পৌঁছে গেলেন। তিনি ইতঃপূর্বে জর্ডান সরকারের আওকাফ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সর্বমহলে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি। আম্মানের একটি হোটেলে তাঁর মেহমান হিসেবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

তখন জর্ডানের বাদশাহ ছিলেন হোসাইন। তাঁর দাদা শরীফ হোসাইন বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহ ছিলেন। তিনি সৌদি আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীযের ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তুর্কি খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসক হিসেবে টিকে থাকেন। বাদশাহ আবদুল আযীয ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের সহযোগিতায় ইসলামী বিপ্লব সাধন করে বাদশাহ শরীফ হোসাইনকে উৎখাত করেন এবং সৌদি আরব নামে নতুনভাবে রাষ্ট্র কায়েম করেন। ইংরেজরা শরীফ হোসাইনের আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে কিছু বিরান এলাকা ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ নিয়ে ট্রান্স-জর্ডান নামে একটি ছোট্ট রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। বর্তমান বাদশাহ (২০০৪) আবদুল্লাহ বাদশাহ হোসাইনে ছেলে।

ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ আরব মুসলমানকে তাদের বসত-বাড়ি ও জমি-জমা থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করে সেখানে 'ইসরাঈল' নামে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করে। বিতাড়িত মুসলমানরা নিকটবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে জর্ডান ও লেবাননে আশ্রয় নেয়। জর্ডানে মুহাজির কলোনি নামে কয়েকটি ফিলিস্তিনি বসতি আমাকে দেখানো হয়। সরকার সাধ্যমতো তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু এত লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি। তাই লেবানন ও জর্ডান থেকে বহু ফিলিস্তিনি বিভিন্ন আরব দেশে চাকরির তালাশে যেতে বাধ্য হয়েছে।

আমি কামিল আল-শরীফকে জিজ্ঞেস করলাম, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের নেতা ইয়াসির আরাফাত সেক্যুলার রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন করছেন বলে বারবার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর সমর্থনও চান। এ ঘোষণা কি সমর্থন পাবে? তিনি এ আন্দোলনের ইতিকথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "ফিলিস্তিনের জনগণ ইসরাঈল রাষ্ট্রকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিল। আল-কুদস্ কমিটি মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিল। এ বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য একটি ডেলিগেশন সৌদি বাদশাহ ফায়সালের নিকট গেল।

আমাকে ডেলিগেশনের লিডারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। বাদশাহ্ ফায়সাল অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার বক্তব্য শোনার পর বললেন, আমার নিকট তোমাদেরকে দেওয়ার মতো অস্ত্র নেই। তোমরা আমার কাছ থেকে যত টাকা প্রয়োজন নিতে পার। অস্ত্র কোথা থেকে কিনবে তা তোমাদের ব্যাপার। তবে তোমরা আমেরিকা থেকে পাবে না। ইসরাঈলের বিরোধীদের নিকট তারা অস্ত্র বিক্রয় করবে না। রাশিয়ার কাছে যেতে পার।

আমরা রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে যোগাযোগ করলাম। তারা বলল, আপনাদের তো আমরা চিনি না। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আমরা অমুক-অমুককে চিনি। তাদের আসতে বলুন। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তারা যাদের নাম বলেছে, তারা বামপন্থি নেতা। এর মানে হলো, তারা রাশিয়ার নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্ট হিসেবে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রচারক। আল-কুদস্ কমিটির অধিকাংশই ইসলামপন্থি ও অন্যরা স্বাধীনতাকামী। এর মধ্যে একজনও বামপন্থি নন। কারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যারা বিবেচ্য তাদের কেউ বামপন্থি নন।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) লিডার পদের জন্য সাহসী ও ত্যাগী মনোভাবসম্পন্ন নেতা হিসেবে ইয়াসির আরাফাতকে সবাই সমর্থন করল। ইসলামপন্থিরাও আরাফাতকে অপছন্দ করেনি। PLO গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাদের অস্ত্রের অপরিহার্যতা বিবেচেনা করে আমরা বাধ্য হয়েই রাশিয়ার এজেন্টদের মাধ্যমেই অস্ত্র সংগ্রহ করলাম। এভাবেই PLO-এর নেতৃত্বে বামপন্থিরা গুরুত্বপূর্ণ পজিশন পেয়ে গেল। তাদেরই চাপে ইয়াসির আরাফাত বারবার সেক্যুলার রাষ্ট্র কয়েমের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ইয়াসির আরাফাত ইসলামপন্থিও ছিলেন না, বামপন্থিও ছিলেন না।"

এ বিবরণ শুনে আমি বললাম, বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েম হওয়ার আশঙ্কায় মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থিদের কতক লোকের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা চলছিল। আমি এ চিন্তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করায় তারা আর অগ্রসর হয়নি। তিনি মন্তব্য করলেন, ইসলামপন্থিদের কখনও এ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমার মেযবান কামিল আল-শরীফ ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সংগঠনভুক্ত না হলেও ইখওয়ানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাঁর অফিসেই ইখওয়ান নেতাদের সমবেত করলেন। আমার ধারণা ছিল, ইখওয়ানীদের সংগঠন সকল আরব দেশেই আছে বটে; কিন্তু কোন দেশেই প্রকাশ্য তৎপরতার সুযোগ দেওয়া হয় না। আম্মানে ইখওয়ানী নেতাদের কাছ থেকে জানা গেল, একমাত্র জর্ডানেই ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রকাশ্যে কাজ করছে এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। জর্ডানে রাজতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দলীয় ভিত্তিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। কুয়েতে পার্লামেন্ট নির্বাচন হলেও রাজনৈতিক-দলীয় ভিত্তিতে কোন তৎপরতার অনুমতি নেই। ঐ সময় সুদানে জেনারেল নুমেরীর স্বৈরশাসন চলছিল। বর্তমান (২০০৪ সালে)

সুদানে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলেও ইখওয়ানুল মুসলিমূন সরকারে শামিল নেই। তবে ইখওয়ান প্রকাশ্য তৎপরতা চালাচ্ছে।

আম্মানে কয়েকদিন ইখওয়ানী ভাইয়েরা ছাড়াও কামিল আল-শরীফের উদ্যোগে অনেক বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। সে দেশের উল্লেখযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের নিকট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ পেলাম।

বাংলাদেশে আগস্ট বিপ্লবের পর আমার ভাবনা

আগস্ট বিপ্লবের পর আমার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের অবসান হতে পারে। জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়ে যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদের সাথে ছাত্রজীবন থেকে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক জীবনেও যা বহাল রয়েছে তাতে আশা করা যায়, দেশে ফিরে যাওয়ার পথে যে বাধা রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে।

মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে আমার চাচা মরহুম শফীকুল ইসলাম ও খন্দকার মুশতাক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চাচার বন্ধু হিসেবে তাঁকেও আমি চাচা ডাকতাম। তারা দু'জনই বয়সে আমার মাত্র তিন বছরের বড় ছিলেন। খন্দকার সাহেবও আমাকে আদর করে 'চাচা মিয়া' বলেই ডাকতেন। তবে 'তুমি' সম্বোধনই করতেন।

আমি তাঁকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। তাতে অনেক পরামর্শ ছিল। সর্বশেষে আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কথাও ছিল। চিঠি ডাকে পাঠানোর পূর্বেই বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে কর্মরত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক অফিসার থেকে জানা গেল, জনৈক মেজর প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে লন্ডন এসেছেন। আমার চিঠিটি তাঁর হাতে দিলে দু-তিন দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দিলেন।

আমি ঐ চিঠির জবাবের আশায় ছিলাম। মুশতাক সাহেব নভেম্বরের ৫ তারিখ ক্ষমতা হারানোর পর মনে করলাম, হয়তো আমার চিঠির জবাব দেওয়ার সময়-সুযোগ পাননি। '৭৮ সালে দেশে এসে তাঁর আগামসীহ লেনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারলাম, আমার চিঠি তাঁকে দেওয়াই হয়নি।

এক বছর আগে '৭৪ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে লন্ডনে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বলেছিলেন, যদি দেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যে ইসলাম প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমি তাঁর পরামর্শ বিবেচনা করছিলাম। আগস্ট বিপ্লবের পর সে পরামর্শ আর বিবেচনাযোগ্য মনে করিনি। তাছাড়া আমি প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিদেশ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করছিলাম তা আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশে ফিরে আসার সুযোগ না পেলেও আমি হয়তো এ কাজেই বাকি জীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনবোধ করতাম।

'৭৫-এর নভেম্বর বিপ্লব

লন্ডনে ৪ নভেম্বরের পত্রিকায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী-প্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়। আগস্ট বিপ্লবের নেতারা ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই বিদেশে চলে গেছেন—এ খবরও একই সাথে প্রকাশিত হয়। আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আগস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে এটা প্রতিবিপ্লব। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, ভারতপন্থিরাই এ বিপ্লব সাধন করেছে। তাদের পেছনে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা আছে বলেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। লন্ডনে আওয়ামী লীগের সমর্থক মহলে কিছুটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি রীতিমতো উদ্বেগ অনুভব করি।

চীন ও সৌদি আরব তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। আমি সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাই। সেই সাথে এ আশঙ্কাও প্রকাশ করি—ভারত যাতে সরাসরি বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেদিকেও যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে সম্বোধন করে একটি আবেদনপত্র লন্ডনস্থ চীনা দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূতের হাতে দিয়ে আসি। সে আবেদনপত্রেও ভারতের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যে কয়টি বাংলাদেশকে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে, সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটও ভারতের আধিপত্যের শঙ্কা প্রকাশ করে আবেদন জানাই। আমার আবেদনের মূল্য থাকুক আর না-ই থাকুক এর চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য না থাকায় আবেদন জানিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করেছি। এরপর কয়েক দিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন খবর না পেয়ে চরম উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছি। ৮ নভেম্বরের পত্রিকায় জেনারেল জিয়াউর রহমান আবার সেনাপ্রধান পদে বহাল হওয়া ও খালেদ মোশাররফের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে বিশেষ করে সিপাহি-জনতার সম্মিলিত মিছিলের খবরে ধারণা করলাম, বড় বিপদ কেটে গেছে। এরপর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই জানা ছিল না। তাই উদ্বেগমুক্ত মন নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হলাম।

বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ

লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাস থেকে জানা গেল, সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু শাসনতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বাতিল না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে না। এ কথা জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যখনই সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় ইসলামকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ব্যক্তি যেন নিয়োগ পান সে উদ্দেশ্যে লবি করার জন্য সৌদি আরবে গেলাম। লবি করার জন্য আমার নিকট প্রধান ব্যক্তি শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম, যিনি ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে আমাকে বাদশাহ ফায়সালের কাছে নিয়ে যান। আমি তার সঙ্গে দেখা করে আমার উদ্দেশ্য তার নিকট ব্যক্ত করলাম। তাকে

জানালাম, গত বছর জেদ্দায় অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইসলামী এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতীবের সাথে পরিচয় হয়। আমার ধারণা, এ মানের লোক বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে সৌদি আরবের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ইসলামী মহল অত্যন্ত উৎসাহবোধ করবে। তিনি বললেন, আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি, দু-এক দিন পর আবার আসেন। আমি আরও কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা যে, এ বিষয়ে তারা সাহায্য করতে পারেন। দু'দিন পর শায়খ জামজুমের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, ফুয়াদ আল খতীব এখনও এম্বাসেডর র‍্যাংকের নিচে আছেন। তবে আমি যে মানের লোক বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কামনা করি, ফুয়াদ আল খতীব ঐ মানের লোক বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বাংলাদেশ সরকার তখন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র সংশোধন করেনি বলে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগে বিলম্ব হবে ভেবে আমি এ ব্যাপারে আর বেশি লবি করা প্রয়োজন মনে করলাম না এবং আর কারো কাছ থেকে বিকল্প নামও যোগাড় করা গেল না। যাদের কাছে লবি করার জন্য গেলাম তারাও এ কথাই বললেন যে, সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের শর্ত পূরণ হলে তারা এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন; এর আগে লবি করে কোন লাভ নেই। তাই আমি লন্ডনে ফিরে গেলাম।

ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন সম্মেলন

ইংল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায় দু-তিন মাস বন্ধ থাকে তখন সেখানকার ইসলামী ও অন্য সকল সংগঠন এবং সংস্থা ব্যাপকভাবে সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। ইতঃপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের সম্মেলনে আমাকে অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৭৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে এ জাতীয় তিনটি সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে যোগদান করি। ১৮ জুলাই ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে FOSIS (Federation of Students Islamic Societies)-এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই 'ইসলামিক সোসাইটি' নামে ছাত্রদের সংগঠন আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এসব সংগঠনের জন্য কিছু টাকাও বরাদ্দ করা হয়। এ রকম ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটিও আছে, যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এ সকল ইসলামী সোসাইটির সমন্বয়ে FOSIS গঠিত। প্রতি বছরই এরা বার্ষিক সম্মেলন করে থাকে। এসব সম্মেলন সাধারণত দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইসলামিক পলিটিক্যাল সিস্টেম সম্পর্কে বক্তৃতার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। ৪৫ মিনিট বক্তব্য রাখি এবং ১৫ মিনিট শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিই।

৯ আগস্ট UMO (United Muslim Organisation) লন্ডনে এক হোটেলের মিলনায়তনে সম্মেলনের আয়োজন করে। অতিথি বক্তা হিসেবে আমিও সেখানে আধঘণ্টা বক্তব্য রাখি। সকল বক্তব্যেরই মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'মুসলিম উম্মাহর

ঐক্য'। ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট Leicester-এ ইউ.কে. ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে আমি অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করি। লিস্টার লন্ডন থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি বহুমুখী ইসলামী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের অন্যতম নায়েবে আমীর এবং মাওলানা মওদূদী (র) প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'তরজুমানুল কুরআন' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক প্রফেসর খুরশিদ আহমদের উদ্যোগে এ বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এ প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেই অনেক ইসলামী সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউ.কে. ইসলামিক মিশন ষাটের দশকে পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম উদ্যোক্তা পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাওলানা কুরবান আলী, যিনি তখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি কোর্সে অধ্যয়নরত। ইউ. কে. ইসলামিক মিশনের উক্ত সম্মেলনে পূর্ণ তিন দিনই আমি উপস্থিত ছিলাম। অতিথি বক্তা হিসেবে একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখা ছাড়াও সম্মেলনের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে আমি শরীক ছিলাম। সম্মেলনের অধিকাংশ ডেলিগেট পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রসংঘের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনের মতোই ঐ সম্মেলনের তৎপরতা দেখা যায়।

১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য

১৯৭৫ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আরও কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। কারণ আগস্ট বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এর ফলে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি সেক্যুলার ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যেভাবে গড়তে চেয়েছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে 'বাকশাল' নামে যে একনায়কত্ব কায়েম করা হয়েছিল তাও উৎখাত হয়ে যায়। জনগণের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমর্যাদা জনগণের মন থেকে একদম মুছে যায়। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এত কমে যায় যে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করেনি। আমার এ ধারণাই ছিল যে, আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলকে জনগণ ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় আসতে দেবে না। যদি এ অবস্থা বহাল থাকত তাহলে ১৯৭৫ সালের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করা যেত।

কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে আওয়ামী লীগ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দলকে এতটা অগ্রসর করতে সক্ষম হয় যে, ১৯৯৬ সালের জুনের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পায়।

আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালে আগস্ট বিপ্লবের ফলে যে আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, সে ধারা পরিবর্তন করে দেশকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে উৎখাত করে আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদ চালু করার চেষ্টা করে এবং শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই তাদের আদর্শ বলে দাপটের সাথে ঘোষণা করে। যদি তাদের ক্ষমতায় কুলাতো তাহলে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীকে বাতিল করে আবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করত। আওয়ামী লীগের ঐ পাঁচ বছরের শাসনামলে আদর্শিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের এমন সর্বনাশ করা হয়েছে, যার প্রতিকার কত বছরে সম্ভব হবে তা অনুমান করাও কঠিন।

আগস্ট বিপ্লবের আসল লক্ষ্য ছিল স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে গণতন্ত্র বহাল করা ও বাংলাদেশকে ভারতের আধিপত্যমুক্ত একটি সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মুজিব হত্যার পর মেজর ডালিম রেডিওতে বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করলেও এটা বিপ্লবের নায়কদের আসল উদ্দেশ্য ছিল না বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর কোন সাধ্য তাদের ছিল না। তবে উপরিউক্ত দু'টি উদ্দেশ্য যে তাদের ছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতিবিপ্লবের কারণে পুরো তিন মাসও ক্ষমতায় না থাকার কারণে তারা লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হতে পারেননি।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ায় দেশকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ বছরে যা কিছু করা হয়েছে তা আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য শেখ হাসিনা সরকার যেসব অপতৎপরতা চালিয়েছে, সে সম্পর্কে ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বে দৈনিক ইনকিলাবে আমার লেখা পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের মূল শিরোনাম ছিল 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন'। নির্বাচনের পর ঐ প্রবন্ধগুলো পুস্তিকাকারে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ সংসদে অনুপস্থিত থাকায় তাদের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, আওয়ামী লীগের রাজনীতি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে শেখ মুজিবকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে 'জাতির পিতা', 'মহান রাষ্ট্রনায়ক' ও 'জাতীয় হিরো' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। জনগণ '৭৫-এর যে ১৫ আগস্টে ঘৃণ্য কুশাসন থেকে মুক্তির আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করেছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে সে দিবসকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে ও মাসব্যাপী শোকের কর্মসূচি পালন করেছে। গোটা জাতি তাদের এ ধৃষ্টতা স্তম্ভিত হয়ে অবলোকন করেছে।

আওয়ামী লীগের একমাত্র মূলধন শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব। তাই এই ব্যক্তিত্বকে জাতির পিতার আসনে বহাল রাখতে না পারলে এবং তার ভাবমূর্তিকে জনগণের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে না পারলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অপরদিকে জনগণ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে গণতন্ত্রের চরম দুশমন ও ভারতের আধিপত্যবাদের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে উপলব্ধি না করলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎও অন্ধকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৭৯.

শেখ হাসিনার ক্ষমতা ত্যাগ

২০০১ সালের জুন মাসে কেয়ারটেকার সরকারের আইন থাকায় শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখানোর সুযোগ পাওয়ায় তিনি ক্ষমতার এমন চরম স্বাদ গ্রহণ করেছেন যে, ক্ষমতা ত্যাগ করা তার জন্য কষ্টকর ছিল। বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা ত্যাগ করার কথা সরকারিভাবে জানানোর জন্য বঙ্গভবন কর্তৃপক্ষ শেখ হাসিনার মর্জিমতো তিন বার সময় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন, যার ফলে তিনি এক দিন বিলম্ব করে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। ক্ষমতা ত্যাগ করার পরও যাতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (গণভবন) ত্যাগ করতে না হয়, সেজন্য ক্যাবিনেটের মাধ্যমে গণভবনকে তার ব্যক্তিগত নামে বরাদ্দ করা হয়। দুনিয়ার কোন দেশে কোন সরকারপ্রধান এমন নির্লজ্জ কর্ম করেছে বলে কোন উদাহরণ নেই। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনকে ব্যক্তিগত ভবন হিসেবে গ্রহণ করতে তার কোন লজ্জাবোধও হয়নি; বরং তিনি সদর্পে ঘোষণা করলেন, আমি যতদিন রাজনীতি করব, গণভবনেই থাকব। অবশ্য তার দর্প কিছুদিন পরই চূর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে গণভবন ত্যাগ করতে হয়।

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও যাতে তিনি পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারেন, সে মহান (!) উদ্দেশ্যে তার ক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি সচিবালয়, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে তার আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। তার ধারণা ছিল, এ সেট-আপ পরিবর্তন করার ইখতিয়ার কেয়ারটেকার সরকারের নেই; শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠানই কেয়ারটেকার সরকারের একমাত্র দায়িত্ব। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান শাসনতন্ত্রে কেয়ারটেকার সরকারকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাদের শেখ হাসিনার মর্জিমতো বহাল রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচন কিছুতেই সম্ভব নয়—সে কথা অনুভব করতে তিনি সক্ষম ছিলেন। যেহেতু নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, সেহেতু তিনি ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সচিবালয়ের প্রধান কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে বদলির

নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনা অস্থির হয়ে এর প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান সিভিল ক্যু করে বসেছেন। এটা তার দায়িত্ব ছিল না। সরকারপ্রধান তার এসব বেহুদা কথার কোন প্রতিবাদ করেননি; তিনি নীরবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যা করণীয় তা-ই করতে থাকেন।

সচিবালয়ের একদল সিনিয়র সচিব প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করে সচিবদের এ ধরনের ব্যাপক বদলির প্রতিবাদ জানান। প্রেসিডেন্ট তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সরকারপ্রধান যা কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন, তাতে আমার হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই সম্ভব নয়—এটা তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বিচারপতি লতিফুর রহমান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ কঠোর পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন। দেশ-বিদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে জোর সার্টিফিকেট দেন। নির্বাচনের দিন শেখ হাসিনাও নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার বিস্ময়কর আচরণ

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই শেখ হাসিনা এ ফলাফলকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন এবং সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলীয় এমপিদের অনুরোধে শপথ নিতে বাধ্য হন। তিনি সর্বপ্রথম কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে জঘন্য ভাষায় অভিযোগ করেন। এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বে সহায়তা করার অভিযোগ তোলেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে মস্ত বড় ভুল করেছেন বলে আক্ষেপ করেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ এত প্রচণ্ড ছিল যে, বারবার তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে তাঁকে বিব্রত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন অত্যন্ত শালীন ভাষায় শেখ হাসিনার সকল অভিযোগের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান। সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে এতসব অভিযোগ করেও শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেননি। তিনি নির্বাচন কমিশনকে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। অথচ রাষ্ট্রপতি তারই সুপারিশে জনাব এমএ সাঈদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব এমএ সাঈদকে আওয়ামী লীগপন্থি বলে চারদলীয় জোট আপত্তি উত্থাপন করে এবং এ নিয়োগের বিরুদ্ধে হরতাল পর্যন্ত পালন করে। এর কিছুদিন পর শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধানকে নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ করেন। এভাবে তিনি নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনরত সকল মহলকে দোষী সাব্যস্ত করেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করার ষড়যন্ত্রে সবাই লিপ্ত ছিলেন।

শেখ হাসিনার পুনর্নির্বাচন দাবি

শেখ হাসিনা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে সরকারি সকল মহলকে পক্ষপাতিত্ব করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করে এ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট দাবি জানান। শেখ হাসিনাকে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করা যায়, সকল সরকারি মহলকে পক্ষপাতদুষ্ট ঘোষণা করে তিনি আরেকটি নির্বাচন কার কাছে আশা করেন? আসল কথা হলো, নির্বাচনে পরাজয় তিনি কোন অবস্থাতেই মেনে নেবেন না। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সূক্ষ্ম এবং ২০০১-এর নির্বাচনে স্থূল কারচুপি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। ১৯৯৬ সালে তার দল অনেক আসনে বিজয়ী হওয়ার কারণে একমাত্র ঐ নির্বাচনটি নিরপেক্ষ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অথচ '৯১ ও ২০০১-এর নির্বাচন '৯৬-এর নির্বাচনের চেয়েও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্প্রতি (জুলাই ২০০৪) গাজীপুর-২ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই বারবার তিনি বিভিন্ন ভাষায় 'এ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না', 'নির্বাচনে বিজয়ের নীলনকশা আগেই করা হয়েছে' ইত্যাদি মন্তব্য করেন। এমনকি এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগপ্রার্থী 'নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি' বলে অভিযোগও তুলেছেন। কিন্তু যখন নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল, আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে; তখন তারা একদম চুপ মেরে যান। নির্বাচনে পরাজিত হলে যাতে কারচুপির অভিযোগ জোরে-শোরে তোলা যায়, সে উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগেই আপত্তি করে রাখা আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা যে মজা পেয়েছেন, সে কথা তিনি ভুলতেই পারেন না। আবার ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য তিনি যতরকম ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় চরম অন্তর্জ্বালা অনুভব করে পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে একমাত্র তখনই মেনে নেবেন, যখন তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসনে তার দল বিজয়ী হবে। তাহলে নির্বাচনে তার দলের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে :

রাষ্ট্রপ্রধান, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সেনাবাহিনী-প্রধান, পুলিশপ্রধান, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, জেলা পর্যায়ের সকল রিটার্নিং অফিসার এবং সকল ভোটকেন্দ্রের পোলিং অফিসারদের শেখ হাসিনার পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে।

শেখ হাসিনা কি মনে করেন, এমন উদ্ভট ব্যবস্থা করা কখনো সম্ভব? তাহলে তার কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপায় কী? এ অবস্থায় তাকে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া ছাড়া আর কি কোন পথ খোলা আছে?

নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যেই তো তিনি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে জামায়াতে ইসলামীর মতো, তার ভাষায় 'চরম মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক' দলের সাথে মিলে ১৯৯৪ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত একটানা আন্দোলন করেছেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশায় এত বড় ত্যাগ স্বীকার করার পরও ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নিতে তিনি ব্যর্থ হলেন।

তাহলে কোন্ ভরসায় তিনি ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন? তিনি কি নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নতুন কোন ফর্মুলা উদ্ভাবন করবেন? যদি তা না পারেন তাহলে বর্তমান সরকার পদত্যাগ করলেও নির্বাচনে তার বিজয়ের গ্যারান্টি কে দেবে?

শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আসার সুযোগ

১৯৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী দুঃশাসন ও শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ১৯৭৯ থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি গণতন্ত্র বহাল থাকে তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

কিন্তু ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন পেয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও তারা কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিটিকে আইনে পরিণত করতে অস্বীকার করায় শেখ হাসিনা এ দাবিতে আন্দোলন করার মহা সুযোগ পেয়ে যান। এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে বিএনপি ১৯৯১ সালে কিছুতেই ক্ষমতাসীন হতে পারত না। বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারেরই ফসল। এ সত্ত্বেও বিএনপি কেন এ পদ্ধতির বিরোধী হয়ে গেল তা বিস্ময়কর। যদি বিএনপি ঐ আইন পাস করতে সম্মত হতো তাহলে ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপিই ক্ষমতাসীন হতো। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এত আসন পেত না।

মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর থানার সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগ এমপি'র মৃত্যুর কারণে ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিএনপি ঐ আসনটি দখল করে নেয়। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে ঘোষণা দেয় এবং কেয়ারটেকার সরকার আইন পাস করার জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ আন্দোলনই শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

জামায়াতে ইসলামীর সংকট

এর ফলে জামায়াতে ইসলামী এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' জামায়াতে ইসলামীরই আবিষ্কার। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে এ দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে জামায়াত তাতে শরীক না হলে রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াতের কোন মর্যাদাই থাকে না। জামায়াতের তৈরি ইস্যু নিয়ে অন্য দল আন্দোলন করবে আর ঐ ইস্যুতে জামায়াত নীরব থাকবে– এমনটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার অংশীদার না হয়ে একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের স্বার্থে বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ করে দেয়। জামায়াত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করলেও বিএনপি সরকারকে পদত্যাগ করার দাবি করার মতো পরিস্থিতি কামনা করেনি। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে বড় দল হিসেবে এর নেতৃত্ব আওয়ামী

লীগেরই হাতে থাকবে। আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে যাতে বাধ্য হয়ে শরীক হতে না হয়, সে আশায় সংসদে জামায়াতের ২০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ও জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দিলাম।

নিজামী সাহেব প্রধানমন্ত্রীকে আমার সালাম জানিয়ে বললেন, "আপনার নিকট একটি বিশেষ আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছি। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির কারণেই আপনি ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ পেলেন। এ পদ্ধতিকে সংবিধানে শামিল করার উদ্দেশ্যে সকল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিল জমা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আপনি সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে আপনার সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের আর কোন ইস্যু নেই, যা নিয়ে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করতে পারে।

আপনি জানেন, কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামীর তৈরি ইস্যু। যদি এ ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে তাহলে আমরা তাতে শরীক হতে বাধ্য হব। আমরা আওয়ামী লীগের সাথে আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কিছুতেই শরীক হতে চাই না। আমাদেরকে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে আন্দোলন করতে দয়া করে বাধ্য করবেন না।"

এ আবেদনে প্রধানমন্ত্রী সাড়া দিতে অস্বীকার করায় শেষ পর্যন্ত জামায়াত চরম রাজনৈতিক দায়ে ঠেকে আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলনে শরীক হয়। এরশাদের জাতীয় পার্টি সংসদে তখন দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল। তারাও আন্দোলনে জোরে-শোরে শরীক হয়। আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের এমন সুযোগ করে দেওয়া বিএনপি'র রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল ছিল।

এ আন্দোলনই আওয়ামী লীগের সৌভাগ্যের ভিত্তি

জনগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত আওয়ামী লীগ এ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দানে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। এর কারণ বিবিধ :

১. কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ পদ্ধতির কারণেই জনগণ এরশাদের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায়।

২. জনগণ এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আস্বাদ লাভ করে।

৩. আওয়ামী লীগ জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী দল হিসেবেই পরিচিত ছিল। আন্দোলনে আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীকে সাথী হিসেবে পাওয়ায় জনগণের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ মনে হয় আগের মতো ইসলামের দুশমন নয়। বিশেষ করে শেখ হাসিনা বারবার হজ্জ করেন এবং মাথায় সব সময় কাপড় রাখেন।

৪. কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন না হলে কোন রাজনৈতিক দলই বিএনপি সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে সুস্পষ্ট হয়ে

যাওয়ার পরও বিএনপি একদলীয়ভাবেই নির্বাচন করায় জনগণ নির্বাচনে মোটেই সাড়া দেয়নি বলে প্রায় ৫০টি সংসদ আসনে বিএনপি-প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এতে বিএনপি'র রাজনৈতিক মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হয়।

৫. ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একদলীয় নির্বাচন গণতান্ত্রিক বিশ্বে স্বীকৃতি পায়নি। সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একাংশ বিদ্রোহী হয়ে নতুন সরকারের মন্ত্রীদের সচিবালয়ে ঢুকতেই দেয়নি।

৬. নতুন সরকার সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করে মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার ১৩ দিন পরই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে অপমানিত হয়ে সরকারকে বিদায় নিতে হলো বলে বিএনপি যে পরিমাণ সমর্থন হারায় তা আওয়ামী লীগের পক্ষে যায়। বিএনপি'র এমন একটি মহা ভুলের কারণেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ময়দানে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আরও কারণ

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে ঐ আন্দোলন আওয়ামী লীগের বিজয়ী হওয়ার ভিত্তি রচনা করলেও জুনের নির্বাচনে তাদের এত বিরাটসংখ্যক আসন লাভ করা খুব স্বাভাবিক ছিল না। আরও যে কয়টি কারণে শেখ হাসিনা ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, তা করতে না পারলে অবশ্য সরকার গঠন করার কাছাকাছিসংখ্যক আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে পারত না।

১. ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সর্বত্র জনগণের নিকট করজোড়ে তার পিতার কুশাসনামলের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন।

২. তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্তত একবারের জন্য জনগণের খিদমত করার সুযোগ দিতে কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছেন।

৩. পূর্ববর্তী নির্বাচনের মতো এ নির্বাচনের সময় তার পিতা হত্যার বিচার দাবি করেননি।

৪. দলীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

৫. নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ওমরাহ সম্পন্ন করে ইহরামের পট্টি মাথায় রেখে এবং হাতে তসবীহ দেখিয়ে তিনি বিমান থেকে অবতরণ করেন এবং নির্বাচনপূর্ব সকল সমাবেশে পট্টি ও তসবীহ প্রদর্শন করে নিজেকে একজন বিরাট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাহির করেন।

৬. মুজিব হত্যার ২১ বছর পর এ নির্বাচনে ভোটারদের প্রায় অর্ধেক শেখ মুজিবের কুশাসন দেখেনি। তাদের পক্ষে শেখ হাসিনার নির্বাচনাভিযানকালের উপরিউক্ত অভিনয়ে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

৭. এত কিছু সত্ত্বেও নির্বাচনে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসনে তার দল বিজয়ী হতে পারেনি। এরশাদের জাতীয় পার্টির মহাসচিব জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে এবং এরশাদকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার চুক্তি করে ঐ দলের সমর্থন পাওয়ার ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৮০.

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ভূমিকা

২০০১ সালের জুনে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব লতিফুর রহমান অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশ-বিদেশের সকল পর্যবেক্ষকই এ নির্বাচনের অকৃপণ প্রশংসা করেছেন।

নির্বাচনের পর তিনি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন সম্পর্কে ৩৪৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত এক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা'। ২০০২ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাবাজার ও নিউ মার্কেটে বইটি পাওয়া যায়।

গ্রন্থটিতে তিনি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ৮৭ দিন' শিরোনামে ২১০ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্ট ১-এ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ', পরিশিষ্ট ২-এ 'কতক সাক্ষাৎকার', পরিশিষ্ট ৩-এ 'বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনী অভিমত' এবং পরিশিষ্ট ৪-এ 'অভিনন্দন জানিয়ে পত্র' গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

তার ৮৭ দিনের কর্মতৎপরতার এমন স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন, যা তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর দায়িত্ব পালনে কোন মহলের প্রশংসা বা সমালোচনাকে তিনি সামান্য আমলও দেননি। দ্বিধাহীন চিত্তে যা সঠিক বিবেচনা করেছেন তা-ই করেছেন। তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রথম দিন থেকেই তিনি যে পদক্ষেপই নিয়েছেন তা শেখ হাসিনার অপছন্দ হলে শেখ হাসিনা স্বভাবসুলভ অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন নেতা এ জাতীয় বক্তব্য দেননি। বিচারপতি লতিফুর রহমান এতে সামান্যও বিচলিত হননি এবং শেখ হাসিনার ঐসব নিম্নমানের সমালোচনা খণ্ডন করার কোন প্রয়োজনই বোধ করেননি।

তাঁর এ মূল্যবান ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে বাধ্য হলাম। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাগণ সরাসরি এ গ্রন্থটি পাঠ করলে তাঁর সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে তৃপ্তিবোধ করবেন।

বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অভিমত

বিচারপতি লতিফুর রহমান তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্ট ৩-এ উল্লেখ করেছেন, দেশী-বিদেশী প্রচুরসংখ্যক নির্বাচন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দেশের মোট ২১৫ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষক সংস্থার সংখ্যা ছিল ৬৪, আর পর্যবেক্ষক ছিল ২,২৩,৪৫০ জন। বেশির ভাগ সংস্থাই তাদের রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করেন।

নিম্নলিখিত বিদেশী সংস্থা থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে :

১. United Nations Electoral Assistance Secretariat.

২. European Union Election Observation Mission in Bangladesh.

৩. Japan-Bangladesh Parliamentarians Association.

এ তিনটি বিদেশী রিপোর্টের সব কয়টিই ইংরেজিতে প্রেরিত। প্রথমটি সাড়ে চার পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়টি এক পৃষ্ঠা ও তৃতীয়টি আড়াই পৃষ্ঠায় লেখা। এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যে কয়টি প্যারা থেকে চূড়ান্ত অভিমত সুস্পষ্টভাবে জানা যায় তা-ই পেশ করছি।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক মিশনে যে কয়টি দেশের ডেলিগেট শরীক ছিল তা হলো—কানাডা, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, জাপান, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, আমেরিকা ও পাকিস্তান। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য শেষে উপসংহারে নির্বাচনের দিনের যে বিবরণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

Conclusions : The general assessment by the observers of the opening of polling centers, voting, closing of the polling centers, and counting was 'good' and that the elections proceeded smoothly.

The observers also noted a high participation of women in the voting, despite the hardships presented by small and overcrowded polling stations. Although a few, sporadic and regrettable incidents of violence were reported and irregularities during voting were observed, the overall impact on the elections was minimal. Closing of the polling stations and counting were according to the established procedures and polling agents signed the statement of counting in all polling centers visited by the observers. Consequently, the delegations agreed that the polling on October 1, 2001 was generally free, fair, peaceful and orderly.

Polling station officials have displayed professionalism for the most part and appeared to be generally familiar with required procedures. The elections were generally well organized and managed in a satisfactory way, although a number of administrative problems beset the process and, in some cases, prevented citizens from voting. Some of these difficulties were due to overcrowded polling centers, late identification of new polling centers and a problematic partisan vote number verification system.

The delegations wish to congratulate the people of Bangladesh for their stoicism and high civic spirit and for their peaceful, orderly and enthusiastic participation. (পৃষ্ঠা : ৩২০-৩২১)

European Union

Election Observation Mission in Bangladesh-2001

EU-EOMB

PRELIMINARY STATEMENT-2, OCTOBER 2001

1. The EU Election Observation Mission in Bangladesh [EOMB] has been deployed to monitor the October 1st General Elections on the invitation of the authorities of Bangladesh.

   31 Long Term Observers [LTOs] were deployed in 14 regional offices since August 27th. During this time, the observers have concentrated on the pre-electoral phase, in particular the election campaign and administrative preparations.

   The various authorities and electoral-related organizations have always constructively co-operated with all the European Union Observers throughout Bangladesh in all our observation operations.

   On election Day, 72 Observers have been present in more than a third of all constituencies and more than half of the sixty four districts of Bangladesh. They have visited more than 500 polling stations. They also made observations on vote counting and results consolidation.

2. The European Union Observation Mission in Bangladesh considers that the electoral process has guaranteed sufficient conditions of freedom and fairness and represents an important step towards democratic consolidation. We strongly hope that, all the political actors will respect the people's choice as reflected in the results announced.

   The Bangladesh have shown their strong commitment in furthering democracy in the country and the electoral authorities, the security forces and the media have contributed to a positive process with a spirit of independence and authority, in challenging circumstances. (পৃষ্ঠা : ৩২৪)

On the election day, we visited nineteen polling centers in ten constituencies in Dhaka, Gazipur, Narsingdi and Narayanganj and observed closely the vote casting and counting process. We received a warm welcome from election officers as well as voters at all polling centers and we could fulfill our observation mission smoothly without any interruption.

Although our observation was limited, we were very impressed with the scene, where both voting and counting were conducted in an orderly fashion, and also with the discipline maintained and enthusiasm evinced among election officers and voters, Police, Ansar, BDRs and the Armed Forces who were on duty at each polling center also operated in a well disciplined manner. We were further impressed with the cheerful co-operation and assistance among all those agents from main political parties, who overcome partisan interests and ensured the voting process was conducted in a smooth way.

There were reportedly a number of polling centers where voting was canceled because of clashes between political party supporters. However, the number is insignificant, I believe, in view of the large number of polling centers nearly thirty thousand, throughout Bangladesh.

As a result of our observation, we have confident impression that this election, as a whole, was conducted in a free, fair, peaceful and orderly manner. Out attention was particularly drawn to the many women and young people who participated in this election in an active and orderly way. This leads me to believe that your country has a very bright future. I was also touched by the sincerity and integrity of the people of Bangladesh throughout our observation.

This election was the second conducted under the Non-party Caretaker Government system. We strongly hope that, his election will further promote the democratic process in your country. Finally, we sincerely hope that the will of the people as reflected in this election result, will be fully respected, and the new government can be swiftly organized, and democracy is consolidated in accordance with the wishes of the people of Bangladesh. (পৃষ্ঠা : ৩২৬-৩২৭)

বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেরিত চিঠি

বিচারপতি তাঁর গ্রন্থে যেসব অভিনন্দনপত্র প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিন জনের চিঠি থেকে এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

প্রথম চিঠিটি লিখেছেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস, যিনি গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভাবক হিসেবে খ্যাত। নির্বাচনের মাসখানেক আগে ৩১ আগস্টে লেখা তাঁর দীর্ঘ চিঠিতে প্রথম আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বিচারপতির যেসব কাজ তিনি পছন্দ করেছেন এর তালিকা দিয়ে তাঁকে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। দীর্ঘ পরামর্শ থেকে কোন উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। চিঠিটি নিম্নরূপ :

আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

দ্রুততার সঙ্গে, সাহসিকতার সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে একটি সত্যিকার 'নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকার সৃষ্টি করার জন্য আপনাকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। একপাল্লা একদিকে সম্পূর্ণ ঝুলে পড়া এমন এক দাঁড়িপাল্লাকে নিরপেক্ষতার সমতায় নিয়ে আসা এমনিতেই কঠিন কাজ; তার ওপর তা যদি করতে হয় মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে, তাহলে সেটা হয়ে পড়ে একটা অসাধ্য সাধন। আপনি অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েছেন। সেজন্য জাতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

যেসব কাজ আমার ভালো লেগেছে :

১. শপথ গ্রহণের পরপরই সচিবদের বদলির কাজটা খুবই ভালো হয়েছে। এতে সবাই বুঝে গেছে You mean business; আপনার কাছে 'নিরপেক্ষতা' একটা পোশাকি শব্দমাত্র নয়।

   তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার বছর খানেক আগে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন সেটা যেন তার দায়িত্ব গ্রহণের অন্তত তিন মাস আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। তাকে যেন তখন থেকে অফিস এবং স্টাফ দেওয়া হয় তার কাজের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তিনি যেন তাঁর টিম বাছাই করার কাজ শুরু করতে পারেন, তার করণীয় কাজগুলো সম্বন্ধে প্রস্তুতি নিতে পারেন। শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যেন তিনি কাজে নেমে যেতে পারেন। নব্বই দিন অতি অল্প সময়। তার মধ্যে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো প্রথম সপ্তাহ এবং প্রথম মাস।

   আমাদের সৌভাগ্য যে, কোন রকম সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই আপনি হোম-ওয়ার্ক করে এসেছেন এবং দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে গেছেন।

২. আমার কাছে ভালো লেগেছে, আপনি কথা কম বলেন। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্যের জবাব দেন না। আপনি আপনার নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। অন্যের বক্তব্য আপনাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে না।

৩. ফেনী অপারেশন সকল মানুষের ভালো লেগেছে। এই অপারেশন যেন থিতিয়ে না যায়। দেশের মানুষ এই অপারেশনে আশান্বিত হয়েছে। তাদের যেন আশাভঙ্গ না হয়।

৪. বুড়িগঙ্গা অভিযান খুব ভালো লেগেছে। আইনের গায়ে যে এখনো কিছু শক্তি অবশিষ্ট আছে, এটা দেখে মানুষ ভরসা পেয়েছে।

৫. আপনার বিভাগীয় সফরটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকার, এটা যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের কাছে প্রতিমুহূর্তে স্পষ্ট থাকে এবং দেশের মানুষও তাকে সেভাবে দেখতে পায়। এটা কোন খেলাঘরের পুতুল সরকার নয়। এ সরকার যা ভালো মনে করবে, যা ন্যায্য মনে করবে তা করতে কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা করবে না।

৬. বিচার বিভাগকে পৃথক করার উদ্যোগ আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এটা যেন অবশ্যই সমাপ্ত করে যান। রাজনৈতিক সরকারের হাতে পড়লে এটা মারা পড়তে পারে। (পৃষ্ঠা : ৩২৯ ও ৩৩০)

সেনাপ্রধানের চিঠি

তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এম হারুনুর রশীদ বীরপ্রতীকের ৮ অক্টোবরে লেখা চিঠি :

শ্রদ্ধেয় প্রধান উপদেষ্টা,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে সুস্বাস্থ্যসহ কুশলেই আছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অসীম দক্ষতা, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার জন্য প্রথমেই আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে গুরুদায়িত্ব আপনার নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর অর্পিত হয়েছিল তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আপনার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ দিকনির্দেশনায় জাতি একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার পেয়েছে। আপনার মতো একজন বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ব্যক্তিত্বকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে পেয়ে দেশ ও জাতি গর্বিত। এদেশে গণতন্ত্রের জয়যাত্রায় দেশবাসী আপনার কাছে বিশেষভাবে ঋণী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে প্রেরিত আপনার ২ অক্টোবর ২০০১ তারিখের পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পত্র সেনাবাহিনীর প্রতি আপনার সুগভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি এবং তা আমাকে এবং প্রতিটি সেনাসদস্যকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। সেনাবাহিনীর জন্য প্রেরণাসমৃদ্ধ

আপনার এই অভিনন্দনবার্তা ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর সকল স্তরের সদস্যদের অবহিত করা হয়েছে। আমি মনে করি, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত এবং আপনার সুচিন্তিত দিকনির্দেশনার ফলেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপনি দিয়েছেন সঠিক ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। নির্বাচন বিষয়ে সেনাবাহিনী আপনার নিকট থেকে পেয়েছে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী উপদেশ। সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনার কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সকল সহযোগী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। এজন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অবিস্মরণীয় সফলতার সাথে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পাদন নিঃসন্দেহে আপনার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের একটি অনন্য ও ইতিবাচক সাফল্য হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে প্রেরিত আপনার অভিনন্দনপত্রের জন্য আমি আবার আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার কাছে আপনার জীবনের সার্বিক কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করছি। (পৃষ্ঠা : ৩৩৬ ও ৩৩৭)

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অভিনন্দনপত্র

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার নির্বাচনের পূর্বে আগস্ট মাসে বাংলাদেশে এসে বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদ, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেত্রীদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে গেছেন। তিনি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা করে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেও তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি প্রধান দু'দলের নেত্রীদ্বয় থেকে নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার অঙ্গীকারও নেন। হরতাল ও সংসদ বর্জন না করার যে প্রস্তাব তিনি দেন তাতেও উভয় নেত্রী সম্মত হন।

নির্বাচনের সময় তিনি আবার আসবেন বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন-টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আসতে পারেননি।

নির্বাচনের পর ৪ অক্টোবর তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অভিনন্দন জানিয়ে নিম্নরূপ পত্র পাঠান :

October 4, 2001

To

M.A. Sayed

I am writing to congratulate you for the central role played by you and the Election Commission in ensuring the peaceful, free and fair conduct of the elections October 1. When I visited Bangladesh in August, I was impressed with the evenhanded, impartial preparations for the election being made by the Caretaker Government and the electoral authorities, laying the foundation for free and fair elections. It now appears from all international and domestic observer reports that the elections were relatively peaceful and that they were conducted in accordance with international standards. These reports run counter to public statements attributed to Sheikh Hasina and the Awami League of massive rigging. Any complaints should follow normal legal channels of appeal rather than a complete refusal to recognize the elections legitimacy.

Given the international situation right now, it would be damaging and destabilizing for Bangladesh to enter into a protracted post-electoral political crisis. The candidates and their parties have the power to avoid such a crisis by adhering to the commitments they made in August. They agreed to renounce the use of *hartals*, violence and intimidation. Living up to this commitment will require clear, public statements to supporters to avoid mass demonstrations, strikes, and violent acts of any kind.

Party leaders, including former Prime Minister Sheikh Hasina, also pledged not to boycott the next Parliament and to help ensure that the opposition plays a meaningful role in the new legislature, no matter which party formed the government. I have called on Khaleda Zia to respectfully the pre-electoral agreements to ensure a full and legitimate role for the opposition under the new government, especially in Parliament and with respect to the role of the Speaker. I urge other leaders to do the same. However, Sheikh Hasina's recent vow to boycott Parliament runs counter to her August pledge and has the potential not only to destablize this new Parliament, but also unravel the delicate fabrics of the Bangladeshi Democracy.

As you know, I lost a presidential election myself. I am well aware of how hard it is to accept such a defeat. It is imperative, however, that the

Awami League accept the results of the election in order to strengthen Bangladesh's democratic institutions in the long-term. The party has played an important leadership role for democracy in Bangladesh, and this is a role that must continue in opposition. This is the essence of democracy.

Bangladesh has many friends around the world who are hopeful that democracy can take hold and that the poverty and suffering of many Bangladesh people can be alleviated through good governance, meaningful political deliberations, and sound policy-making. The Awami League is critical to this long-term process as a strong party opposition in the next Parliament and as a contender in future free and fair elections.

Sincerely.
Jimmy Carter.
(পৃষ্ঠা : ৩৪৩ ও ৩৪৪)

জিমি কার্টারের চিঠি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উভয় নেত্রীই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার, ভবিষ্যতে হরতাল ও পার্লামেন্ট বয়কট না করার ওয়াদা করেছিলেন।

দেশীয় পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার স্বীকৃতি

নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অবাধ হওয়ার সার্টিফিকেট বিদেশী পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট থেকে জানা গেল। দেশের ৬৪টি পর্যবেক্ষক সংস্থা ও ২ লাখ ২৩ হাজার ৪৫০ জন পর্যবেক্ষকের পক্ষ থেকেও নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের কোন একটি সংস্থাও ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেনি। নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় শেখ হাসিনাও নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র শেখ হাসিনাই চরম নির্লজ্জের মতো বারবার কারচুপির অভিযোগ করে চলেছেন। কোন একটি দেশী পর্যবেক্ষক সংস্থাও এ ব্যাপারে হাসিনার সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। সকল সংস্থাই কি তাহলে শেখ হাসিনার বিরোধী ও চারদলীয় জোটের অন্ধ সমর্থক?

নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে তার প্রগল্‌ভতা যে জনগণের মধ্যে তার মর্যাদাহানি করছে সে কথা অনুধাবন করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি যে এ ব্যাপারে বিশ্বের দরবারে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন সে চেতনাও তিনি রাখেন না। রাজনীতিতে এ অন্ধ জিদ তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোনভাবেই উজ্জ্বল করবে না।

সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত একটি জাতীয় নির্বাচনকে কারচুপি ও ব্যালট ডাকাতির নির্বাচন বলে শেখ হাসিনার অব্যাহত গোয়েবলসীয় প্রচারণাকে যথেষ্ট যুক্তিসহকারে ডাহা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা অপরিহার্য মনে করেই এ দীর্ঘ আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

১৮১.

বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে আমার একান্ত সাক্ষাৎ

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সময় আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব না থাকায় ম্যানচেস্টারে বসবাসরত তিন ছেলের কাছে সস্ত্রীক বেড়াচ্ছিলাম। দেশের খবর সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নির্বাচনী ফলাফল নিয়মিত ইন্টারনেটে পাচ্ছিলাম। চারদলীয় জোটের আশাতিরিক্ত বিজয়ে জোটপ্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে টেলিফোনে উষ্ণ মুবারকবাদ জানালাম এবং সরকার গঠন সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিলাম। সরকার গঠনের ব্যাপারে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের কাছ থেকে টেলিফোনে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিচ্ছিলাম।

আমার প্রধান পরামর্শ ছিল, জোটের মন্ত্রিসভায় জামায়াতের যথার্থ ওজনের স্বার্থে আমীরে জামায়াতকে অবশ্যই যোগদান করতে হবে।

১০ অক্টোবর জোটের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৮ অক্টোবর আমি সস্ত্রীক দেশে ফিরে আসি। আমি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন বোধ করলাম।

আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক বিচারপতির সাথে যোগাযোগ করলে তিনি প্রথমে আমার সাথে টেলিফোনে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি কোন রাজনৈতিক নেতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অনীহা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে জানালাম, আমার ওপর কোন রাজনৈতিক দায়িত্ব নেই। আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে চাই না, শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি একা আসব, একান্তে আপনার সাথে কিছু কথা বলব, পত্রিকায়ও খবর দেব না। সাক্ষাতের দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল।

তখনও তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেন। আমার সাথে যারা গেলেন তাদের নিচের তলায় বসার ব্যবস্থা করা হলো। আমি দোতলায় গেলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে হাত মেলালেন এবং হাসিমুখে সালামের জবাব দিয়ে সাথে বসালেন। আমি প্রথমে খুব সুন্দর একটি আতরদানে এক শিশি আতর উপহার দিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে তা গ্রহণ করে আতরদানে চুমু খেলেন। আমি বললাম, "আপনি যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে নির্বাচনে জনগণকে অবাধে ও স্বাধীনভাবে তাদের রায় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন, সেজন্য আপনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাতে এসেছি। আপনি কোটি কোটি মানুষের দোয়া পাবেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মযবুত করার ক্ষেত্রে এ নির্বাচন বিরাট ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে আপনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আপনার এ সাফল্য জাতি চিরকাল স্বীকার করবে।"

আমার কথা শেষ হলে তিনি তৃপ্ত অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া আদায় করলেন। ক্ষুদ্রমনা ও দাম্ভিকের মতো নিজের কৃতিত্ব ও বাহাদুরি প্রকাশ না করে অত্যন্ত

বিনয়ী ও শরীফ মানুষের মতো বললেন, 'এ সফলতা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ও সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীল মহলের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সহযোগিতায়ই সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে মহামান্য প্রেসিডেন্টের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না।'

আমি মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখা ও আমার রচিত কতক পুস্তক তাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি খুশি হয়ে তা গ্রহণ করলেন। 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাইলাম। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তিনি বললেন, "যেসব দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি সেসব দেশে এ পদ্ধতি অবশ্যই চালু হওয়া প্রয়োজন। নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। একমাত্র এ পদ্ধতিই নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে।"

আমি তাকে অনুরোধ জানালাম, "আপনার মাত্র তিন মাস সময়কালের সরকার পরিচালনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা লিখিত আকারে জাতির সামনে এলে ভবিষ্যতের কেয়ারটেকার সরকারের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" তিনি উৎফুল্ল হয়ে জানালেন, "আমি সকল তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ করছি এবং বিস্তারিত লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।"

আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দাঁড়িয়ে গেলে তিনি আমার হাত ধরে আবার বসতে অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার প্রসন্ন মৃদু হাস্যরত চেহারার দিকে তাকালাম। তিনি বিশেষ গুরুত্বের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, "কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির উদ্ভাবক কে? আরও কেউ কেউ উদ্ভাবকের দাবি করে থাকে। আপনার নেতৃত্বে আপনার দল এ পদ্ধতি চালু করার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনে শরীক ছিল। তাই আপনার নিকট থেকে সঠিক তথ্য জানা যাবে মনে করে জিজ্ঞেস করছি।"

অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেশ করলাম। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনে শুকরিয়া জানালেন। এর পরই বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তিনি আবার শুকরিয়া জানিয়ে সহাস্য বদনে বিদায় দিলেন।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন সম্পর্কে বিচারপতিকে যা অতি সংক্ষেপে জানিয়েছি, সকল রাজনৈতিক মহলের অবগতির উদ্দেশ্যে তার বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করার প্রয়োজন বোধ করছি। বিষয়টি ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যদি কোন ব্যক্তি বা দল এর উদ্ভাবকের দাবি করার সাহস করে তাহলে গণমাধ্যমে পেশ করুক। জনগণের এ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করার সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি

কেয়ারটেকার সরকারের সংজ্ঞা

যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে এবং নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেসব দেশে নির্বাচনের পর বিজয়ী দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে

বিজয়ী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা বাতিল করা হলেও প্রধানমন্ত্রীকে পরবর্তী সরকার কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের গতানুগতিক কাজ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গত নির্বাচনের আগেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নির্বাচনের সময়ও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রীর লেবার পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। টনি ব্লেয়ারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টনি ব্লেয়ার কর্তৃক পরিচালিত সরকারকে লেবার পার্টি সরকার বলা হয়নি। টনি ব্লেয়ার লেবার পার্টির নেতা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নির্বাচনকালীন এ সরকারকে কী নামে ডাকা হয়?

পরিভাষায় সাধারণত এ সরকারকে Interim Govt. বলা হয়। Temporary Govt.ও বলা যায়। অর্থাৎ এ সরকার মধ্যবর্তী, অস্থায়ী ও সাময়িক সরকার মাত্র। নির্বাচনকালে দেশ তো সরকারবিহীন থাকতে পারে না। তাই দৈনন্দিন সরকারি কাজ পরিচালনার জন্য এ সরকার প্রয়োজন। এ সরকারের ক্ষমতা খুবই সীমিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ জাতীয় সরকারকেই কেয়ারটেকার সরকার বলা হয়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতেও নিয়মিত নির্বাচন হয় এবং ঐ রকম কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে একই সাথে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান কায়েম হলেও সেখানে এ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের নির্বাচন

স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর শেখ মুজিব সরকারের পরিচালনায় ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে অল্প কয়টি আসন ছাড়া ৩০০ আসনের সবক'টিই আওয়ামী লীগ দখল করে নেয়। ঐ নির্বাচনকে দেশে ও বিদেশে কেউ নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে মনে করেনি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের দল দুই-তৃতীয়াংশ আসনেরও বেশি দখল করে। আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে বিজয়ী হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টি মিলে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) নামে নির্বাচনে ১৮ টি আসন পায়।

এ নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হলেও '৭৩-এর নির্বাচনের মতো একচেটিয়া সিট দখলের অপচেষ্টা করা হয়নি। জিয়াউর রহমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। নির্বাচনে যেসব দল অংশগ্রহণ করেছে, সেসব দলের প্রধানগণ যাতে সংসদে আসেন সেদিকে তিনি খেয়াল রেখেছেন। জিয়ার শাসনামলের প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সিনিয়র হলেও সমসাময়িক হিসেবে কিছুটা সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ হতো। তার কাছ থেকে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পলিসি সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি।

তিনি জিয়ার নির্বাচনী পলিসির প্রশংসা করতে গিয়ে জানালেন, দলীয় প্রধানগণ যাতে সংসদের বাইরে আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে না করেন, সে উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সর্বহারা দলের তোয়াহা প্রথ: ভোট গণনায় পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, জিয়াউর রহমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়নি। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাজনীতি ও নির্বাচনকে বাকশালী স্বেচ্ছাচারে পরিণত করল। জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ত াধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সফল হননি বলেই আমার ধারণা। গণত ্রর অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। তা না হলে নির্বাচন নিতা ই প্রহসন মাত্র। নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ায়, স সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর একটা প্রস্তাবনা জামায়াতে ই লামীর নির্বাহী পরিষদে পেশ করি। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর জামায়াত র্বসম্মতভাবে এ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার

আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনের সময় একধরনের কেয়ার টেকা সরকারই থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলীয় নেতা হওয়ায় সর ার পরিচালনার সুযোগে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার সম্ভাবনা থাকে। ব্রিটেনে দীর্ঘ তিহ্যের কারণে এমন সুযোগ গ্রহণ না করলেও আমাদের দেশে এর সম্ভাবনা অবশ্যই াছে এ ভাবনা থেকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অরাজনৈতিক ও নির্দলী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি 'কেয়ারটেকার সর ার' পরিভাষার আবিষ্কারক নই। এ পরিভাষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানেই আমি পেয়েছি। আমার প্রস্ত ব শুধু নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক সরকারের পরিচালনার কথাটুকুই নতুন সংযোজন বল যায়।

প্রস্তাবনার মূল কথা :

"নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত (অবসর াপ্ত নন) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকারে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় এমন লোকদেরকে নিয়োগ করতে হবে, যারা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত নন এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নন। এ সরকার নিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সরকার কায়েম থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করবেন।"

মূল প্রস্তাবে কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে সরকারপ্রধান করার কথা এ কারণেই বলা হয়েছে, তিনি নির্বাচনের পরই পূর্বপদে ফিরে যাবেন বলে তার মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সুযোগ থাকবে না। এ অবস্থায় তার কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কোন আশঙ্কা থাকবে না।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবি উত্থাপন

১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রীনে জামায়াতের এক কর্মী সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সর্বপ্রথম জামায়াতের পক্ষ থেকে এ দাবিটি উত্থাপন করেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিহত করার ফলে ঐ বছর নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার নির্বাচিত হন এবং নতুন সরকার গঠন করেন। ১৯৮২ সালের মার্চে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন কায়েম করে গণতন্ত্রের ধারা স্তব্ধ করে দেন। ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে রাজনৈতিক দলসমূহকে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দিলে ঐ বছরই ২০ নভেম্বর বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতের জনসভায় একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব হিসেবে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন

১৯৮৩ সালেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী পৃথকভাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে মুলতবি শাসনতন্ত্র বহাল করার আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে এ আন্দোলন যুগপৎ আন্দোলনে রূপ নিলে ১৯৮৪ সালের শুরুতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। সামরিক শাসক এপ্রিল মাসে ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতকে তার সাথে সংলাপের আহ্বান জানান।

যুগপৎ আন্দোলনের ফলে উভয় জোটনেত্রীর সাথে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সে সুবাদে জামায়াত ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াত মিলে ২৩ দলকে একসাথে সংলাপে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। একসাথে সংলাপে যাওয়ার পক্ষে জামায়াত যুক্তি পেশ করে যে, পৃথকভাবে গেলে জেনালের এরশাদের কাছ থেকে কোন কমিন্টমেন্ট আদায় করা যাবে না। একজোটের সাথে কথা বলার পর তিনি বলবেন, আপনাদের কথা শুনলাম; দেখি অন্যরা কী বলেন। একসাথে গেলে এ রকম কোন অজুহাত তুলতে পারবেন না। তাহলে সংলাপ ফলপ্রসূ হবে এবং তাকে সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য করা যাবে।

দুই নেত্রী একসাথে যেতে সম্মত হলেন না। জামায়াত দুই নেত্রীর নিকট প্রস্তাব দিল, সবাই একসাথে সংলাপে না গেলেও সবাই যদি একই ভাষায় একই রকম দাবি জানায় তাহলেও সংলাপ সফল হতে পারে। উভয় নেত্রী বললেন, ঐ দাবিটি লিখিতভাবে দিলে আমরা জোটের বৈঠকে বিবেচনা করব।

সংলাপে জামায়াতের লিখিত দাবি

জামায়াত সংলাপে পেশ করার দাবিটি লিখিত আকারে দুই নেত্রীকে দেওয়ার পর তারা কেউ তা পছন্দ করলেন কি-না জানা গেল না। ১০ এপ্রিল জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের ডেলিগেশন জেনারেল এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ লিখিত দাবিটি পেশ করে, যা দুই জোটনেত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। ঐ দাবিনামাটির

সারমর্ম নিম্নরূপ :

"সেনাপ্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় আপনি যে শাসনতন্ত্রের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা মুলতবি করে এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার কোন বৈধ অধিকার আপনার ছিল না। শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। এ ব্যাপারে দুটো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন :

১. আপনি যদি নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তার নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। এ নির্বাচনে জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করলে আপনি দেশ শাসনের বৈধ অধিকার পাবেন।

২. যদি আপনি ঘোষণা করেন যে, আপনি নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন না, তাহলে আপনাকেও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা সম্মত। নির্বাচনের পর আপনি পদত্যাগ করবেন এবং নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।"

এ দাবির জবাবে তিনি বললেন, "আপনাদের কথা শুনলাম। অন্যদের কথা শোনার পর সবার প্রস্তাব একসাথে বিবেচনা করব।"

জনাব আব্বাস আলী খান সংলাপের পর বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের নিকট ঐ লিখিত দাবির কপি বিলি করেন।

সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল

১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের সাথে আলোচনা শেষে ১৭ এপ্রিল জামায়াতের ডেলিগেশনের সাথে দ্বিতীয় দফা সংলাপে জেনারেল এরশাদ একটু উষ্মার সাথে বললেন, "আপনারা কোথায় পেলেন কেয়ারটেকার সরকারের অদ্ভুত পদ্ধতি? দুই জোটের কেউ আপনাদের দাবি সমর্থন করে না। ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সংলাপ শেষ হওয়ার পর ২৯ তারিখে এরশাদ সাহেব দাপটের সাথে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, "রাজনৈতিক দলগুলো এত বিভিন্ন রকম দাবি জানিয়েছে যে, আমি কার দাবি গ্রহণ করব? তাই অবিলম্বে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।"

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, 'উপজেলা নির্বাচন নয়, সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন চাই'। এ দাবিতে আন্দোলন জোরদার হওয়ায় এরশাদ সংলাপের ডাক দিতে বাধ্য হন। সব দল যদি একসাথে সংলাপে গিয়ে একই দাবি একবাক্যে পেশ করতে সক্ষম হতো তাহলে হয়তো ঐ বছরই দেশ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেত। সংলাপ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল এবং এরশাদ উপজেলা নির্বাচন করিয়ে ক্ষমতায় আরো মযবুত হয়ে বসার সুযোগ পেলেন।

যুগপৎ আন্দোলনের অবস্থা

এরশাদের সাথে সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেলে বিনা বাধায় '৮৪ সালের মে মাসে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। এ সাফল্যের ভিত্তিতেই '৮৫ সালের ২১ মার্চ স্বৈরশাসকদের ঐতিহ্য মোতাবেক তথাকথিত গণভোটের মাধ্যমে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা 'নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট' হয়ে গদিতে মযবুত হয়ে বসলেন।

'৮৫ সালের শেষ দিকে আবার যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা হলো। আন্দোলন দানা বাঁধার মুখে '৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়। যুগপৎ আন্দোলন আবার থেমে যায়।

'৮৭ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আবার যুগপৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে। '৮৬-এর সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় তারাই এ আন্দোলনে অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। ৬ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদীয় দল তাদের নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্পিকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর নিকট গিয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ পদত্যাগ করবে বলে বিবিসিকে জানানো সত্ত্বেও বিদেশে অবস্থানকারী নেত্রীর সম্মতির অভাবে দোদুল্যমান থাকা অবস্থায় তিন দিন পর সরকার সংসদ ভেঙে দেয়। আওয়ামী লীগ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়।

প্রধান দু'দলের সমন্বয়ের অভাবে যুগপৎ আন্দোলন জোরদার না হওয়ায় ঐ অনুকূল পরিবেশটিকেও কাজে লাগানো গেল না। ফলে এরশাদ '৮৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনে আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কয়েকটি বাম দল ছাড়া যুগপৎ আন্দোলনের সকল দলই ঐ নির্বাচন বয়কট করে। প্রহসনমূলক এবং ভোটারবিহীন নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিত্বহীন সংসদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো সোচ্চার হতে থাকে। এরশাদের পদত্যাগ ও সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন ঢিমেতালে চলতে থাকে।

কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৯ সালের অক্টোবরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই এরশাদবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুনির্দিষ্ট দাবি সর্বমহলে সহজে বোধগম্য হওয়ায় স্বৈরশাসনের অবসানের পথ সুগম হয়।

কীভাবে সরকার পরিবর্তন করা হবে—এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দাবি উত্থাপিত হওয়ায় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হয়। এ সময় ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি বাম দল পাঁচ দলীয় জোট গঠন করে। এতদিন সরকারবিরোধী আন্দোলনে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর দেওয়া ফর্মুলা অনুযায়ীই ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের নামে একটা রূপরেখা পেশ করা হয়। এতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে জেনারেল

এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত (মন্ত্রীর মর্যাদায়) উপদেষ্টাপরিষদ গঠন করবেন। এ নবগঠিত সরকার নির্বাচন কমিশন গঠন করে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

এবার সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন জোরদার হলো এবং জনগণ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এল। ঠিক ঐ পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। সরকারের ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে জনগণ ময়দানে নেমে এল। সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের পক্ষে ভূমিকা রাখতে অস্বীকার করল। বাধ্য হয়ে এরশাদ ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগ করলেন।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলন সফল হলো। প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হাতে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হলেন। ১৫ মার্চ (১৯৯১) ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৪ সালের এপ্রিলে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে জেনারেল এরশাদের সংলাপের সময় যদি কেয়ারটেকার সরকার দাবিটি সবাই একসাথে পেশ করতে সক্ষম হতো তাহলে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি '৯০ সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হতো না।

নতুন সরকার গঠন

প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনে সমস্যা দেখা দিল। ঘটনাক্রমে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ১৮টি আসনের অধিকারী জামায়াতে ইসলামীর হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' এসে পড়ল। জামায়াত ক্ষমতায় অংশীদার না হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে বিএনপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করল। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০ মার্চ ১৯৯১ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

জুন মাসে বাজেট সেশনেই জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংসদে পেশ করার জন্য একটি বিল জমা দেন। পরে ঐ বছরই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি পৃথকভাবে এ উদ্দেশ্যে বিল জমা দেয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল এ বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয় বলে বোঝা গেল।

আবার কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে আন্দোলন

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন যদি জেনারেল এরশাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বিএনপি ক্ষমতাসীন হতো না। বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারেরই ফসল। ভবিষ্যতে যাতে এ পদ্ধতিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য দেশের শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে একটি আইনের সংযোজন করাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। এ পদ্ধতিতেই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নিশ্চিত হয়।

দুঃখের বিষয়, বিএনপি সংসদে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' সম্পর্কিত বিল নিয়ে আলোচনার সুযোগই দিতে রাজি হলো না। জামায়াতে ইসলামী 'কেয়ারটেকার সরকার' দাবি নিয়ে ১০ বছর (১৯৮০-১৯৯০) আন্দোলন করেছে। '৯০ সালে বিএনপিও এ আন্দোলনে শরীক ছিল। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুবাদেই তারা ক্ষমতায় গেলেন। অথচ এ পদ্ধতিটি সম্পর্কে সংসদে আলোচনা পর্যন্ত করতে দিলেন না। ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন করে ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে তারা এমন আজব আচরণ করতে পারতেন না।

১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মাগুরা জেলার একটি আওয়ামী লীগ আসন উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার দখল করে নেওয়ার পর আওয়ামী লীগ ঘোষণা করল যে, কেয়ারটেকার সরকার কায়েম না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি সরকারের পরিচালনায় কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

জামায়াত মহাবিপদে পড়ল। আওয়ামী লীগ সর্বদিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি জামায়াতের নিজস্ব ইস্যু। এ ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করলে রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য ঐ আন্দোলনে শরীক হওয়া ছাড়া জামায়াতের কোন উপায় থাকবে না। তাই বিএনপি নেত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানানো হলো, যেন তিনি কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিটি মেনে নেন এবং আওয়ামী লীগের সাথে এ দাবিতে আন্দোলন করার জন্য আমাদেরকে ঠেলে না দেন।

জামায়াতে ইসলামী নিজেদের রুচি ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হতে বাধ্য হলো। জাতীয় পার্টিও এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের দাবি এটাই ছিল যে, কেয়ারটেকার সরকার কায়েম না হলে বিএনপি সরকারের পরিচালনায় কোন নির্বাচনেই আমরা অংশগ্রহণ করব না।

এ সত্ত্বেও বিএনপি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করল। সকল রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করল। একদলীয় নির্বাচনে প্রায় ৫০টি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো না। এ জাতীয় নির্বাচন কোন মহলেই বৈধতা পেতে পারে না। এ সুযোগে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সচিবালয়ে বিদ্রোহ করে বসল এবং রাজনৈতিক মঞ্চে পর্যন্ত আরোহণ করল।

বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো এবং সংসদে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' আইন পাস করে পরবর্তী নির্বাচনের পথ সুগম করে দিল। এভাবেই কেয়ারটেকার সরকার দাবির আন্দোলন চূড়ান্তভাবে সফল হলো। ১৯৮০ সালে উত্থাপিত এ দাবিটি ১৬ বছর পরে হলেও শেষ পর্যন্ত পূরণ হলো।

বিএনপি '৯৪ সালে দাবি মেনে নিলে—

অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন যে, যদি বিএনপি সরকার ১৯৯৪ সালেই সংসদে পেশ করার জন্য জমাকৃত 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' বিলটি পাস করতে রাজি হতো তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হতো। এতে রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত সুস্থ ও সুন্দর

থাকত। সরকারবিরোধী আন্দোলনের কোন প্রয়োজনই হতো না। গণতন্ত্র সুসংহত হওয়ার ব্যাপারে আরও অগ্রগতি হতো। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পরবর্তী নির্বাচনেও বিএনপিই বিজয়ী হতো।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করার সুযোগ না দিলে আওয়ামী লীগের হাতে এমন কোন ইস্যুই ছিল না, যার ভিত্তিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সাথে পেত। এ আন্দোলনের কারণেই ১৯৯৬-এর জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এত আসন পেয়েছে। এ আন্দোলনের ফলে বিএনপিকে '৯১ সালে সরকার গঠনে সমর্থনদাতা জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করায় জামায়াত উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় বিরাটসংখ্যক ভোটারের আস্থা হারিয়েছে; যারা '৯১ সালে জামায়াতকে প্রচুর ভোট দিয়েছিল। এ আন্দোলন না হলে আওয়ামী লীগ কখনো ক্ষমতায় আসত না। বিএনপি'র হাতেই ক্ষমতা অব্যাহত থাকত।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সুফল

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি না থাকলে আওয়ামী মুসীবত থেকে জাতি ২০০১ সালের নির্বাচনে কিছুতেই মুক্তি পেত না। এ পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য আট-ঘাট বেঁধে নিয়েছিল এবং ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। যদি মহামান্য প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হতো তাহলে জাতি আবার আওয়ামী দুঃশাসনের খপ্পরে পড়ত।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবকের কৃতিত্ব দাবি

আমাদের দেশে এমন একটি রাজনৈতিক মহল রয়েছে, যারা সবকিছুর কৃতিত্ব দাবি করাকে গৌরবজনক মনে করে। যাদের সত্যিকার কৃতিত্ব থাকে, তাদের নিজেদের ঢোল নিজেদেরই পেটাতে হয় না। যাদের আসলেই কোন কৃতিত্ব থাকে না, তারাই দাবি করার মাধ্যমে কৃতিত্ব যাহির করে থাকে। ঐ মহলটি কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক বলে দাবি করতে সামান্য লজ্জাও বোধ করেনি। শেখ হাসিনা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক নেতা এমন জঘন্য নির্লজ্জতা প্রদর্শন করেননি।

১৯৮০ সালের জানুয়ারি থেকেই জামায়াতে ইসলামী 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি'র দাবি করে এসেছে। পত্র-পত্রিকায় এর প্রমাণ রয়েছে। যাদেরকে '৮৪ সালের এপ্রিলে জেনারেল এরশাদের সাথে সংলাপের সময় এ দাবিটুকু সমর্থন করার জন্য সম্মত করা যায়নি, যাদের এ দাবি সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিতে ১৪ বছর বিলম্ব হয়েছে, তারা এর উদ্ভাবক দাবি করে নিজেদেরকে চরম হাস্যাস্পদই করেছেন।

এ কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, ১৯৯৪ থেকে '৯৬ সালের কেয়ারটেকার সরকার দাবির আন্দোলনে আওয়ামী লীগ শরীক না হলে বিএনপিকে এ দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা সম্ভব হতো না। যার যতটুকু কৃতিত্ব তা সবারই স্বীকার করা উচিত।

যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি সেসব দেশের জন্য নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি একটি আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মডেল স্থাপন করেছে। এর প্রতি তৃতীয় বিশ্বের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

এ পদ্ধতি চালু না হলে

এ পদ্ধতি দেশে চালু না হলে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের কোন একটি নির্বাচনও নিরপেক্ষ হতো না। জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসন আরও কতদিন জাতির গর্দানে চেপে থাকত তা কে জানে? প্রধান দু'দলের যারাই ক্ষমতাসীন হতো তাদের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হতো না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ একবার ক্ষমতাসীন হলে আবার বাকশাল মার্কা শাসনব্যবস্থাই চালু হতো এবং ১৫ আগস্ট মার্কা বিপ্লব ছাড়া তা থেকে মুক্তির কোন পথই পাওয়া যেত না। তাই যতদিন জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এ পদ্ধতি পরিবর্তন করা জরুরি মনে না করবেন ততদিনই নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এ পদ্ধতি চালু থাকবে। সংবিধানই এর নিশ্চয়তা দিয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ

কয়েকদিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এমএ সাঈদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত সময়ে তার অফিসে হাজির হলাম। তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বললাম, "আমি কোন দলের পক্ষ থেকে ফরমালি সাক্ষাৎ করতে আসিনি। একান্তই ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানানো কর্তব্য মনে করেই হাজির হয়েছি। যে মহান উদ্দেশ্যে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি'র দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছি তা আপনার দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সার্থকতা লাভ করেছে। শেখ হাসিনার আমলে আপনি এ পদে নিযুক্ত হওয়ায় আপনার সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাবে চারদলীয় জোট এ নিয়োগের প্রতিবাদে হরতাল পালন করেছিল। অথচ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আপনার পরম সাফল্যে এখন শেখ হাসিনা চরম ক্ষুব্ধ।"

তিনি প্রসন্ন বদনে মন্তব্য করলেন, "আমি কোন দল বা ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও ক্ষোভের পরওয়া করি না। আমি আমার দেশ ও জনগণের কল্যাণে সংবিধান অনুযায়ী আমার পবিত্র দায়িত্ব পালনের আন্তরিক চেষ্টা করেছি। মহামান্য প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা ও মাননীয় কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের আন্তরিক সহযোগিতায় এ সাফল্য সম্ভব হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভই হলো নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। দেশের এটুকু খিদমত করার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত।"

ভবিষ্যতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি আরও বেশি সফল হোক এ কামনা প্রকাশ করে বিদায় নিলাম।

১৮২.

বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যার সাথে সাথে বাংলাদেশ বাকশালী স্বৈরশাসনের মহাদুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেল। আগস্ট বিপ্লবের ফলে জনগণ নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করল। ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার ঐতিহাসিক সংহতি দেশবাসীর মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করল। দেশের ভাগ্যোন্নয়নের সূচনা হলো। ১৯৮০ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যা পর্যন্ত দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস থেকে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত ছিল বলা যায়; কিন্তু গণতন্ত্র চরমভাবে বিপন্ন হয়।

দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার কায়েম হয়। সংসদের সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদীয় সরকার পদ্ধতি শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হয় এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি আবার চালু হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সালে আবার কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করতে হয়। ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করার ফলে শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির সমর্থন পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হন।

আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়াকেই আমি 'বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য' হিসেবে অভিহিত করছি। যদি ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে শাসনতন্ত্রের ১৩ নং সংশোধনীর মাধ্যমে 'কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি' আইনে পরিণত না হতো তাহলে দুর্ভাগ্য রজনী কত দীর্ঘ হতো তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোট সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে দেশ আওয়ামী দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেল।

দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালকে আমি 'দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর' বলতে বাধ্য হচ্ছি। তার শাসনকালে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক ও ধর্মীয় দিকের একটিতেও ইতিবাচক ও কল্যাণকর কোন ভূমিকা তালাশ করে পাচ্ছি না। দেশকে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ তিনি নেননি। গড়ার বদলে ভাঙার গানই তিনি গেয়েছেন। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের নামে দেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করেছেন।

আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে যারা দেশবাসীকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন দেশের নাগরিকত্বের মর্যাদা পুনর্বহাল করলেন তাদেরকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়ার অপচেষ্টা করে জনগণকে তিনি চরমভাবে অপমান করেছেন। যে বিপ্লবকে

গোটা জাতি স্বাগত জানাল— তিন সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন পূর্ণ সমর্থন দান করল, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা ও এমপিগণ পর্যন্ত মুশতাক সরকারে শরীক হলেন এবং মুজিব আমলের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন, শেখ হাসিনা ঐ বিপ্লবীদেরকে ফৌজদারি আইনের আওতায় সাধারণ খুনি হিসেবে বিচার করে জনগণের অন্তরে কঠোর আঘাত হানলেন।

তার শাসনকালে তিনি দেশের যে সর্বনাশ করেছেন এর ফিরিস্তি দিতে গিয়ে ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত আমার লেখা প্রবন্ধগুলো 'জীবনে যা দেখলাম'-এর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট পরিবেশন করা প্রয়োজন মনে করছি।

শেখ হাসিনা দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন?

শেখ হাসিনার বিগত পাঁচ বছরের দুঃশাসন ও কুশাসনে বাংলাদেশের সর্বাত্মক সর্বনাশ হয়েছে। কী কী সর্বনাশ তিনি করেছেন এর তালিকা দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা তুলে ধরা অসম্ভব। দেশবাসীর নিকট ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরা আমি জাতীয় কর্তব্য মনে করছি। বিগত পাঁচ বছরের কুশাসনকে আমি 'আওয়ামী লীগের শাসন' না বলে 'শেখ হাসিনার অপশাসন' বলাই অধিকতর সঠিক বলে মনে করি। কারণ তিনিই তার দলের মধ্যে সবচেয়ে দাম্ভিক, হিংস্র, উগ্র, সন্ত্রাসী, কটুভাষী, চাপাবাজ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আক্রমণাত্মক। তার শাণিত জিহ্বা বিষ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়।

সাধারণত দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরমপন্থি ও উগ্র কিছু লোক থাকে। দলীয় প্রধান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। নেতার মধ্যে এ গুণ না থাকলে চলে না। বিশ্বে শেখ হাসিনাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। তার উদারহণ একমাত্র তিনিই। এর প্রমাণ অনেক আছে। দুটো উদাহরণই এর জন্য যথেষ্ট।

চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের ঘটনার পরপরই তিনি সেখানে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল এর সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দান এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি এর বিপরীত আচরণই করলেন। বিনা তদন্তে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে তার দলের সন্ত্রাসীদের এজন্য ভর্ৎসনা করলেন যে, তারা এর প্রতিক্রিয়ায় কেন আট জনের বদলে ৮০ জনকে খুন করল না। তিনি তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে? তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন একটি লাশের বদলে ১০টি লাশ ফেলা হয়। শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি এ হিংস্র ভূমিকা পালন করেননি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্বে অবস্থান করে তিনি এভাবে কেমন করে বলতে পারলেন তা বিশ্বের বিষম বিস্ময়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো, তার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব) রফিকুল ইসলামকে অপসারণ করে মোহাম্মদ নাসিমকে এ পদে নিয়োগদান। যে নরহিংস্রতা ও প্রতিহিংসা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা তিনি জরুরি মনে করেছিলেন, মেজর রফিক সে বিবেচনায় সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হলো।

শেখ হাসিনার এমন একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজন ছিল, যিনি তার মানের সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনে সক্ষম, যার জিহ্বা তার মতোই শাণিত, যিনি গোটা পুলিশ বাহিনীকে দলীয় সন্ত্রাসীদের দোসরের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে সক্ষম, যিনি বিরোধী দলকে চরমভাবে দমনের জন্য তার প্রতিটি নির্দেশ সন্তোষজনকভাবে পালনে পারঙ্গম, যিনি বোমা বিস্ফোরণের নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা তদন্তে ও বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে হামলা, মামলা, জুলুম ও নির্যাতন চালাতে বাহাদুরির পরিচয় দিতে পারেন এবং যিনি বিচারপতিগণকে লাঠির ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনার ইচ্ছা মোতাবেক আদালতে রায় দিতে বাধ্য করার কৌশল জানেন। এ দুটো প্রমাণই আমার এ দাবির জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের সর্বনাশের জন্য প্রধান দায়ী নয়; প্রধান দায়ী শেখ হাসিনা। এ দলের একমাত্র মূলধন শেখ মুজিব। তাই এ দলের নেতৃত্বে মুজিবকন্যার মর্জির সাথে সামান্যও খাপ খায় না—এমন চিন্তার লোকের কোন স্থান নেই। যদি কেউ সামান্য ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে তাহলে তার দশা অবশ্যই ড. কামাল হোসেন ও কাদের সিদ্দিকীর মতোই হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ বংশীয় নেতৃত্ব চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারীর যেমন দাপট থাকা স্বাভাবিক, তা শেখ হাসিনার মধ্যে থাকবে না কেন? 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely' বিশ্বের একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এ বাক্যটি শেখ হাসিনার বেলায় শতকরা একশ ভাগ প্রযোজ্য। তাই আওয়ামী লীগ নয়, শেখ হাসিনাই গত পাঁচ বছরের সকল কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বের অধিকারী বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তিনি দেশের কী কী মহাসর্বনাশ সাধন করেছেন এর ধারাবাহিক বিবরণ দেশবাসীর খিদমতে পেশ করতে চাই।

প্রথম সর্বনাশ : বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি বানানো

১৯৯১-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ হাসিনার বক্তব্য, কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গি আওয়ামী লীগ নেতাদের স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিল। আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট তিন ভাগে বিভক্ত হবে এবং তিনি ক্ষমতাসীন হবেন—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তার ভাব-ভঙ্গি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির সমর্থক ভোটাররা সবাই আওয়ামী লীগবিরোধী।

তাই ১৯৯৬-এর নির্বাচনী অভিযানে তিনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রচারাভিযানের অতি নিকটবর্তী সময়ে তিনি হজ্জে যান। ইহরামের রুমাল মাথায় বাঁধা অবস্থায় তসবীহ হাতে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সারা দেশে নির্বাচনী সফরে তিনি ইহরামের রুমাল পরিহিতা অবস্থায়ই জনগণের সামনে তাপসীর ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময়ও মাথায় ঐ পট্টি এবং হাতে তাসবীহ ছিল। '৯৬-এর নির্বাচনী বক্তব্যে তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাষা ব্যবহার করেছেন। চরম বিনয়ী ভাব প্রদর্শন করে তার পিতার কুশাসনের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছেন। একটিবার জনগণের খিদমতের সুযোগ দেওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

আওয়ামী শাসন সম্পর্কে নতুন ভোটারদের অজ্ঞতা

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর আওয়ামী দুঃশাসন যারা দেখেনি, ভোটারদের মধ্যে ১৯৯৬-এ তাদের সংখ্যা বিরাট হওয়াই স্বাভাবিক। '৭৫-এ যাদের বয়স ১০-এর বেশি ছিল না এবং '৭৭ পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তারা '৯৬-এ ভোটার ছিল। এ বয়সের লোকেরাই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। এ বিপুলসংখ্যক ভোটারের আওয়ামী শাসনের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতাই ছিল না। আওয়ামী লীগ যে কী চিজ, তা তারা '৯৬ থেকে '০১-এ প্রথম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

যারা শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন দেখেছে তাদের মধ্যে আলহাজ্জ শেখ হাসিনার সফল নির্বাচনী অভিনয়ে কিছু লোকের এ ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ আগের মতো নয়।

তাছাড়া ১৯৯১ সালে বিজয় নিশ্চিত মনে করে আওয়ামী লীগ জাল ভোট, ব্যালট ডাকাতি, ভোটকেন্দ্র দখল ইত্যাদিতে যে যোগ্যতার অধিকারী তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু ১৯৯৬-এর নির্বাচনে এ বিষয়ে গুরুত্বসহকারেই অবদান রেখেছে। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। বহু ভোটকেন্দ্রে প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেনি।

এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শতকরা ৬৩ জন ভোটার ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ১৫১টি আসনে জয়ী হতে ব্যর্থ হয়েছে। এরশাদ কারামুক্তির আশায় সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করায় শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু

শেখ হাসিনার আসল এবং একমাত্র নির্বাচনী ইস্যু ছিল একটিবারের জন্য জনগণের খিদমত করার আকুল আবেদন, "২১ বছর আগে আমরা যা ভুল করেছি তা মাফ করে একবার ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।" রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতি দাবি করতেন। তবে আসল ইস্যু ছিল একবার মাত্র ক্ষমতা দেওয়ার আবেদন।

মুজিব হত্যার বিচার দাবি করা দূরের কথা, গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও মুজিব হত্যা সম্পর্কে কোন কথা তিনি বলেননি। ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ এবং ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনেও তিনি মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি। তৃতীয় ও পঞ্চম জাতীয় সংসদে তিনি বিরোধীদলীয় নেতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে কখনও মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি।

কোন্ পটভূমিতে মুজিব হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছিল এবং জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল—এ বিষয়ে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। অথচ ক্ষমতায় এসেই মুজিব হত্যার বিচার করা হাসিনা সরকারের প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে গেল। বিবিসি'র প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমানের লেখার কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, শেখ হাসিনা নিজের মুখেই তাকে নাকি বলেছেন, আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই রাজনীতি করছি।

শেখ হাসিনার ৩ দফা কর্মসূচি

গত পাঁচ বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে তিন ধরনের কর্মসূচি পালন করেন ঃ

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. দেশে যত রকম প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও সংস্থা রয়েছে, যা কোন ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত নয়, সেসবের সাথে তার পিতামাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়দের নাম সম্পৃক্ত করা।

৩. দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হল, হাটবাজার, ঘাট, ব্যাংক, বীমা, সরকারি খাস জমি ও বস্তি এলাকা দলীয় লোকদের দখলে আনা এবং সকল প্রকার পেশাজীবী সমিতির কর্তৃত্ব দলীয় লোকদের হাতে তুলে দেওয়া।

জাতির পিতা ইস্যু

কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি জনগণের আবেগের সাথে জড়িত। শক্তি প্রয়োগ করে বা আইনের দাপটে ঐ আবেগ সৃষ্টি করা যায় না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব জনগণের কাছে অবশ্য স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তারই নেতৃত্বে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। তখন আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসনই কায়েম ছিল। দলীয় লোকেরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বললেও দেশের সংবিধান জনগণকে জাতির পিতা বলতে বাধ্য করেনি। তিন বছরের মধ্যে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তার শাসনামলে জনগণ চরম হতাশায় পতিত হয়। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোক মারা যায়। তার দলের লোকেরা রিলিফের মাল লুটপাট করায় জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। শেখ মুজিব নিজেই তার দলকে 'চোরের খনি' অভিধায় উল্লেখ করেন। রিলিফ থেকে নিজের ভাগের কম্বলটিও উদ্ধার করতে তিনি ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতিসচেতন লোকেরা মেজর জলিলের নেতৃত্বে জাসদের সাথে জড়িত হয়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে '৭৫-এর জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয় এবং একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়। দেশে স্লোগান চালু করা হয়- 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'।

এভাবে শেখ মুজিব দেশের মহারাজা হয়ে চরম একানায়কত্ব কায়েম করেন। আয়তনে খুব ছোট এ বাংলাদেশটিতে ৬১ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গভর্নর (রাজা) নিযুক্ত করেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি দল গঠন করেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ সকল পেশার লোকদের বাকশালে যোগদান করতে নির্দেশ দেন।

১৫ আগস্টের পরপরই ৬১ জন গভর্নরের শপথ গ্রহণ করার কথা ছিল, প্রত্যেক এলাকার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী এবং 'বাকশাল' দলটি একজন গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা ছিল। যদি রুশমার্কা এ ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত, তাহলে এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন পথই আর থাকত না। শেখ মুজিবের বংশীয় রাজতন্ত্রই কায়েম হয়ে যেত। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সকল পথ এভাবেই বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এ মারাত্মক ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি '৭৫-এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান না ঘটত তাহলে হয়ত আজও এ দেশ শেখ বংশীয় গোলামির জিঞ্জিরেই আবদ্ধ থাকত।

১৫ আগস্টের প্রতিক্রিয়া

খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আওয়ামী লীগের এমপিগণ মুশতাক-সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদও করলেন না; বরং শেখ মুজিবের ১৬ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। সেনাপ্রধানও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শক্তিশালী বাকশালের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ মিছিল বের হলো না। গভর্নর পদে নিয়োগপ্রাপ্তদেরও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে কথা ঐ সময় যাদের বয়স অন্তত ১০/১২ বছর ছিল তাদেরও স্পষ্ট মনে থাকার কথা। গত ১৫ জুলাই ২০০১ কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার সাথে সাথে রাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুলসংখ্যক জনগণ মুক্তির আনন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছে, '৭৫-এর আগস্টে জনগণ এর চেয়েও বহুগুণ বেশি আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আনন্দে মেতে উঠেছিল।

আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। সেখানকার পত্রিকায় জনগণের যে প্রতিক্রিয়া আমি পড়েছি তা হুবহু উদ্ধৃত করছি—"It was Friday, Curfew was lifted for two hours to facilitate Friday prayers. People in huge number passed the streets in jubilant mood as if they were going to observe any National Festival." "দিনটি শুক্রবার ছিল। জুমার নামাযের জন্য কারফিউ দু'ঘণ্টার জন্য তুলে নেওয়া হয়। জনগণ বিরাটসংখ্যায় আনন্দমুখর ভঙ্গিতে রাজপথে চলছিল, যেন তারা কোন জাতীয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছে।"

ঐ সময় যারা ঢাকায় ছিলেন তারাই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, লন্ডনের পত্রিকা সঠিক রিপোর্ট দিয়েছে কি-না। ১৯৯৪-এর জুন মাসে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পর পল্টন ময়দানসহ বহু জনসভায় আমি লন্ডনের পত্রিকার উক্ত উদ্ধৃতি দেশবাসীকে শুনিয়েছি। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, আমার বক্তৃতার অন্যান্য পয়েন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এ পয়েন্টটা যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

জনসভায় এ ঘটনা উল্লেখ করে আমি মন্তব্যও করেছি, ১৫ আগস্টের ঘটনা যদিও দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনেনি, তবুও জনগণের মধ্যে উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিবকে জনগণ জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করেনি; বরং তার কুশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম স্বস্তিবোধ করেছে এবং আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। এতে

প্রমাণিত হয়, শেখ মুজিব জাতির পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিতই হননি। যদি হতেন তাহলে তিনি নিহত হওয়ার কারণে রাস্তায় নেমে জনগণ অবশ্যই বিলাপ করত। বিলাপ করা তো দূরের কথা, কেউ প্রকাশ্যে 'ইন্না লিল্লাহ' পড়েছিল কি-না, তাও জানা যায়নি।

আওয়ামী লীগ কেন প্রতিবাদ করল না?

শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক', 'বঙ্গবন্ধু' ও 'এক দেশ এক নেতা'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্টের এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত কেন করল না? শেখ হাসিনা '৮১ সালে দিল্লি থেকে দেশে ফিরে আসার পর এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য কোন কর্মসূচি কেন গ্রহণ করলেন না? জাতীয় সংসদে '৮৬ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেতা থাকা অবস্থায় ১৫ আগস্ট সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তাব কেন পেশ করলেন না? জাতির পিতার খুনিদের বিচার করার দাবিতে কোনো আন্দোলন কেন করলেন না? '৮৬, '৯১ ও '৯৬-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর কোন একটিতেও একে কেন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করলেন না?

এসব কেন'র জবাব একটাই– তারা বাস্তবে লক্ষ্য করেছেন যে, এই ইস্যুতে জনগণের সামান্য সাড়াও পাওয়া যাবে না। সাধারণ জনগণের অন্তরে শেখ মুজিবের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যে নেই সে কথা বুঝতে তাদের বেগ পাওয়ার কথা নয়।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুজিব হত্যার বিচার দাবি

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আরোহণের পর মুজিব হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ খুনির বিচারের জন্য যে আইন দেশে আছে সে ফৌজদারি আইনেই বিচারের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কোর্ট গঠন করেন। খুনের বিচারের যে আইন রয়েছে তা ঐ খুনিদের জন্য, যারা ব্যক্তিগত বা অন্য কোন স্বার্থে কোন মানুষকে খুন করে।

মুজিব হত্যা কি সে ধরনের খুন? কোন দেশে সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলে এটাকে সফল বিপ্লব বলা হয়। যদি বিপ্লব ব্যর্থ হয় তাহলে অভ্যুত্থানকারীরা দণ্ড ভোগ করে। আর যদি সফল হয় তাহলে তারাই ক্ষমতাসীন হয়।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট যে সেনা-অভ্যুত্থান হয় তা সফল বিপ্লব হিসেবেই গণ্য ছিল। তারা ব্যাপক গণসমর্থন পেয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীও তা মেনে নিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক অস্থিরতাও সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামী লীগই ক্ষমতাসীন ছিল। অন্য কোন দল ক্ষমতাসীন হয়নি।

'৭৫-এর ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং সিপাহিরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার এক বিস্ময়কর যৌথ বিপ্লব সফল হয়। এতেও অনেক সেনা অফিসার নিহত হয়। এর ফলেই জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।

'৭৫-এর ১৫ আগস্টের সেনাবিপ্লব, ৩ নভেম্বরের প্রতিবিপ্লব এবং ৭ নভেম্বরের সিপাহিবিপ্লবে নিহতদের বিষয়টিকে ফৌজদারি আইনের সাধারণ খুন হিসেবে গণ্য করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই এসব খুনের জন্য কোন মামলাও হয়নি। শেখ মুজিবের

শাসনামলে রক্ষীবাহিনী দিয়ে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করা ও গ্রেপ্তার অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে বিনা বিচারে হত্যা করা কি '৭৫-এর আগস্ট ও নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড থেকেও আইনের দৃষ্টিতে অধিক জঘন্য নয়?

ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে ঐসব খুনের বিচারও জরুরি। শুধু শেখ মুজিবের বিচার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি একটাই– শেখ মুজিবকে 'জাতির পিতা'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শক্তি প্রয়োগ করে আদায় করা যায় না। '৭৫-এর আগস্টে মুজিব হত্যার যে প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণের অন্তরে শেখ মুজিবের প্রতি সামান্য ভালোবাসাও অবশিষ্ট ছিল না।

শেখ হাসিনা তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। সর্বত্র শেখ মুজিবের ফটো রাখা বাধ্যতামূলক করে আইন পাস করেছেন। তার মূর্তি বানিয়ে মহামানবের মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছেন। এসব করে কি তার মর্যাদা সত্যিই বৃদ্ধি পেয়েছে? দেশের মানুষ কি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে ভালোবাসে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে?

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় কর্মসূচি

দেশের যেসব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার নামের সাথে কোন মানুষের নাম যুক্ত নেই, সেসবের সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও আত্মীয়-স্বজনের নাম যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'যমুনা সেতু' নামটি 'বঙ্গবন্ধু সেতু' হওয়ার বহু আগে থেকেই লোকের মুখে মুখে ছিল। এর সাথে বঙ্গবন্ধু শব্দ জুড়ে দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু' নামকরণ করা হয়; কিন্তু জনগণ একে 'যমুনা সেতু'ই বলে। তাই যমুনা শব্দ বাদ দিয়ে শুধু 'বঙ্গবন্ধু সেতু'ই নামফলকে লাগিয়ে এ নাম বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু আমি উত্তরবঙ্গে বহু জনসভা ও পথসভায় লোকদের এ সেতুর নাম জিজ্ঞেস করলে তারা 'যমুনা সেতু'ই বলল। মানুষের মনের ওপর জোর-জবরদস্তি চলে না। পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে বহু বছর থেকে সবাই পিজি হাসপাতালই বলে এসেছে। একে বিশ্ববিদ্যালয় মানে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু নাম এতে যুক্ত করা হলো। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ নাম যুক্ত করলে অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানের পরিচিত নাম বদলে শেখ হাসিনার পিতার উপাধি যুক্ত করা কি শোভন হয়েছে? নমুনাস্বরূপ এ দুটো উদাহরণ দেওয়া হলো। অগণিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা ও ভাই-বোনের নাম যুক্ত করা দ্বারা কি দেশ ও জনগণের কোন খিদমত বা কল্যাণ হয়েছে? বাংলাদেশটা যেন তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাই সর্বত্র তাদের নাম কায়েম রাখতে হবে।

তার শাসনের শেষ তিন মাসে এমন অগণিত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যার নির্মাণকাজ কবে শুরু হবে তা অনিশ্চিত। শেষ ১৫ দিনে তো দৈনিক তিন-চারটি করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দু'দিন

জোর করেই ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে আরও কয়েকটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। এর উদ্দেশ্য একটাই, তার নামফলকের কারণে নতুন সরকারের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জায়গা যাতে তেমন অবশিষ্ট না থাকে।

সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। প্রশাসন ও পুলিশকে তিনি চরম দলীয়করণের ভিত্তিতে যেভাবে সাজিয়ে রেখে গেলেন সে আবর্জনা অপসারণ করতেই কেয়ারটেকার সরকারের দু'মাস লেগে যাওয়ার কথা। অথচ তিনি চরম স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়ে দু'দিন বিনষ্ট করে কেয়ারটেকার সরকারের জন্য ৮৮ দিন সময় দিলেন। ১৫ তারিখে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর দাপট দেখিয়ে রেডিও ও টিভিকে অপব্যবহারের মহৎ উদ্দেশ্যেই ঐ দু'দিন জোর করে ক্ষমতায় থাকলেন। দেশটা যেন তার পৈতৃক সম্পত্তি। তাই মহামান্য প্রেসিডেন্টও তার এ স্বেচ্ছাচার রোধ করার সাহস পাননি। এমনকি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের শপথ অনুষ্ঠানের সময়টুকুও তার নির্দেশে বঙ্গভবনের মুদ্রিত দাওয়াতপত্রে পরিবর্তন করতে হয়। তার সে দাপট এখনও অব্যাহত আছে। তার সেট করা প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করায় তিনি কেয়ারটেকার সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যা-তা বলে চলেছেন। তার দাবি এই যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তার এমনই মর্যাদা যে, তার মনোনীত সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি করার কোন অধিকারই অনির্বাচিত সরকারের থাকতে পারে না।

পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলি স্বত্ব চাই

শেখ হাসিনার পাঁচ বছর দুই দিনের শাসনকালে দেশের সব কিছু তার আত্মীয় ও দলীয় লোকদের মৌরসী-পাট্টা ছিল। এ বিষয়ে সারা দেশের ফিরিস্তি একসময় হয়তো তৈরি হবে অন্যায় দখল উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে। এখানে স্বল্পপরিসরে কিছু উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি—

১. সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য জেনারেল থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার কারণে একজন অবসরপ্রাপ্ত অযোগ্য জেনারেলকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সেনাবাহিনীর মান বৃদ্ধি করেছেন, না হ্রাস করেছেন তা পরবর্তী সরকার তদন্ত করলেই বিস্তারিত জানা যাবে। তিনি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বিরাট একটি খিদমত করেছেন। সকল ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামীপন্থি কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সেনাবাহিনীর লক্ষাধিক জনশক্তিকে হাসিনাপন্থি বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। ঐ জঘন্য নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে বলে জানলাম।

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ করে শেখ হাসিনার বশংবদ লোকদের বসানো হয়েছে। শেখ হাসিনা তার পাঁচ বছরে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেই নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ হাসিনার নিয়োজিত ভাইস চ্যান্সেলরদের উপর সবচেয়ে বড় ও মহান দায়িত্ব ছিল, শেখ হাসিনার সোনার ছেলেদেরকে হলে ও ইউনিভার্সিটিতে

পূর্ণ দখলি স্বত্ব দান করা এবং অন্যান্য ছাত্রসংগঠনকে উৎখাত করে ছাত্রলীগকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেওয়া।

৩. দেশের সকল কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান পদে দলীয় নির্ভরযোগ্য লোকদের বসিয়ে দেওয়া হয়; যাতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়োগ না পায়।

৪. যত পেশাজীবী সমিতি রয়েছে তাতে নেতৃত্বের পদে দলীয় লোকদের বসানোর জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে যত রকম ষড়যন্ত্র ও নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করা সম্ভব, তা করতে শেখ হাসিনা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতি ও জেলা বার সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমিতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই দলীয়করণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে তিনি ত্রুটি করেননি।

৫ সম্পদ দখলের ব্যাপারটা বিরাট। ব্যাংক, বীমা, গাড়ি, সরকারি খাস জমি, বস্তি, হাট-বাজার ও ঘাটের ইজারা, দুর্বল লোকদের বাড়ি-ঘর ও জমিজমা দখল ইত্যাদির জন্য শেখ হাসিনা তার দলের সবাইকে অবাধে লাইসেন্স দিয়েছেন। মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্র, প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা ও দলীয় ক্যাডার হলে তো পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই বাধা দেওয়ার। থানার দারোগা আসল দারোগা নয়। দলীয় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দারোগার কিছুই করার সাধ্য ছিল না। তাই কোন দখলি কেসই থানা গ্রহণ করেনি। এভাবে গোটা দেশে আওয়ামী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা হয়। কেউ মামলা করলে সে বাদীকেই পালিয়ে জান বাঁচাতে হয়। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনে আওয়ামী লীগের বিরাটসংখ্যক নতুন ধনপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফের সম্পদও তারা দখল করে। শেখ হাসিনার পাঁচ বছর শাসনামলে তার দলের কোন কর্মীই হয়তো সম্পদ আহরণ থেকে বঞ্চিত হয়নি। একটি বিরাট ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন, পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হতে না পারলেও বিরাট শক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা প্রয়োগ করে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা কায়েম করতে পারবেন।

৬. দখলের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেখ হাসিনা কর্তৃক গণভবন দখল। তিনি জাতির পিতার কন্যা, আওয়ামী লীগপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছোটখাটো কোন সম্পত্তি দখল করলে মোটেই মানায় না। তিনি দাপটের সাথেই সাংবাদিকদের কাছে পূর্ণ আস্থাসহকারে দাবি করেছেন, যদ্দিন তিনি রাজনীতি করবেন তদ্দিন গণভবনেই থাকবেন।

পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেই তো তিনি অল্পদিনের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাই তিন মাস পরই আবার যখন তাকে গণভবনে আসতেই হবে, তখন খামাখা তল্পিতল্পা নিয়ে যাওয়া-আসার প্রয়োজন কি? কিন্তু শেখ হাসিনা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দেখলেন যে, তারই সুপারিশকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। যে প্রধান বিচারপতি তার মন্ত্রীদের লাঠির ভয়ে চুপ

থাকতে বাধ্য ছিলেন, তিনি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হয়ে তার সেটকৃত লোকদের বদলি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সকল রাজনৈতিক দলের দাবিতে এবং কেয়ারটেকার সরকারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য তাকে গণভবন ত্যাগ করতে বাধ্য করাও অসম্ভব নয়। তাই ইজ্জত থাকতেই সরে পড়া উচিত মনে করে হয়তো তিনি গণভবন ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু গণভবন দখল করে যে কলঙ্কের ভাগী হলেন তা তো স্থায়ীভাবে তার কপালে লিখিত থাকবে।

১৮৩.

দ্বিতীয় সর্বনাশ : গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' প্রবচনটি মনে আসে, যখন শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' বলা হয়। তার কথা, কাজ, মেজাজ ও আচরণে গণতান্ত্রিকতার সামান্য গন্ধও যে পাওয়া যায় না, সে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই লিখছি। এ দেশকে সোনার বাংলা বানানোর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন এর সকল স্বপ্নই তার পিতা দেখতেন বলে তিনি দাবি করেন। যমুনা সেতু নাকি তার পিতারই স্বপ্ন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও তারই স্বপ্ন। শেখ হাসিনা তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই তার পাঁচ বছরের শাসনামলে সব কিছু করেছেন। আবার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবশিষ্ট স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করার অভিলাষ রাখেন। সত্যি সত্যিই তার পিতা এতসব স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা, তা দেশবাসীর জানার সুযোগ হয়নি। তবে একটি মহাস্বপ্ন যে তিনি দেখেছিলেন এবং তা কার্যকর করার আইনগত ও প্রশাসনগত প্রস্তুতি যে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সে কথা দেশ-বিদেশের সবার জানার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এ দেশের একচ্ছত্র বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন। ৬১ জন গভর্নরের গভর্নর জেনারেল হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য প্রথমত ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে নিলেন।

আওয়ামী লীগের বিশাল পার্লামেন্টারি পার্টি পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করে আদর্শ গণতান্ত্রিক দলের গৌরব অর্জন করে। বিনা আলোচনায় ও বিনা প্রতিবাদে সংসদে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনতন্ত্রকে তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে পরিণত করা হলো এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাকশাল' নামক একটি মাত্র দলে সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশবাসী, সবাইকে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো। 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' স্লোগান চালু করে গণতন্ত্রের বাংলাদেশী সংস্করণ আবিষ্কার করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন-এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস কোত্থেকে পেলেন তা ঐ সময় ও পরিবেশে অবশ্য বিস্ময়েরই বিষয়। ইতঃপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, শেখ হাসিনা যা কিছু করেছেন সবই তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই করেছেন। তাহলে শেখ মুজিবের বাকশাল পদ্ধতির শাসনও তার

মহাস্বপ্ন ছিল, তা কায়েমের জন্য মুজিবকন্যার সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। কারণ, এটাই ছিল শেখ মুজিবের সেরা স্বপ্ন। কিন্তু ঐ পদ্ধতি জনগণের কাছে এতটা ঘৃণিত ছিল যে, শেখ হাসিনা তার পিতার দেওয়া প্রিয় 'বাকশাল' নামটি বহাল করা কৌশলের খেলাপ মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনার গোটা শাসনামলে তার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাকশালী মনোবৃত্তি স্পষ্ট। তিনি সংসদকে পাশ কাটিয়ে এবং বিরোধী দলের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা (পার্বত্য তিনটি জেলা) সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা সর্বদিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে দেশবাসী মনে করে। বিশেষ করে অউপজাতি বাংলাদেশীদের ঐ তিন জেলায় নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জেলাগুলোকে উপজাতি এলাকা ঘোষণা করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য দেশের ঐ অংশে সম্পত্তির মালিক হওয়া ও ধনবান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পানিচুক্তি করা হয়েছে।

বাকশালী সংসদ

জাতীয় সংসদকে বাকশালী পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

স্পিকারকে শেখ হাসিনা পূর্ণ আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তার মন্ত্রীগণ বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিরোধী দলের প্রতি চরম অশালীন ভাষা ও আপত্তিকর আচরণ করে সংসদ বর্জন করতে বাধ্য করেছেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত রাখার আসল দায়িত্ব সরকারের। এতে অক্ষম হলে সরকার চরম ব্যর্থ বলে বিশ্বে গণ্য হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম আস্থাও যে শেখ হাসিনার নেই, এতে তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার আচরণে সে কথাই বোঝা গেল যে, তিনি বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন; যাতে বাকশালী পদ্ধতিতে যে আইন খুশি তা বিনা বাধায় পাস করিয়ে নিতে পারেন। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য চরম কলঙ্কের পরিচায়ক। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে বিনা বিচারে আটক করে গণতন্ত্রের যে সর্বনাশ করে গেছেন, শেখ হাসিনা ঐটুকুকেও যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ ঐ আইনে যত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করলে সবার আটকাদেশই অবৈধ ঘোষণা হয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক বিরোধীদের অন্যায়ভাবে আটক রাখার বাকশালী প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন আইন তার দরকার, যাতে হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, জামিন পর্যন্ত না পায়। তাই একদলীয় সংসদে 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালা-কানুন পাস করা হয়। শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির দোহাই দিয়ে সন্ত্রাস দমনের মহান উদ্দেশ্যেই এ আইন করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। বিরোধী দল সংসদের বাইরে থেকে আপত্তি জানায় যে, এ আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

নিশ্চয়তা দিয়ে শেখ হাসিনা এ আশঙ্কা অমূলক বলে জনগণকে আশ্বাস দিলেন। এ কালা-কানুন পাস হওয়ার পরপরই দেখা গেল—একদিকে সরকারি দলের মাস্তানদের সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পাইকারি হারে আসামি করার ব্যবস্থা নিলেন। ছাত্রদের উপরও এই আইন প্রয়োগ করা হলো। এমনকি মাদরাসার নিরীহ ছাত্র ও আলেম সামাজের ওপরও সন্ত্রাসী হিসেবে এ আইন প্রয়োগ করে নির্যাতন চালানো হয়।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বিনা ওয়ারেন্টে রাত ১২টায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বায়তুল মুকাররম মসজিদে লোকেরা আশ্রয় নিলে পুলিশ সেখানেও হামলা করে ৫/৬শ' লোককে (সাধারণ মুসল্লীসহ) গ্রেপ্তার করে বাকশালী গণতন্ত্রের নমুনা দেখাল।

বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা

আমাদের দেশে কোন সরকারের আমলেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার শাসনতান্ত্রিক দাবি পূরণের চেষ্টা করা না হলেও ইতঃপূর্বে কখনও বিচার বিভাগের উপর প্রকাশ্য হামলা করা হয়নি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অন্যতম ভিত্তি। শাসন বিভাগের জুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হলো বিচার বিভাগ। শেখ হাসিনার আমলেই সর্বপ্রথম হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের উপর জঘন্য হামলা শুরু হয়। এ হামলার উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মিথ্যা মামলা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়, হাইকোর্ট তাদের জামিন দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন। বিচারপতিদের কাছে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় পায় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হলে সুপ্রিম কোর্ট তাকে সতর্ক ও সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আদালত থেকে এমন ভর্ৎসনা শুনতে হলো।

আদালত তো অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তাই শেখ হাসিনার মতো কটুভাষীর মনে আদালতের সতর্কবাণী সামান্য লজ্জাবোধও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আবারও বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আদালত আবারও তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আদালতের উপর মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য সংসদীয় নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে সংসদ অধিবেশনেই তিনি বিচারপতিদের কঠোর সমালোচনা করলেন। এ বিষয়ে তিনিই বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় মহাবীর (!) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বিরাট জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। তাতে

বিচারকদের হুমকি দেওয়া হয় যে, সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হবে তা আওয়ামী লীগ জানে।

বিচারপতিদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অমুক মাসের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে হবে। কি রায় দিতে হবে সে কথা ঘোষণা করতেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিধা করেননি। শেখ মুজিব বাকশালীব্যবস্থায় বিচারপতিদের যে অসহায় অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন, তা-ই শেখ হাসিনার কাছে আদর্শ বলে মনে হওয়ার কারণেই তিনি এবং তার নির্দেশে মন্ত্রীগণ এ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করলেন। চরম স্বৈরশাসকদের দেশেও বিচারপতিদের প্রতি এমন পাশবিক আচরণের কোন নজির নেই।

সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার সাময়িক সরকার হিসেবে গণ্য। দলীয় ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয়ী দল ক্ষমতাসীন হয়। আমলারা তথা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্থায়ী সরকার। তারা কোন দলের পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তি নয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। জনগণের সেবক হিসেবে তারা যে দলই ক্ষমতাসীন হয় সে দলের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন। এটাই গণতান্ত্রিক রীতি।

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক

নির্বাচিত সরকার দলীয় ম্যানিফেস্টোর পক্ষে জনগণের কাছ থেকে যে ম্যান্ডেট পেয়েছে সে অনুযায়ী যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আমলা ও কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কি-না সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এর ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে বিষয়েও নির্বাচিত সরকার তদারকি করবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যেসব 'রুলস অব সার্ভিস' এবং 'কোড অব কন্ডাক্ট' রয়েছে তা তারা যথাযথভাবে মেনে চলছে কি-না তা দেখার দায়িত্বও নির্বাচিত সরকারের। সরকারি কর্মকর্তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পায়। কোন রাজনৈতিক পরিচয় সেখানে ধর্তব্য নয়। নিয়োগ পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় যত রকম ট্রেনিং দেওয়া হয় এর মধ্যে তাদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকাও অন্যতম।

নির্বাচিত সরকার স্থায়ী সরকারকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবে এবং উপরিউক্ত দুটো নীতি অনুযায়ী তদারকি করবে। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের এ মান এখনই আশা করা যায় না।

কিন্তু আমলাদের ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান চালু ছিল শেখ হাসিনা তাও ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন।

চরম স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসন চালু করে সরকারি কর্মচারীদের বাকশালী মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে মারাত্মক রীতি শেখ হাসিনা চালু করলেন তার ফলেই কেয়ারটেকার সরকার বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হলো। 'রুলস অব সার্ভিস' ও 'কোড অব কন্ডাক্ট' অমান্য করে সরকারের দেশ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের পক্ষে কাজ করার জন্য শেখ হাসিনার বাধ্যবাধকতায় তাদের নিরপেক্ষ

চরিত্র ধ্বংস হয়েছে। এতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন তাহলে এসব মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের আবার দল-নিরপেক্ষ হিসেবে সংশোধন করা সম্ভব হতে পারে। এরা জাতির সম্পদ। এদের ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা দেশকে শেখ হাসিনার মতো গণতন্ত্রের দুশমন থেকে রক্ষা করুন।

রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই জনসভা, মিছিল, হরতাল ও প্রতিবাদ করার অধিকার স্বীকৃত। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এসব অধিকার তিনি ভোগ করে এসেছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত দেশে এসব অধিকার মোটামুটি বহাল ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে এ অধিকারও হরণ করা হয়েছিল।

বিগত হাসিনা সরকারের আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অধিকার ব্যাপকভাবে হরণ করা হয়। বিরোধী দলের আহূত জনসভার স্থলে একই সময় পাল্টা জনসভা ডেকে প্রশাসন কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি জঘন্য পদ্ধতির প্রচলন। এটা শেখ হাসিনারই অনন্য (!) অবদান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও তাদের ছাত্রসংগঠন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে এ আচরণ বহু এলাকায় করেছে।

প্রত্যেক সরকারের আমলেই বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে। হরতাল চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে রাজপথে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করাতেও হরতাল পালনকারীরা কখনও আপত্তি করেনি। পুলিশ কোন বাড়াবাড়ি না করলে শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালনের ঐতিহ্য এ দেশে চালু ছিল।

শেখ হাসিনার আমলে হরতালের বিরুদ্ধে দলীয় ক্যাডারদের নেতৃত্বে এবং পুলিশের ছত্রছায়ায় রাজপথ দখলের বাকশালী পদ্ধতি নতুন করে চালু করা হয়েছে। বিরোধী দলের মিছিলে হামলা, পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা ও মহিলাদের শাড়ি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার মতো ঘটনা পূর্ববর্তী কোন সরকারের আমলেই ঘটেনি। শেখ হাসিনার সশস্ত্র ক্যাডারদের জঙ্গি মিছিলে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয় ছিল। বাকশালী গণতন্ত্র চালুর এ অপচেষ্টা ইতিহাস হয়েই রইল।

গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা

গণতান্ত্রিক বিশ্বে এ কথা স্বীকৃত যে, সরকারের কাজ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা, এর এক বিভাগকে অপর বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়া, কোন বিভাগ যাতে ক্ষমতা ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেজন্য এই তিন বিভাগের সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা। সর্বোপরি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা গণতন্ত্রের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও দেশে উপরিউক্ত গণতান্ত্রিক মান যথাযথভাবে কায়েম ছিল না। মাত্র ১৯৯১ সাল থেকে নতুন করে এ মানের গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু

হয়। '৯৬ সাল থেকে আমাদের এ পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান ছিল তাও শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গেলেন। তিনি আইনসভাকে একদলীয় (বাকশালী) সংস্থায় পরিণত করলেন। শাসনক্ষমতাকে স্বৈর পদ্ধতিতে পরিচালনা করে জাতীয় সংসদকে দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করলেন। পল্টনী ভাষায় বক্তৃতা করে সংসদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করলেন।

প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে শাসন বিভাগের মান চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। আর বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের আজ্ঞাবহ বানানোর অপচেষ্টার ফলে আইনের শাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এসব কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব ও শেখকন্যা দেশ গড়ার কাজে কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। তারা ধ্বংসের যোগ্যতা নিয়েই রাজনীতি করেছেন।

তৃতীয় সর্বনাশ : ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র

ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে শেখ হাসিনা হজ্জ ও ওমরাহ করেন। পত্রিকা ও টেলিভিশন থেকে তা জানা যায়। হজ্জ-ওমরাহ করলে তো নামায অবশ্যই পড়তে হয়। তিনি হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়েন এবং রোযাও রাখেন।

আমার প্রশ্ন হলো, তিনি নামায-রোযা-হজ্জ করেন কার হুকুমে? নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যেই এসব করেন। এসব হুকুম তিনি কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন, কুরআন থেকে পেয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব হুকুম করেছেন সেসব মানতে তিনি অস্বীকার করেন কোন্ যুক্তিতে? তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কী? গোটা বিশ্বে এর অর্থ হলো, "ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যে ধর্ম খুশি পালন করুক। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা চলবে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অতীত-অভিজ্ঞতা ও বর্তমান জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এসব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।"

শেখ হাসিনা যে এ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদেই বিশ্বাসী, তা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিবের আমলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তা উৎখাত হয়ে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সংবিধানবিরোধী, অথচ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই শাসনতন্ত্রবিরোধী এ মতবাদকে জবরদস্তিমূলকভাবে জাতির ওপর চাপিয়ে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সরাসরি সাহায্য এবং রাশিয়ার পরোক্ষ সহযোগিতার ফলে শেখ মুজিব হয়তো বাধ্য হয়ে ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এবং রাশিয়ার চাপে সমাজতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। এ দেশের মাটিতে চরম ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদের কোন শিকড় না

থাকায় ১৯৭৭ সালে এ দুটোই শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার দলীয় ম্যানিফেস্টোতে এ দুটো মতবাদ না থাকলেও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালান।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চরম কুফরী মতবাদ। ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে কাফির ও অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আল্লাহর অগণিত হুকুমকে মানতে অস্বীকার করার নামান্তর। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনে যত হুকুম আছে তার সবই মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে এই মতবাদে। এর চেয়ে বড় কুফরী মতবাদ আর কী হতে পারে? শেখ হাসিনা যদি কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকার করেন, তাহলে কেমন করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতে পারেন?

শুধু নামায-রোযা-হজ্জের হুকুম মানা আর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনাকে মান্য করতে অস্বীকার করার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন? তার তো জানা উচিত, আল্লাহর একটি হুকুম মানতে অস্বীকার করাও কুফরী।

তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ ও রাসূলের কোন নির্দেশ মানতে অস্বীকার করার কোন অধিকার কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই। হুকুম হিসেবে স্বীকার করে কোন দুর্বলতার কারণে না মানলে কাফির হয় না, ফাসিক হয়। কিন্তু মানতে অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফির হয়।

যদি অজ্ঞতার কারণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ঈমানের স্বার্থে তা অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহর সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে শুধু ধর্মীয় কয়েকটি হুকুম পালন করা হলে এ কথা না বলে উপায় নেই যে, তিনি রাজনৈতিক অভিনয় হিসেবেই হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে হজ্জ করে তিনি ইহরামের পট্টি মাথায় বেঁধে এবং হাতে তাসবীহ নিয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। গোটা নির্বাচনী অভিযানে তিনি পট্টির প্রদর্শনী করেন। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের সময়ও হাতে তাসবীহ ও মাথায় পট্টি ছিল।

শেখ হাসিনা তার পাঁচ বছরের শাসনামলে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ করেও ২০০১-এর নির্বাচনের আগে ওমরাহ করতে গেলেন। এবারও পট্টি মাথায় নিয়েই নির্বাচনী অভিযান চালিয়েছেন।

শেখ হাসিনার এ ভূমিকাকে জনগণ কীভাবে গ্রহণ করবে? যদি আল্লাহর নির্দেশ হিসেবেই তিনি হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন তাহলে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করতে অস্বীকার করেন কেন? সূরায়ে মায়িদায় আল্লাহ বলেছেন, "যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করে না তারা যালিম, ফাসিক ও কাফির।" এ অবস্থায় তার হজ্জ ও ওমরাহ পালনকে রাজনৈতিক অভিনয় বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন?

শেখ হাসিনা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মাদরাসায় যারা কুরআন-হাদীস-ফিকাহ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে, তারা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে রাজি হবে না। তাই মাদরাসা-পাস ছাত্রদেরকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। তাদের উচ্চ ডিগ্রিকে বিএ ও এমএ ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ে তাদের ডিগ্রি নিতে দেওয়া হয় না। কারণ মাদরাসায় পড়া ছাত্ররা যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয় এবং সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হয় তাহলে তারা কোনদিন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, মাদরাসা শিক্ষা তাদের তথাকথিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ শিক্ষা তো ইংরেজ আমল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চলে এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগকে শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক সংকুচিত করা হয়েছে। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে অনেক মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদরাসার অঙ্গনে কখনো সন্ত্রাস ছিল না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে মারামারি লেগেই থাকে মাদরাসায় এর কোন অস্তিত্ব নেই। বোমার সামান্য চর্চাও কোন মাদরাসায় হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। অথচ বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ও বোমা পুঁতে রাখার ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে মাদরাসায় তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হারকাতুল জিহাদ আবিষ্কার করে মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করা ও জনগণের কাছে আলেম সমাজের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করা। অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রমাণ বের করতে পারেনি যে, মাদরাসা ও আলেমগণ এসবের সাথে জড়িত।

তথাকথিত 'মৌলবাদী' গালি

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল, যারা আল্লাহর আইন বা ইসলামী খিলাফত কায়েম করে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে বাংলাদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়, তাদেরকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে 'মৌলবাদী' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পরিভাষাটি খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্কিত। অথচ এটা একটা গালি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের স্বার্থে যা কিছুই করা হোক, তাকে সাম্প্রদায়িকতা অভিধায় নিন্দা করা হয়। যারা এ দেশকে বিভক্ত করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকি দেয় এবং মা-কালীর দরবারে 'ফতোয়াবাজ'দের বলি দিতে চায়, তারা শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ে চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। অথচ ইসলামী দলগুলোকে ঐসব সাম্প্রদায়িক শক্তির মুখেই 'সাম্প্রদায়িক' গালি শুনতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধাই হলো ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জনগণের মধ্যে শিকড়

গাড়তে পারছে না। তাই শেখ হাসিনা তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনের যাঁতাকলে ইসলামী আন্দোলনকে পিষে মারার চেষ্টা করেছেন।

ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলামে ফতোয়ার মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তথা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ এক বিচারপতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুয়োমটো মামলা দায়ের করে চরম ইসলামবিরোধী রায় দিয়ে শেখ হাসিনার মন জয় করে ফেললেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ঐ বিচারককে সিনিয়র যোগ্যতার বিচারপতিকে ডিঙিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রমোশন দিয়ে শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ আদালতে এবং আইনজীবীদের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। ঐ বিচারপতির ইসলামবিরোধী রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আলেম সমাজ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে জনগণের নিকট শেখ হাসিনা ইসলামের দুশমন হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেলেন। বিচারপতির ঐ রায় অবশ্য বর্তমানে স্থগিত আছে। এখনো বাতিল হয়নি। তাই এ রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনও বন্ধ হতে পারেনি। শেখ হাসিনা ফতোয়া নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করে এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে এ দেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই কায়েম করে ছাড়বেন। আল্লাহ তাআলা ইসলামের দুশমন থেকে এ দেশকে হেফাজত করুন।

১৮৪.

চতুর্থ সর্বনাশ : আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বহাল রাখাই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে সরকার এ প্রাথমিক কর্তব্য পালন করে না, সে সরকারের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না।

শেখ হাসিনার অন্ধ ভক্তদের কথা আলাদা। তাদের কথা বাদ দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষ এ কথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, দেশে যতটুকু আইন-শৃঙ্খলা কায়েম ছিল তা হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। সকলেই এর সরাসরি ভুক্তভোগী বলে এ কথা প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণ হিসেবে শুধু একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান শপথ নেওয়ার পরদিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করার উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব তিনি নিলেন, তা পালনে সফল হতে হলে আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কূটনীতিকবৃন্দ ও দাতা দেশসমূহ আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার ব্যাপারে আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন। ১৫ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। এর ২৪ ঘণ্টা পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টাকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণেই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত গুরুত্বের সাথে বক্তব্য রাখতে হলো কেন? তাকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত পেরেশান হতে হলো কেন? শেখ হাসিনার সফল গণতান্ত্রিক সরকারের সুশাসনের কোন স্বীকৃতি কেউ দিচ্ছে না কেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য মাসখানেক আগে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট দাবি জানালে তারা কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের পূর্বে তা সম্ভব নয় বলে কেন মন্তব্য করলেন? কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান শপথ নেওয়ার পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, "আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার ওপরই আমি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেব।"

শেখ হাসিনা সবসময় দাবি করে এসেছেন যে, তিনি সন্ত্রাস দমন করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল বোমাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসের জন্য চারদলীয় জোটকে দায়ী করে প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হীন উদ্দেশ্যে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদেরকে আসামি করে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন। সকল মহলের অবিরাম দাবি সত্ত্বেও এতগুলো নৃশংস বোমা বিস্ফোরণের কোনটিরই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হলো না কেন? সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা হত্যার একটি ঘটনারও তদন্ত করে অপরাধীদের শনাক্ত করতে সক্ষম হলেন না কেন?

দেশের সবাই জানে যে, যাদের মৌলবাদী বলে গালি দেওয়া হয় তারা বোমাবাজি তো দূরের কথা, রাজনৈতিক সংঘাতের ধারে-কাছেও যান না। অথচ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই শেখ হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলবাদীদেরকে দায়ী ঘোষণা করেন। নিরপরাধ লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের বর্বর প্রচেষ্টা চলে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমনের জন্য ব্যবহার না করে তার সন্ত্রাসী গডফাদারদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। হাজারী, তাহের ও শামীম মার্কা যোগ্য গডফাদার যোগাড় করতে পারলে সব জেলা শহরেই ডিসি ও এসপিদের ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জের মতোই ব্যবহার করার ব্যবস্থা তিনি করতেন। শেখ হাসিনা এ জাতীয় গডফাদারদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের পিঠ চাপড়িয়ে জনসভায় বাহবা দিয়েছেন এবং তাদের মতো যোগ্য লেফটেন্যান্ট পেয়ে গর্ববোধ করেছেন।

তার কুশাসনের শেষ ক'মাসে তিনি তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে বৈধ অস্ত্রেও সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্র ও যুবকদের লাইসেন্স দিয়ে অস্ত্রধারণ করার মতো জঘন্য ব্যবস্থা কি আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসের নীলনকশা নয়? শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিবেশ রেখে গেলেন। মনে হয় তার ধারণা ছিল, পুলিশ ও প্রশাসনকে তিনি ব্যালট ডাকাতির উদ্দেশ্যে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কেয়ারটেকার সরকার সে ছক মোতাবেকই কাজ করতে বাধ্য। এ ধারণা করার কারণেই নির্বাচনে তিনি ও তার বশংবদ মন্ত্রীরা এত জোর দিয়ে দাবি করেছেন, নির্বাচনে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান দীর্ঘকাল বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। দেশের সংবিধান তার ওপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা যথাযথভাবে পালন করার ওপরই যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা উপলব্ধি করা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক।

তার এ মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে তার মতো করে সাজানো অপরিহার্য। শেখ হাসিনা তার কুমতলবে সচিবের পদে যাকে যেখানে বসিয়ে গেছেন তাদেরকে বদলি করার সাথে সাথে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা থেকেই তার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেছেন, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তিনি যা করেছেন এর উপর হাত দেওয়ার কোন অধিকার কেয়ারটেকার সরকারের নেই। এমনকি সচিবদের বদলি করাকেও তিনি বেসামরিক অভ্যুত্থান বলতে পারলেন।

সারা দেশের পরিস্থিতি কী বলে? কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় শপথগ্রহণের ১ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলি, এর ১৪ ঘণ্টা পরই ১০ জন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা, এর মাত্র ৯ ঘণ্টা পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে চমৎকার ভাষণদান এবং উপদেষ্টাদের শপথের পরপর প্রথম বৈঠকেই কতক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে হাসিনার মন্ত্রিসভায় গৃহীত শেষ তিন মাসের সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করাও একটি। এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আওয়ামী মহল ছাড়া সকলকেই আশ্বস্ত করেছে। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। পাঁচ বছর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থান থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত হয়ে গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত জনগণ নাজাতের উৎসব পালন করেছে। সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো জাতির গর্দানে চেপে বসা অপশক্তির অপসারণে গোটা পরিবেশে পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। দেশবাসী বিটিভির সংবাদ কয়েক বছর পর ১৫ জুলাই (২০০১) থেকে দেখার যোগ্য মনে করেছে।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত সরকার ও কেয়ারটেকার সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের যে বাহানা তালাশ করছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নির্বাচিত সরকারের মতোই কেয়ারটেকার সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী। এ সরকারের ওপর মাত্র ৮৮ দিনের মধ্যে (দু'দিন হাসিনা অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছেন) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংবিধান যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধ অধিকার এর আছে। যদি এ সরকারের কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী হয়, তাহলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ করার অধিকারও হাসিনার আছে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের তা বাতিল করারও ক্ষমতা থাকবে।

শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন, তার মর্জির খেলাফ কেয়ারটেকার সরকার কিছু করলে তিনি মেনে নেবেন না। তিনি বর্তমানে যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে হুমকি দেওয়া যে হাস্যকর সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। তার এ দাম্ভিকতা প্রদর্শন কৌতুকের বিষয় হয়েই থাকবে।

পঞ্চম সর্বনাশ : জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

মজবুত আইন-শৃঙ্খলা বহাল রেখে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত করা যেমন সরকারের প্রধান দায়িত্ব, তেমনি সমাজে শান্তিময় পরিবেশ কায়েম করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি নির্মাণ করাও সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করার সাথে সাথে জাতীয় ঐক্যকেও চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখা এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। দেশ গড়ার কাজে জনগণের সর্বমহলের সহযোগিতা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ছাড়া এ প্রয়োজন কিছুতেই পুরা হতে পারে না।

এ কারণেই দেখা যায়, সব দেশে, সব কালেই যেসব জাতীয় নেতা সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা করেছেন, তারা ক্ষমতা গ্রহণের পর অতীতের সকল ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, লড়াই ইত্যাদি ভুলে সবাইকে আপন করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন।

কয়েকটি উদাহরণ

১. হিজরী অষ্টম সালের রমযান মাসে রাসূল (স) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা চরম দুশমনি করেছে তাদেরও ক্ষমা করে দিলেন। দুশমনদের প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ানও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে ক্ষমার প্রতিদান দিলেন। জনগণও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। বিরোধীদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাতে সক্ষম হতেন। তাদের হৃদয় জয় করে যে মহা সাফল্য অর্জন করলেন, তা শাস্তির মাধ্যমে কখনও সম্ভব হতো না। তিনি এমন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, যা চিরকাল বিজয়ীদের পথ দেখাচ্ছে।

২. ১৯৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সংঘাতময় বিরোধের ফলে গোটা উপমহাদেশে জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি হলো। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট ইংরেজ ও কংগ্রেসের সম্মতির ফলে ১০ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবি স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে বললেন, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম ও অন্য সবাই এখন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই পাকিস্তানি জাতি।

   কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত কেন্দ্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থমন্ত্রী হয়ে অতীতের বিভেদ ভুলে গেলেন। বিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বন্ধ করার জন্য মি. গান্ধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের অপরাধে নথুরাম গডসে নামক এক উগ্র হিন্দুবাদী তাকে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদি কায়েদে আযমের মতো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক

দিতে সক্ষম হতেন তাহলে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা এভাবে অব্যাহত থাকত না। ভারতে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা অবিরাম চলতে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। শেরেবাংলা ফজলুল হক ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক হয়েও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন। মুসলিম লীগ থেকে ১৯৪৩ সালেই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শেরেবাংলার চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে পাকিস্তানের স্থায়ী দুশমন মনে করা হয়নি।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলা ২৯ বছর শ্বেতাঙ্গদের কারাগারে নির্যাতিত হন। বিরাট জনসমর্থন নিয়ে তিনি আন্দোলনে বিজয়ী হন। শ্বেতাঙ্গ নেতারা বাধ্য হয়ে ড. ম্যান্ডেলার বিজয়কে মেনে নেন।

   ড. ম্যান্ডেলা যদি তার প্রিয় দেশকে গড়ে তোলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে দেশ থেকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ সমর্থন তিনি পেতেন। যদি তিনি সে পথে যেতেন তাহলে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারতেন। তার খাঁটি দেশপ্রেম তাকে সে পথে যেতে দেয়নি। দেশ গড়ার মহান উদ্দেশ্যে তিনি শাসনক্ষমতায় শ্বেতাঙ্গদের শরীক করে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করলেন।

৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয়ের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। যাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী বলে ধারণা করা হলো, তাদের বিচার করার জন্য নতুন আইন তৈরি করে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। কিছুদিন পর শেখ মুজিব অনুভব করলেন, দেশকে গড়ে তোলার জন্য এ আইন সহায়ক হচ্ছে না। তাই তিনি ঐ আইন বাতিল করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এবং গ্রেপ্তারকৃতদের জেল থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তার ডিক্টেটরি মনোভাবের কারণে এবং তার দলীয় লোকদের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার দরুন তিনি জাতীয় ঐক্য নির্মাণ করতে পারেননি।

জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার ধুয়া তুলে জনগণকে বিভক্ত করার যে চর্চা '৭২ সাল থেকে চলছিল তা দেশ গড়ার পথে বিরাট বাধা ছিল।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে শেখ মুজিবের বাকশালী শাসনের অবসানের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ দেশবাসীর মুসলিম চেতনা জাগ্রত করে পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। তার তিন মাসেরও কম সময়ের শাসনকালে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মুশতাক প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরেকটি

অভ্যুত্থানের ফলে মুশতাক সরকারের পতন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অভ্যুত্থানটি সফল না হওয়ায় এক চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হওয়ায় আল্লাহর রহমতে দেশ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। ৭ নভেম্বর অলৌকিক ঘটনার মতো সিপাহি-জনতার এক অদ্ভুত বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।

তিনি অত্যন্ত সাবধানে ও ধীরগতিতে ক্ষমতায় স্থিতিশীল হওয়ার পর '৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর ব্যবস্থা করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করেন। '৭৯-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধার বিভাজন পরিত্যাগ করে তার দলীয় নীতির ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেন। তার মন্ত্রিসভায় উভয় রকমের লোকই গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদীয় দলের নেতা মনোনীত করেন, যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইয়াহইয়া সরকারের পক্ষে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি হলেন শাহ আজিজুর রহমান। জিয়াউর রহমান দেশ গড়ার ব্যাপারে যেটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন, এর অন্যতম কারণ জাতীয় ঐক্য গঠনে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

শেখ হাসিনার ভূমিকা

শেখ মুজিবের '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্তকার দুঃশাসনের কথা জনগণ ভোলেনি বলে '৯১-এর নির্বাচনে তার দল ক্ষমতাসীন হতে পারেনি মনে করেই '৯৬-এর নির্বাচনী অভিযানে শেখ হাসিনা পিতার শাসনের ভুল-ত্রুটি মাফ করার কাতর আবেদন জানিয়ে একটিবারের জন্য জনগণের খিদমত করার সুযোগ দেওয়ার আকুল আবেদন জানান। এ নির্বাচনী অভিযানে '৯১-এর মতো তিনি কারো প্রতি কটুকথা বলেননি। তার স্বভাবসুলভ কঠোর ভাষাও প্রয়োগ করেননি। জনগণের মন জয় করার জন্য এভাবেই তিনি অভিনয় করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিরাটসংখ্যক এমন লোক ছিল, যারা শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের স্বৈর দুঃশাসনের সময় অল্প বয়সের ছিল বলে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। আওয়ামী শাসন কী চিজ তা না দেখার কারণে শেখ হাসিনার নির্বাচনী অভিযানে তার সার্থক অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই হয়তো নৌকায় ভোট দিয়ে থাকবে।

এত কিছু করা সত্ত্বেও ভোটারদের শতকরা ৬৩ জন তাকে ভোট দেয়নি। জাল ভোট ও ব্যালট ডাকাতি করার পরও মাত্র শতকরা ৩৭টি ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এরপরও এরশাদের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতাসীন হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরশাদের সমর্থন নিয়ে মহিলা আসনের বিরাটসংখ্যক দখল করায় সংসদে তার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাঁচ বছর শেখ হাসিনা চরম দম্ভসহকারে প্রতিটি বক্তৃতায় নির্বাচিত সরকার হিসেবে গৌরব প্রকাশ করেছেন। এ অহঙ্কার ও গৌরবের দাপটে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে আবার ক্ষমতাসীন হওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অপকৌশল অবলম্বন করেছেন।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া

শেখ হাসিনা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা স্বাধীনতাবিরোধী।

মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তিনি সারা দেশে এ অপপ্রচারে তাদের নিয়োগ করেন। শেখ হাসিনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। আর এ দেশের সকল ইসলামী মহল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে চরম কুফরী মতবাদ বলে বিশ্বাস করে। তাই ইসলামপন্থিদের যারা রাজনীতিতে সক্রিয় তাদেরকেও স্বাধীনতাবিরোধী বলে তিনি অপপ্রচার চালান।

অথচ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে কারা, সে কথা মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করে না। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতের আধিপত্যের নিশ্চিত আশঙ্কায় যারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারেননি, তাদেরকে জনগণ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে মোটেই মনে করে না। ভারত যে আমাদেরকে সত্যিকার স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ঐ কাজ করেনি, এ কথা শেখ হাসিনার দলেরও অনেকেই উপলব্ধি করেন।

জনগণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। কারণ এ দেশের উপর কখনও হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হওয়ার আশঙ্কা। ১৯৪৭ থেকে এ ভূ-খণ্ডের প্রতি ভারতের এ পর্যন্তকার আচরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সংস্কৃতির উপর আধিপত্য কায়েম রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এ দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কত ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এ আধিপত্যকে সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তা এ দেশের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাত জন কর্মকর্তার বক্তব্য দৈনিক ইনকিলাবে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা কে না জানে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের বিদ্রোহ করার সামগ্রিক ব্যবস্থা ভারতই করেছে। শেখ হাসিনা ভারতের নির্দেশেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের তৈরি সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বলে দাবি করতে দ্বিধা করেন না। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক দেশের সবাই চায়।

বাংলাদেশের সীমান্তে শেখ হাসিনার শাসনামলেই ভারত সবচেয়ে বেশি দুশমনির পরিচয় দিয়েছে। এ অবস্থায় জনগণ কেমন করে ভারতকে বন্ধু মনে করতে পারে? তাই শেখ হাসিনাকেও জনগণ ভারতের বন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি মনে করতে বাধ্য।

জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার বিপরীতে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে শেখ হাসিনা এ দেশের যে সর্বনাশের চেষ্টা করেছেন তা থেকে জনগণকে রক্ষার মহান উদ্দেশ্যেই চারদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার এত বড় ধৃষ্টতা যে, এ জোটকে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাদের ভারত বন্ধু এ দেশে

আক্রমণ করলে তারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দেবে বলে কি জনগণ বিশ্বাস করে? গত এপ্রিল মাসে (২০০৪) ভারতের সীমান্ত বাহিনী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীর বড়াইবাড়ীর উপর হামলা করলে বিডিআর-এর দেশপ্রেমিক বাহিনী আক্রমণকারীদের বীরবিক্রমে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিডিআর-এর বীরত্বে গর্ববোধ করেছে। আর শেখ হাসিনা তার বন্ধু দেশের বাহিনীর ১৬ জনকে হত্যা করার অপরাধের (!) জন্য বাজপেয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বাংলাদেশের কপালে কলঙ্ক লেপন করলেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারানোর শেষ পর্যায়ে বিডিআরপ্রধানকে রৌমারীর ধৃষ্টতার (!) শাস্তিস্বরূপ ঐ পদ থেকে অপসারণ করে বন্ধু দেশকে (প্রভু?) সন্তুষ্ট করলেন। তিনি কি তাহলে বলতে চান যে, তিনি এবং তার দলীয় লোক ছাড়া দেশের আর সব মানুষ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি?

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের স্বৈরশাসনের শুরু থেকেই তিনি সকল বিরোধী দলের ওপর চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার কুশাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোন আওয়াজই তুলতে না পারে। পুলিশ বাহিনীকে দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দখলে তুলে দিয়েছেন। যে ক'টি জেলায় যোগ্য গডফাদার যোগাড় করতে পেরেছেন, সেখানে গোটা প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে সমূলে উৎখাত করেছেন। হামলা, মামলা ও হত্যা চালিয়ে বিরোধীদলীয় সবাইকে ঘরছাড়া করে ছেড়েছেন।

পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের নীলনকশা

ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বের শেষ তিন মাসে তিনি তুফান বেগে বহু রকমের পদক্ষেপ নিয়েছেন; যাতে কেয়ারটেকার সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তিনি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন হলে যে ফল হওয়া স্বাভাবিক, সে ফলই অর্জন করতে সক্ষম হন। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :

১. সকল সচিব, ডিসি, এসপি এবং উপজেলা নির্বাহীর পদে তিনি এমন অফিসারদের বসানোর ব্যবস্থা করেছেন, যারা নির্বাচনে তার দলকে কমপক্ষে ২০০ আসন উপহার দেওয়ার দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারবে। তাই তিনি ও তার দলের নেতারা পূর্ণ আস্থার সাথে বারবার দাবি করে এসেছেন যে, আগামী নির্বাচনে অবশ্যই তারা বিরাট বিজয় লাভ করবেন। এর জন্য তিনি একটি থিওরিও আবিষ্কার করেছেন। তা হলো, নির্বাচিত সরকার যা কিছু করেছে তার ওপর হাত দেওয়ার কোন এখতিয়ার অনির্বাচিত কেয়ারটেকার সরকারের নেই। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন, তার সেট করা অফিসারদের বদলি করা যাবে না।

   তার এ হাস্যকর তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যেই ১৩ জন সচিবকে বদলি করায় শেখ হাসিনা এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ পদক্ষেপকে 'সিভিল ক্যু' বলতে লজ্জাবোধ করেননি।

ক্ষমতার নেশায় মত্ত হাসিনা এটুকু উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছেন যে, নির্বাচিত সরকারের মতোই তত্ত্বাবধায়ক সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদার সমান অধিকারী। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব সংবিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর অর্পণ করেছে, এ বৈধ প্রয়োজনে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আছে।

২. বাংলাদেশ টেলিভিশনকে কেয়ারটেকার সরকারের আমলে একচেটিয়া বাপ-বেটির বাক্স হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না বলে বিটিভির প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ ব্যবহার করেই ইটিভি নামে একটি চ্যানেল দু'বছর আগে থেকে চালু করা হয়েছে, যাতে নির্বাচনে তার পক্ষে একতরফা প্রচারণা চালানো সম্ভব হয়। চক্রান্তকারীরা কৌশলে বড়ই দক্ষ। সরকারি টেলিভিশনকে সম্পূর্ণ দলীয় যন্ত্রে পরিণত করা হয় এবং একুশে টেলিভিশনে বিরোধী দলের কিছু খবরও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারবিরোধী দর্শকদের কাছে একুশে টেলিভিশনকে গ্রহণযোগ্য করা।

মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ এবং মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গালি দিয়ে জনগণের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা দেশের যে সর্বনাশ করেছেন তা থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য পরবর্তী নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার যে ক'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তাতেই শেখ হাসিনা আতঙ্কিত হয়ে প্রলাপ বকেছেন এবং কেয়ারটেকার সরকারের ওপর সর্বতোভাবে চাপ প্রয়োগ করেছিলেন।

১৮৫.

জোট সরকার পতনের আন্দোলন

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে শেখ হাসিনা অপ্রত্যাশিতভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। '৯৬-এর নির্বাচনে অর্জিত আসনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি আসন লাভ করেন। এ পরাজয় তিনি কিছুতেই মেনে নেননি। এ নির্বাচনকে ব্যালট-ডাকাতির নির্বাচন ও চরম কারচুপির নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে তিনি অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত শপথ নিলেও এক বছর যাবত তিনি তার দলীয় সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে দেননি।

বিবিসিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব সিরাজুর রহমান দৈনিক ইনকিলাবে ২০০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'শেখ হাসিনা ঠেকেও শিখতে পারলেন না' শিরোনামে লিখেন, "সাবেক প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই নতুন নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন। সমস্যা এই যে, শেখ হাসিনা জয়ী হতে না পারলে কোন নির্বাচনের ফলাফলই মেনে নিতে রাজি হন না। এ মুহূর্তে নির্বাচন হলে অবশ্যই ২০০১ সালের চেয়েও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে আওয়ামী লীগ। তখন আবার নতুন নির্বাচনের দাবি

উঠতে বাধ্য। কেননা, সেটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনীতির চরিত্র। সেটা যারা ভোট দিয়ে সংসদ নির্বাচন করেছে তাদের প্রতি গুরুতর অপমান। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন শেখ হাসিনা তাদেরও সংসদে যেতে দিচ্ছেন না। সেটা তাদের এবং ভোটারদের প্রতি অবিচার। যেসব গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালনের জন্য জনসাধারণ ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচন করেছে সে কর্তব্য পালন থেকে দলনেত্রী তাদের বঞ্চিত করছেন। রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে নেত্রী তাদের বঞ্চিত করছেন। একটি দরিদ্র দেশের বিপুল সম্পদ ব্যয় করে গণতন্ত্রের তাগিদে যে নির্বাচন করা হলো, সে নির্বাচনকে অথর্ব করে দিয়ে হাসিনা জনসাধারণের সম্পদ অপহরণের কাছাকাছি অপরাধ করছেন। সারকথা, তার খেয়াল-খুশিমতো যখন-তখন নির্বাচন করতে হলে বাংলাদেশ শিগগিরই ফতুর হয়ে যাবে।"

শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেননি বলেই জোট সরকার পতনের আন্দোলন তার জন্য অপরিহার্য। প্রশ্ন হলো, কেমন করে পতন হবে? তিনি চাইলেই কি পতন হয়ে যাবে? তিনি আন্দোলনের পথ বেছে নেন। তার দলের মহাসচিব জনাব আবদুল জলিল ২০০৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন, জোট সরকার ৩০ এপ্রিল পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। দেশবাসী স্তম্ভিত হয়। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে যে সরকার কায়েম হয়েছে, তা বিরোধী দলের নির্ধারিত তারিখে কেমন করে পদত্যাগে বাধ্য হতে পারে—তা দেখার জন্য জনগণ কৌতুক ও ঔৎসুক্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে।

জনাব আবদুল জলিল নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বে বিশেষ ট্রামকার্ড প্রয়োগ করার হুমকি দিলেন। পরে ট্রামকার্ডের রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। 'প্রশিকা' নামে পরিচিত একটি বড় এনজিও সারাদেশ থেকে তাদের সাথে জড়িত কয়েক লাখ মানুষকে রাজধানীতে জড়ো করে সরকারকে অচল করে দিলে নাকি জোট সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এ ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি

জোট সরকার পতনের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সরকারের নিকট পদত্যাগ দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩০ এপ্রিলের টার্গেট মার খেয়ে গেলে আওয়ামী লীগ সংসদে যোগদান করে সংসদ ও রাজপথ উভয় ময়দানেই আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংসদে তাদের আসন শূন্য হওয়ার শঙ্কা দূর করার জন্যই হোক অথবা আর কোন বিকল্প না থাকার দরুনই হোক, শেষ পর্যন্ত লজ্জা-শরম ত্যাগ করে সংসদে যোগদান করলে জোটের সকল সংসদ সদস্য তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কেউ কেউ আশা করেছিলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ এমপিগণ শালীনভাবেই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা শুরু করবেন। ৩০ এপ্রিলের ব্যর্থতার গ্লানি দূর করার জন্য হয়তো সুমতির পরিচয় দেবেন।

বাজেট অধিবেশনে কথায় কথায় পয়েন্ট অব অর্ডারের দাবি তুলে বাজেট পাস করার পথে বারবার বাধা সৃষ্টি করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে স্পিকারকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সংসদ পরিচালনার নিয়মবহির্ভূত উপায়ে বক্তব্য রাখার অপচেষ্টা করে তারা

সংসদের বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় করেন। বিগত বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এক ঘণ্টারও বেশি সময় সংসদে বক্তৃতায় জোট সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তার স্বভাবসুলভ অশালীন কথা বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করার আগেই তিনি সংসদ থেকে বের হয়ে যান। তিনি যা বলেছেন, এর কোন জবাব শোনার মতো সাহস দেখাতে তিনি ব্যর্থ হন। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্য ও শালীনভাবে শেখ হাসিনার জবাব দিলেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা নিয়ে শেখ হাসিনার সামনে কেউ কথা বলুক তা সহ্য করার মতো শক্তি তার নেই। তিনি হিংসার আগুনে কতদিন জ্বলবেন আল্লাহই জানেন।

পদত্যাগ দাবির যুক্তি

শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে জোট সরকারের পদত্যাগ দাবির যুক্তি হলো ঃ

১. সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতা।

২. প্রধানমন্ত্রী ও মাওলানা নিজামী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে বিরোধী দলকে নির্মূল করতে চাচ্ছেন।

৩. সরকার দেশকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করছে।

৪. এ সরকার তালেবান, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে।

দেশবাসী জানে যে, শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে সন্ত্রাস চলত। ফেনীর কুখ্যাত সন্ত্রাসী হাজারী সম্পর্কে তিনি জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'হাজারী ছিল, হাজারী আছে ও হাজারী থাকবে।' লক্ষ্মীপুরে তাহের, গফরগাঁওয়ে আলতাফ গোলন্দাজ, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান, ঢাকায় হাজী সেলিম, ডা. ইকবাল, কামাল মজুমদার ও মকবুল হোসেন এবং বরিশালে হাসানাত আবদুল্লাহ প্রমুখ। শেখ হাসিনা কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, দেশে কোথাও খালেদা জিয়া কোন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের গডফাদার বানিয়ে রেখেছেন?

সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার জন্য কি শেখ হাসিনা অনেকখানি দায়ী নন? তার আমলে যে ব্যাপক সন্ত্রাস চালু করা হয়েছে তা কি দমন করা সহজ? তিনি যে ক্ষমতা ত্যাগের কাছাকাছি সময়ে তার সোনার ছেলেদের ব্যাপকভাবে অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছেন সেসব অস্ত্র কি এখনো সক্রিয় নয়?

তার আমলে যে কয়টি বড় বড় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, সেসবের কোন তদন্ত করার ব্যবস্থাও করা হয়নি। জোট সরকার তার ২১ আগস্ট ২০০৪-এর জনসভায় নৃশংস গ্রেনেড হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এ তদন্তে সামান্য সহযোগিতা করতেও তিনি সম্মত নন। তদন্ত কমিশনের চিঠিও তিনি গ্রহণ করতে বারবার অস্বীকার করেছেন। আসলে তিনি তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষী চিহ্নিত করতে চান না। কেননা, তিনি তো গায়েবী ইলমের মাধ্যমে জানেন যে, খালেদা জিয়া স্বয়ং এর জন্য দোষী। বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি বেগম জিয়াকে এত নির্বোধ কেমন করে মনে করেন যে, বেগম জিয়া এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে তার সরকারকে বে-কায়দায় ফেলবেন? শেখ

হাসিনা যুক্তির ধার ধারেন না। তার আমলের সকল বোমাবাজির জন্য তিনি তথাকথিত মৌলবাদীদের দোষী বলে সাব্যস্ত করেছেন; কিন্তু একটি ঘটনার সাথেও কোন ইসলামী দল বা ব্যক্তিকে অপরাধী বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন তিনি মনে করেননি।

আজব দেশপ্রেম

কারো দেশপ্রেমে সন্দেহ করা আমি সঠিক মনে করি না। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে কেউ এমন কিছু করতে পারে, যার পরিণামে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যায়। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খান নবাব হওয়ার উৎকট লোভে অন্ধ হয়ে ইংরেজ নেতা ক্লাইভের ফাঁদে পা দিলেন। দেশ ইংরেজদের দখলে চলে যাক—এমন মারাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজ হয়তো করেননি। লোভে অন্ধ হয়ে গেলে পরিণাম দেখার ক্ষমতা আর থাকে না।

আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে, শেখ মুজিব এ দেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমের নিয়তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো এবং পরবর্তী সময়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার ঐ আন্দোলনে শেখ মুজিব ছাত্রনেতা হিসেবে বিরাট অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরাট বিজয় লাভ করে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট যখন বিভক্ত হয়ে গেল তখন ৩০০ আসনের সংসদে ৭২ জন হিন্দু সদস্যের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য এসে যায়। তারা আওয়ামী মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল হওয়ায় শেরেবাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসাল। নিছক ক্ষমতার লোভে আওয়ামী লীগ হিন্দু সদস্যদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে 'মুসলিম' শব্দ ত্যাগ করল এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এসবের বিস্তারিত আলোচনা 'জীবনে যা দেখলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পরিবেশন করা হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগের ঐ আদর্শিক পরিবর্তনের ফলেই আজ এ দেশ ভারতের আধিপত্যের শিকারে পরিণত হয়েছে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজয়ের পর শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সকল দল, বুদ্ধিজীবী মহল এবং বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা এমন রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা এ দেশে ভারতীয় আধিপত্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করছে। এসব মহলে এমন কতক নেতাও আছেন, যারা ইসলামের মুসীবত (!) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলিত হতেও আগ্রহী। এর মানে যে ভারতের গোলামি, তা কি তারা বুঝেন না?

নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর শেখ হাসিনার ভূমিকা

শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতির কোন ধার ধারেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারি দলের বিরুদ্ধে সংসদে গঠনমূলক নীতি অনুযায়ী শালীন ভাষায়

কঠোর সমালোচনাও করে। তাদের পলিসির পক্ষে জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে সরকারি নীতি ও পলিসির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা ও তীব্র সমালোচনা করাও অগণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী দল বিদেশে গিয়ে প্রকাশ্যে জনগণের মাঝে বা গোপনে বিদেশী সরকারের নিকট নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় না। প্রতিবেশী ভারতে গুজরাট প্রদেশের আহমেদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থনে পুলিশ ও উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর গণহত্যা, এমনকি পুড়িয়ে মারা, নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যার মতো চরম পশুত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বিরোধী দল কংগ্রেসের কোন নেতা বা নেত্রী বিদেশে গিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগও করেননি।

শেখ হাসিনা আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর চরম ও ব্যাপক নির্যাতন করা হচ্ছে বলে ঘৃণ্য মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে খেপিয়ে তুলেছেন। অথচ আহমেদাবাদে মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশে সামান্য নিন্দাও জানাননি। ভারতে বারবার মুসলিম হত্যার ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একজন হিন্দুর ওপরও সামান্য হামলা করা হয়নি।

যদি দেশে সত্যিই সংখ্যালঘুদের ওপর কোন নির্যাতন হয়ে থাকে তাহলে জননেত্রী হিসেবে দেশের জনসভায় জনগণকে তিনি এ ধরনের অন্যায় করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। যদি কোথাও তিনি এমন কোন উপদেশ দিতেন তাহলে জনগণ তার মুখের ওপর তীব্র প্রতিবাদ জানাত।

তার এ অপপ্রচারে প্রশ্রয় পেয়ে তথাকথিত 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ' নামের এক উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিদেশে এমনকি নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পর্যন্ত এ জঘন্য মিথ্যা অভিযোগের প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। শেখ হাসিনা এ অপপ্রচারের সূচনা না করলে কেউ তাদের প্রচারকে সামান্য গুরুত্বও দিত না। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ এ জাতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও অপপ্রচার গোয়েবলসীয় কায়দায় চালু রয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও জিমি কার্টার এ দেশ সফর করে দেশটিতে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন। আমেরিকার বেশ কয়েকজন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে এসে অনুরূপ স্পষ্ট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর সামান্য নির্যাতনের কোন প্রমাণ তারা পাননি। তবু এ অপবাদ বর্ষণ অবিরাম চলছে। শেখ হাসিনার নিকট সবচেয়ে জঘন্য, মোক্ষম ও কার্যকর অপবাদ হলো চারদলীয় জোট সরকারকে 'তালেবান সরকার' ও 'মৌলবাদীদের সরকার' বলা। তিনি মনে করেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ কেউ বিশ্বাস না করলেও 'তালেবান সরকার' অপবাদটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী জোট সরকারে শরীক আছে বিধায় তার ধারণা যে, এ অপবাদটিকে হয়তো সহজে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ভুঁইফোড় কোন সংগঠন নয়। গত পঞ্চাশ বছরে জনগণের মাঝে এ দলটি গড়ে উঠেছে। তবুও অব্যাহতভাবে এ অপপ্রচার তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ অপপ্রচারের হীন উদ্দেশ্য

বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকায় এসব অপপ্রচার চালানোর হীন উদ্দেশ্য হচ্ছে, জর্জ বুশের মতো হিটলার স্বভাবের নেতাদের বাংলাদেশের ওপর আফগানিস্তানের মতো চড়াও হওয়ার উসকানি দেওয়া। হয়তো তিনি এ দুরাশার শিকার হয়েছেন যে, বুশ-ব্লেয়াররা আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়ে জোট সরকারকে উৎখাত করে শেখ হাসিনাকে হামিদ কারজাইর মতো ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। বুশ-ব্লেয়াররা যেসব স্বার্থ হাসিলের জন্য আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করেছেন, বাংলাদেশে ঐ জাতীয় কোন স্বার্থের সুযোগ নেই।

শেখ হাসিনার এটুকু 'আকল' থাকা উচিত ছিল যে, শুধু তার অপপ্রচারে বুশ-ব্লেয়াররা তার কুআশা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন না। এসব অপপ্রচার দ্বারা তিনি জনগণের নিকট যে ধিকৃত হচ্ছেন, তা উপলব্ধি করার সাধ্যও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ক্ষমতার জন্য তিনি যতই পাগল হন না কেন, ২০০৬ সালের শেষ দিকে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঐ নির্বাচনে জনসমর্থন লাভ করার জন্য তার বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকা সহায়ক হবে কি-না তা বিচার করে দেখতে পারেন।

শেখ হাসিনার রাজনীতি কার স্বার্থে?

২০০৪ সালের মে মাসে শেখ হাসিনা ভারত সফরে যান। এটা তার ব্যক্তিগত সফর বলে দাবি করলেও তিনি ভারতের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেসদলীয় নেত্রী, বিরোধীদলীয় নেতাসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রচার করা হয় যে, দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা জানা গেল না। একটি বিষয়ের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, যা ভারতের স্বার্থের সম্পূর্ণ পক্ষে এবং বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্যসমূহে যারা দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন করছে তাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং সেখানে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করলে তিনি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেন ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। তিনি নাকি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে এর প্রতিবাদ করতে পারেননি। তাই এ বিষয়ে সঠিক খবর দেওয়ার দায়িত্ব বেগম জিয়ার সরকারের বলে তিনি ঘোষণা করেন।

এ মিথ্যা অভিযোগ শেখ হাসিনার শাসনামলেও করা হয়। তখন তার সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করে। ভারতীয়রা আবার এ অভিযোগ তুললে বিব্রত ও লজ্জিত না হয়ে তার পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল। জোট সরকারের প্রতি চরম হিংসার কারণে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার না করে ভারতের স্বার্থেই নিশ্চুপ থেকে বাংলাদেশকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দিলেন। এতে কি দেশপ্রেমের সামান্য কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়?

মনোমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার প্রথম বক্তৃতায়ই বাংলাদেশের সাথে সব বিষয়ে সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার কথা খোলা মনে প্রকাশ করেন, কিন্তু শেখ হাসিনার ঐ সফরের পর থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাজপেয়ী সরকারের সময়কার সকল অভিযোগ নতুন করে উত্থাপন করা হয়।

হয়তো সংখ্যালঘুদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নির্যাতনের অপবাদও ভারতীয় নেতাদের জানাতে শেখ হাসিনা ভুলেননি। জোট সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বিদেশে প্রচার করার পরিণামে যে দেশের ভাব-মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়, সে কথা বোঝার মতো যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। দেশের জনগণকে তিনি এতটা বোকা মনে করে থাকলে আগামী নির্বাচনে টের পাবেন। তিনি যে বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে রাজনীতি করছেন, সে কথা জনগণের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তিনি ভারত সরকারকে যত ঘনিষ্ঠ বন্ধুই মনে করেন, বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে যে মোটেই বন্ধু মনে করে না, তা তিনি এখনও টের না পেয়ে থাকলে যথাসময়ে টের পাবেন।

১৮৬.

১৯৭৫ সালের হজ্জ

'৭৫ সালে আমি লন্ডন থেকে হজ্জে গেলাম এবং ঢাকা থেকে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব আব্বাস আলী খান ও সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং ছাত্রসংঘের সভাপতি আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহের গেলেন। (ছাত্রসংঘ ছাত্রশিবির নামে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রকাশ্য কাজ শুরু করে)।

'৭৫ সালে ১৩ ডিসেম্বর আরাফাতের দিন ছিল। ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার বিপ্লবের পর হাজীগণ বাংলাদেশ থেকে রওয়ানা হন। মিনায় দেখা হলো নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আহতার আলীর সাথে। তার সাথে আমার ১৯৫০ সাল থেকেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি '৭১ সালে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করেন ও পরবর্তী দু'বছর জেলে আবদ্ধ ছিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাংলাদেশটাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখার যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন, তা আমাকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। অথচ '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শরীক না হওয়ার অপরাধে এ জাতীয় খাঁটি দেশপ্রেমিকগণকেও স্বাধীনতাবিরোধী বলে নির্যাতন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের প্রখ্যাত দীনী ব্যক্তিত্ব বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জাব্বারের সাথে '৭৩ সালে কাবা শরীফের মসজিদেই পরিচয় হয়। তিনি প্রতি বছরই হজ্জে যেতেন। '৭৫ সালেও তার সাথে একান্ত মতবিনিময় হয়। হজ্জের মৌসুমে মক্কা শরীফে কয়েক বছরই হাফেজ্জী হুজুরের সাথে দেখা হয়। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর একজন ভক্ত ছিলাম বলে তিনি আমাকে স্নেহ করতেন।

আন্দোলনের পুরনো সাথীদের সাথে

'৭৫ সালের হজ্জের সময় জনাব আব্বাস আলী খান ও মাওলানা ইউসুফকে পেয়ে যে

কতটা আনন্দবোধ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আব্বাস আলী খান সাহেব বয়সে আমার চেয়ে প্রায় আট বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত তিনি আমার কাছ থেকেই প্রথম পান বলে আমাকে তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন। আমি জামায়াতের প্রাদেশিক সেক্রেটারি ও আমীর থাকাকালে তিনি রাজশাহী বিভাগের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে বহু বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে কাজ করায় ঐ মহব্বত আরও গভীর হয়েছে। তাই চার বছর পর দেখা পেয়ে উভয়েরই পরম তৃপ্তিবোধ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

মাওলানা ইউসুফ বয়সে আমার চেয়ে চার বছরের ছোট হলেও ইসলামী আন্দোলনে তিনি আমার দু'বছরের সিনিয়র। আমি ১৯৫৪ সালে জামায়াতে যোগদান করি। আর তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকা সরকারি আলীয়া মাদরাসার কামিল ক্লাসের ছাত্র থাকাকালেই জামায়াতে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘকাল খুলনা বিভাগের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে তার সাথে তার এলাকায় বহুবার একত্রে সফর করেছি এবং সাংগঠনিক প্রয়োজনেও হামেশা দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

এ দু'জন পুরনো ঘনিষ্ঠ সাথীকে মক্কা শরীফে একসাথে পাওয়ায় ঐ বছর হজ্জের গোটা মৌসুমেই আমরা পরম তৃপ্তিবোধ করেছি।

ছাত্রনেতা নাসের অল্প বয়সের হলেও তাকে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে গভীর চিন্তাশীল মনে হলো। তাই আমরা তিন বন্ধু বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের তখনকার সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় তাকে সাথে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

'৭৫-এ বিপ্লবের পর বিপ্লব সংগঠিত হওয়ায় ইসলামী আন্দোলনের জন্য পরিবেশ কিছুটা অনুকূল হলেও শাসনতন্ত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার দরুন জামায়াত ও শিবির তখনও প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করতে পারেনি। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন কীভাবে এগিয়ে যেতে পারে সে বিষয়েও পরামর্শ করা হলো।

হজ্জের কাজ তো বেশ আগেই সমাধা হয়ে গেল। মদীনা যিয়ারতও সমাপ্ত হলো। তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার সময় যখন হয়ে গেল তখন পরস্পর বিদায় হতে বেশ বেদনাবোধ হয়েছে। আমি দেশে কবে ফিরে যেতে পারব তা অনিশ্চিত থাকায় এ বেদনা গভীর হওয়ারই কথা। তবু তাদেরকে বিদায় দিতেই হলো। আমিও কয়েক দিন পর লন্ডন ফিরে গেলাম।

নাগরিকত্ব বহালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি

১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল আমি লন্ডন পৌঁছি। ঢাকার বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার ২২ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত ১৮ এপ্রিলের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম, সরকার ৩৯ জন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। এ তালিকায় তৃতীয় নম্বরে আমার নাম শোভা পাচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, এসব ব্যক্তির পাকিস্তানি নাগরিকত্ব অব্যাহত রয়েছে।

১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় ঃ "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কতক বাঙালি নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করে। বর্তমানে তাদের কতক দেশে এবং কতক বিদেশে অবস্থান করছেন। সরকার তাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই যারা তাদের নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, তারা তাদের দরখাস্ত সরাসরি স্বরাষ্ট্র সচিবের বরাবর পাঠাতে পারেন।"

আমি খুব আশান্বিত হলাম যে, আল্লাহ তাআলা বোধ হয় জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। '৭১ সালের ২২ নভেম্বর থেকে পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন দুঃসহ জীবন কাটছিল। আমার দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় চিন্তা-ভাবনা করতে কিছু সময় কেটে গেল। সৌভাগ্যবশত এপ্রিল (১৯৭৬) মাসের প্রথম দিকেই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস সৈয়দ মাহমুদ হোসাইনের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করার সুযোগ পেলাম। তিনি লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১০ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি আমার আপন খালাতো ভগ্নিপতি ছিলেন। আমার খালাতো বোনটি বয়সে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক মাসের বড় হলেও আমি তাকে আপাই ডাকতাম। তার স্বামী আমার সাথে শ্যালকসুলভ মধুর আচরণই করতেন। ঐ বোনটি আমার আম্মার খুব আদরের ছিলেন। আমার খালার ইন্তিকালের পর এ বোনটি আজীবন ঘনঘন আম্মাকে দেখতে আসতেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীকেও সাথে নিয়ে আসতেন। সৈয়দ মাহমুদ হোসাইন পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। বিচারপতি হওয়ার পরও বছরে কয়েকবার আব্বা-আম্মার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমাদের মগবাজারের বাড়িতে আসতেন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন লন্ডন

১৯৭৬ সালের ৩ এপ্রিল থেকে ১০ দিনব্যাপী এক বিশাল আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ মহাসম্মেলন লন্ডনে মুসলিমদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। অমুসলিমরা পর্যন্ত প্রদর্শনীসমূহে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে হাজির হয়।

'The Festival of Islam Trust' নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। Mr. Paul Keeler নামক এক ব্রিটিশ নাগরিক ঐ সংস্থা গঠন করেন। তিনি এ কনফারেন্সের বিশাল আয়োজন করার উদ্দেশ্যে বিরাট তহবিল সংগ্রহ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সৌদি আরবসহ বিভিন্ন আরব দেশের বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে লন্ডনে এমন একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন। সম্মেলনের আয়োজনে প্রায় একটি বছর তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। বহু ইসলামী চিন্তাবিদের সংস্পর্শে আসেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেন। সম্মেলনের সাফল্যে তিনি অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হন। সম্মেলনের পরপরই তিনি আবেগের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহসিন কীলার নাম ধারণ করেন। বর্তমানে তিনি কেমব্রিজে বসবাস করছেন।

এ সম্মেলনের আয়োজন করতে তিনি অনেক যোগ্য সংগঠককে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সৌদি দূতাবাসের কাউন্সিলর সালেম আয্যাম ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বর্তমান অন্যতম নায়েবে আমীর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ। ঐ সময় জনাব সালেম আয্যাম 'ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ'-এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং প্রফেসর খুরশিদ আহমদ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন। 'ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ'-এর নামেই ঐ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

৩ এপ্রিল (১৯৭৬) শনিবার দিন বিখ্যাত ও বিশাল রয়াল আলবার্ট হলে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমি স্থানীয় ডেলিগেটদের একজন হিসেবে সেখানে উপস্থিত হই। ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারি জেনারেল সালেম আয্যাম স্বাগত ভাষণ দেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সৌদি দূতাবাসে তারই অফিসে আলোচনারত অবস্থায় '৭৫ সালের ১৫ মার্চ বাদশাহ ফায়সালের নিহত হওয়ার খবর শুনতে পাই। এ অধিবেশনে সৌদি বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীযের প্রতিনিধি হিসেবে প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফায়সাল প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা Paul Keeler একজন ব্রিটিশ খ্রিস্টান নাগরিক। তিনি বহু অমুসলিমকে উদ্বোধনী অধিবেশনে হাজির করাতে সক্ষম হন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে এবং উদ্বোধনী ভাষণে বর্তমান বিশ্বে মানবজাতির মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে ইসলাম এর সমাধানে কী পথনির্দেশ করে তা অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় ও বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে পেশ করা হয়। উপসংহারে প্রিন্স মুহাম্মদ আবেগময় কণ্ঠে নিম্নরূপ নিবেদন করেন ঃ

Brothers and Sisters,

I have said what I wanted to say. You are witness to the state of affairs with which man is confronted today. Please do not judge Islam in the light of the failings of the Muslims. We may not be the best specimens of Islam. But then Islam is not the property of any one group of human beings. It is the message of God and is meant for all human beings. I urge you to try to understand Islam in the light of the original teachings of the Quran and Sunnah. To this I invite all Muslims and non-Muslims. This Conference provides you with an opportunity to examine more closely what Islam has to offer to meet the challenge of the modern age. Technology has brought us to a stage at which man, in order to survive, needs an ideology which is based on truth, which is universally applicable and which provides an effective

control mechanism, a moral and spiritual discipline for man. Let us examine the message of Islam with openness and without prejudice. If Islam has nothing to offer, why worry about it; if it has something life-giving to offer, why deny it to ourselves?

প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফায়সাল বাদশাহ ফায়সালের সন্তান এবং পিতার দীনী যোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি বাদশাহী পরিবারের একজন হিসেবে পার্থিব ভোগ-বিলাসে জীবন কাটানোর পথ ত্যাগ করে দীনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সৌদি আরবে তিনি রিয়াদ, জেদ্দাহ ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ নামে ইংরেজি ও আরবী মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী নৈতিকতায় সমৃদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীর বাহিনী তৈরি করে চলেছেন।

তার আর একটি বিরাট কীর্তি হলো, আরব বিশ্ব ও ইউরোপে 'দারুল মাল আল ইসলামী' নামে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। এ কৃতিত্বের ফলে তিনি বিশ্বের সকল ইসলামী ব্যাংক-এর সমন্বয়ে গঠিত এসোসিয়েশনের সভাপতির মর্যাদায় আসীন রয়েছেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তাগণের পরিচিতি

এ মহাসম্মেলনের স্মারক হিসেবে প্রকাশিত পুস্তকটি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে বলেই এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি পেশ করা সম্ভব হলো। প্রধান অতিথির ভাষণের পর আর যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন ঃ

১. মিসরের বিশ্ববিখ্যাত ও বহু প্রাচীন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খুল আযহার আবদুল হালীম মাহমুদ।

২. মুসলিম রাষ্ট্র-সংস্থা ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. আহমাদু করীম গায়ে।

৩. সৌদি তথ্যমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদু ইয়ামানী।

৪. তুরস্কের কৃষিমন্ত্রী প্রফেসর কোরকুত উযাল। (তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকাস্থ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বোর্ড মিটিংয়ে নিয়মিত আসেন।)

৫. আলজেরিয়ার ধর্মমন্ত্রী মৌলুদ কাসেম নায়েত বিল কাসেম।

৬. সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদিক আল মাহদী (তখন তিনি ইংল্যান্ডে নির্বাসন জীবন যাপন করছিলেন)।

৭. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়ল মুহাম্মদ।

৮. জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারি জেনারেল (V.C.) ড. আবদুল্লাহ নাসীফ।

৯. সম্মেলনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বর্তমান নায়েবে আমীর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ।

প্ল্যানারি সেশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দশ দিনব্যাপী মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের পরের দিন থেকে নয় দিনে 'প্ল্যানারি সেশন' হিসেবে ১০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট ছিল। আলোচ্য বিষয়সমূহের নাম নিম্নরূপ।

১. ইসলামের মর্মবাণী

২. ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা

৩. কুরআন ও রাসূল (স)

৪. ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র

৫. ইসলাম ও নারী

৬. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান

৭. ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতা

৮. সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনসমূহ (১ম পর্ব)

৯. সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনসমূহ (২য় পর্ব)

১০. ইসলাম ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

১০ এপ্রিল দু'বেলা দুটো অধিবেশন হয় বলে নয় দিনে ১০টি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে যারা সভাপতিত্ব করেন—

১. সৌদি তথ্যমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবদু ইয়ামানী।

২. তুর্কি কৃষিমন্ত্রী প্রফেসর কোরকুত উযাল।

৩. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ. বি. এম. হোসাইন।

৪. ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাসির।

৫. জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ড. ওমর যোবায়র।

৬. পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট খালেদ ইসহাক।

৭. মক্কা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব।

৮. আলজেরিয়ার ধর্মমন্ত্রী মৌলুদ কাসেম নায়েত বিল কাসেম।

৯. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়ল মুহাম্মদ।

১০. ইস্তাম্বুল (তুরস্ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এন. ইয়ালসিনতাম।

বক্তা ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু

১. প্রথম অধিবেশনে 'ইসলামের মর্মবাণী' সম্পর্কে শায়খুল আযহার আরবীতে বক্তব্য রাখেন।

এরপর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'What Islam stand for' শিরোনামে ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান অধ্যাপক গোলাম আযম।

এরপর ভারতের মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর 'Islam : The Most suitable Religion for Mankind' শিরোনামে ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান জনাব আশুর শামিস।

২. দ্বিতীয় অধিবেশনে 'ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা' বিষয়ে—

'Islam and Human Rights' সম্পর্কে বলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী এ. কে. ব্রোহী।

'Islam and Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Moralty' সম্পর্কে বলেন মালয়েশিয়ার প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ আল-নাকীব আল আত্তাস।

'Islam and Racial Problems' সম্পর্কে বলেন শ্রীলঙ্কার জার্মান দূতাবাসের কাউন্সিলর মুহাম্মদ আমান এইচ. হবন (Hobohn)।

'Islam and secularism' সম্পর্কে বলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত আমলা ও লেখক আলতাফ গওহর।

৩. তৃতীয় অধিবেশনে 'কুরআন ও রাসূল' বিষয়ে— 'The Quran and Its Message' সম্পর্কে বলেন অস্ট্রিয়ার নওমুসলিম কুরআনের ইংরেজিতে অনুবাদক মুহাম্মদ আসাদ। The Road To Makka গ্রন্থের লেখক হিসেবে তিনি প্রখ্যাত।

The Prophet of Islam সম্পর্কে বলেন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ওমর অসটিন।

Worshipping God in the Twentieth Century সম্পর্কে বলেন জনাব এ. কে. ব্রোহী।

৪. চতুর্থ অধিবেশনে 'ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র' বিষয়ে— 'The Concept of Islamic State' সম্পর্কে বলেন সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেক আল মাহ্দী।

The Rights of a Minority is an Islamic State সম্পর্কে বলেন ইসলামিক সেন্টার জেনেভার ডাইরেক্টর জেনারেল ড. সাঈদ রমাদান (ইখওয়ানুল মুসলিমূনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসানুল বান্নার জামাতা।)

Islamic Unity and its Potentials সম্পর্কে বলেন মিসরের ইখওয়ান নেতা ড. মুস্তফা মোমেন।

Islam and the System of Insurance সম্পর্কে বলেন প্রফেসর আলী আলী মানসূর।

৫. পঞ্চম অধিবেশনে Woman in Islam বিষয়ে বলেন নাইজেরিয়ার ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্টের সেক্রেটারি মিসেস আয়েশা লিমু।

Family life in Islam সম্পর্কে বলেন ইসলামিক সেন্টার মিউনিখ, জার্মানির সেক্রেটারি মিসেস ফাতেমা হিরেন সারকা।

The Problem of Muslim Education in a Non-muslim Society সম্পর্কে বলেন ইউ. কে. ইসলামী মিশনের সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমান।

The Way to Salvation সম্পর্কে বলেন তুর্কি প্রতিমন্ত্রী হাসান আক্‌সে।

৬. ষষ্ঠ অধিবেশনে 'ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান' বিষয়ে— Islamic Concept of Social Justice সম্পর্কে বলেন আলজেরিয়ার ধর্মমন্ত্রী মৌলুদ কাসেম নায়েত বিল কাসেম।

Islam and Contemporary Economic Challenge সম্পর্কে বলেন প্রসেফর খুরশিদ আহমদ।

Banking in Islam সম্পর্কে বলেন জেদ্দাহ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আহমদ আল নাজ্জার।

Economics of Islam সম্পর্কে বলেন দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সাকার।

৭. সপ্তম অধিবেশনে 'ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতা' বিষয়ে— Islam and Science সম্পর্কে বলেন ইরানের ইম্পেরিয়াল একাডেমির ডাইরেক্টর প্রফেসর সাইয়েদ হোসাইন নাস্‌র।

Islam and Intellectual Challenge of Modern Civilization সম্পর্কে বলেন কেলিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হামিদ আলগার।

Islam and International Law সম্পর্কে বলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরীফুদ্দীন পীরজাদা।

Islam Today : Problems and Prospects সম্পর্কে বলেন কায়রো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. তাওফীক আশ-শাভী।

৮. অষ্টম অধিবেশনে 'সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলন' বিষয়ে (প্রথম পর্ব)— Islam in Indonesia সম্পর্কে বলেন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাসির।

A Contemporary Islamic Movement সম্পর্কে বলেন এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আল বান্না (শহীদ হাসানুল বান্নার সন্তান)।

Islamic Movement in the Indo-Pak Sub-continent সম্পর্কে বলেন দাহরাজ ইউনিভার্সিটির ড. যাফর ইসহাক আনসারী (যিনি মাওলানা মওদূদীর তাফসীরের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন)।

Islam in Bangladesh সম্পর্কে বলেন ড. মুহাম্মদ মোহর আলী (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিডার ছিলেন। আমি তাকে রিয়াদের ইমাম

মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসীন আত তুর্কির নিকট নিয়ে যাই এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের ইতিহাস লেখার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। সাত-আট বছর সেখানে তিনি প্রফেসর ছিলেন এবং ইংরেজিতে তিন খণ্ডে 'History of the Muslims of Bengal' নামে বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন; যা ঐ ইউনিভার্সিটিই প্রকাশ করে)।

বাংলাদেশের এয়ার ভাইস-মার্শাল এমজি তোয়াবও এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি জোশপূর্ণ বক্তৃতায় বাংলাদেশে ইসলামের দুশমনদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভারতের দিকে ইঙ্গিত করে কড়া সমালোচনা করেন। তার বক্তব্য শুনে পাকিস্তানের আমীরে জামায়াত মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ এবং আরও অনেকে তার সাথে কোলাকুলি করে মোবারকবাদ জানান। খন্দকার মুশতাক আহমদ ক্ষমতাসীন হয়ে তাকে বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেন। শেখ মুজিব তাকে অবসর নিতে বাধ্য করলে তিনি জার্মানে প্রবাসী জীবন যাপন করছিলেন।

৯. নবম অধিবেশনে 'সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলন' বিষয়ে (দ্বিতীয় পর্ব)—

Muhammad bin Abdul Wahhab and his Movement সম্পর্কে বলেন মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ সা'দ আল রাশীদ।

Islam in Africa সম্পর্কে বলেন ড. হাসান গোয়ারযো।

Islam in South Africa সম্পর্কে বলেন মি. এ. এম. বারওয়ানী।

Islam in Turkey সম্পর্কে বলেন, ড. সালেহ তুগ ও ড. ওসমান নেবিউগ্‌লু।

১০. দশম অধিবেশনে ইসলাম ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে— Islam and other Faiths সম্পর্কে বলেন ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইসমাইল ফারাকী (মিসরীয়)।

Islam and the West : Past, Present and Future সম্পর্কে বলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইতিহাসবিদ ড. ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী।

What Islam can Give to Humanity To-day সম্পর্কে বলেন প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব।

ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারি জেনারেলের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে মহাসম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত সবাই অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করেন। আমি কোন অধিবেশন থেকেই অনুপস্থিত থাকতে পারিনি। পাশ্চাত্যের এক কেন্দ্রভূমিতে ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের প্রখ্যাত চিন্তাবিদদের প্রাণবন্ত আলোচনা সবার অন্তরেই প্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৮৭.

সম্মেলনের অতিথি বক্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ

অধিবেশনসমূহের বিরতির সময় নাশতা, লাঞ্চ ও ডিনারে বিভিন্ন টেবিলে পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ নিলাম। আমি গোটা সম্মেলনকালে অবিরাম উপস্থিত ছিলাম বলে প্রচুর সময় পাই।

ইন্দোনেশিয়ার মাশুমী পার্টির নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাসিরের সাথে ১৯৭৪ সালে রাবেতা-ই-আলম আল-ইসলামীর সম্মেলনেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঐ সম্মেলনে সাবজেক্ট কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন প্রস্তাবের খসড়া রচনায় আমাদের দু'জনের পরামর্শ প্রায় একরকম হতো। কমিটিতে আমাদের অবদান স্বীকৃত ছিল। লন্ডনে তার সাথে দেখা হলে পূর্বপরিচয় আরও নিবিড় হয়। তার সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও হতো।

তুরস্কের কৃষিমন্ত্রী কোরকুত উযালের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়। তিনি অত্যন্ত প্রাণবন্ত মানুষ। অনর্গল কথা বলেন। প্রচণ্ড মিশুক। ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। ইসলামী ব্যাংকের কাজে তিনি প্রতিবছরই ঢাকা আসেন। তিনি কয়েক মাস আগে আমীরে জামায়াতের দেওয়া ডিনারে জামায়াত অফিসে আসেন এবং দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পাকিস্তানের আমীরে জামায়াত মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের সাথে '৭২-এর নভেম্বরের পর সৌদি আরব ও আমিরাতে কয়েকবার দেখা হয়। লন্ডনে এবার দেখা হলো। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলেন তিনি। পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে এ দেশে তিনি ব্যাপক সাংগঠনিক সফর করায় তার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিকই ছিল।

এয়ার ভাইস মার্শাল এমজি তোয়াবের সাথে প্রথম সাক্ষাতে পরিচয় হলে তিনি আমার ফোন নম্বর নিয়ে গেলেন। '৭৭ সালের প্রথম দিকেই জেনারেল জিয়ার সাথে মতবিরোধের ফলে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দুবাই থেকেই আমাকে ফোনে জানান, তিনি লন্ডন পৌঁছেই যোগাযোগ করবেন। তাঁর সাথে অনেক দিনই যোগাযোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে লন্ডন যেতেন।

নাইজেরিয়ার শিক্ষাবিদ মি. এ আলহাজী লিমু ও বেগম আয়েশা লিমুর সাথে সম্মেলন নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। বেগম লিমুর বুদ্ধিবৃত্তিক মান বেশ উন্নত মনে হলো। মি. লিমু একবার ঢাকা এলে ঐ পরিচয় আবার ঝালাই করা হয়। ড. সৈয়দ আলী আশরাফের দাওয়াতে ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। ফাতেমা হেরেন শারকা'র সাথে খাবার টেবিলে আলাপ হয় এবং এ জার্মান মহিলা ইসলাম সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করেছেন বলে বোঝা গেল। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে ইসলাম গ্রহণ করা কর্তব্য মনে করেছেন।

প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব মিসরের ইখওয়ান নেতা শহীদ সাইয়েদ কুতুবের ছোট ভাই। মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে বেআইনি ঘোষণা করে চরম নির্যাতন চালালে যারা কোন রকমে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে এসে আশ্রয়

নেন, মুহাম্মদ কুতুব (পরবর্তীতে ডক্টর মু. কুতুব) তাদেরই একজন। মক্কা উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু বছর অধ্যাপনা করেন। উক্ত সম্মেলনের পূর্বে ১৯৭৪ সালের আগস্টে লন্ডনে মাওলানা মওদূদীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। '৭৫ সালে মক্কা শরীফে আবার সাক্ষাৎ হয়। সম্মেলনে পূর্বপরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সম্ভবত ১৯৮১ সালে ড. সৈয়দ আলী আশরাফের আয়োজিত ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। তখন তিনি মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। 'Islam : The Mis-understood Religion' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার হিসেবে তিনি প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' নামে ঐ বইটির অনুবাদ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিকট সুপরিচিত। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এ সম্মেলনের অতিথি বক্তাদের মধ্যে অনেকের সাথেই মতবিনিময়ের সুযোগ হলেও তাদের মাত্র কয়েকজনের সাথে আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তারা হলেন ড. মুহাম্মদ সাকার, প্রফেসর ইসমাইল ফারাকী, ড. ওমর যোবায়ের ও ড. আহমদ আল নাজ্জার (যার দাম্মামস্থ বাসায় আমাকে এক বার মেহমানও হতে হয়)।

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীসমূহ

সম্মেলনের আয়োজকগণ লন্ডনের বিভিন্ন গ্যালারিতে কয়েক প্রকারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সম্মেলনের সাফল্যকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন। প্রদর্শনীসমূহে বহু দেশ থেকে প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দর্শকদের মুগ্ধ করা হয়। কুরআন ও ইসলামী গ্রন্থের প্রদর্শনী, ইসলামী ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত বহু দুর্লভ সামগ্রী বিভিন্ন জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করে পরিবেশন করা হয়।

উক্ত সম্মেলন ব্রিটেনের সকল ইসলামী সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। প্রতিবছর ইংল্যান্ডে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে বহির্দেশ থেকেও অতিথি বক্তা এনে ইসলাম সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইসলামের চর্চা বৃদ্ধির ফলে ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর ইংরেজি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষভাবে আরবী ও উর্দু সাহিত্য থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজ যুবক-যুবতীদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান প্রসার লাভ করছে। যুবতীরাই অধিক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করছে। তাদের অনেকেই 'বয়ফ্রেন্ড' নামক জঘন্য প্রথাকে ঘৃণা করে ইসলামের আশ্রয়ে এসে শান্তিময় জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

সম্মেলনের ফাঁকে দুলাভাই-এর সাথে পরামর্শ

সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আমারা খালাতো ভগ্নিপতি যোগদান করায় তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও পরামর্শ করার সুযোগ পেলাম। নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য তিনি স্বরাষ্ট্র-সচিব বরাবর দরখাস্ত দেওয়ার পরামর্শ দিলেন, যাতে সরকার অবহিত থাকে যে, আমি এ বিষয়ে আগ্রহী। তিনি আরো বললেন, "তবে আমার ধারণা যে, তোমার নাগরিকত্ব বহাল করতে বিলম্ব হতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি

দেশে ফিরে যাওয়ার আশায় না থেকে তোমার স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে অবিলম্বে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। খালু তো চলেই গেলেন। খালাম্মা তাদেরকে এ বয়সে আগলে রেখেছেন। পরিবার থেকে আর কতদিন এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকবে?"

আমি জানি যে, শেখ মুজিবের পতনের পর থেকেই আমার স্ত্রী পঞ্চম ছেলে নোমান ও ছোট ছেলে সালমানকে সাথে নিয়ে ভিসা সংগ্রহ করার চেষ্টায় আছে। নোমান তখন ধানমন্ডী সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং সালমান বাড়ির নিকটে নজরুল শিক্ষালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ১৯৭৬ সালের মে মাসেই তারা লন্ডন পৌঁছে গেল। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর তাদের সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দের স্মৃতি এখনও অন্তরে তাজা আছে।

বিভিন্ন কারণে মানুষ নিজের ইচ্ছায় অথবা প্রয়োজনে সাময়িকভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। বিদেশে আয়-রোজগারের জন্য দীর্ঘ সময়ও পরিবার থেকে আলাদা থাকতে অনেকেই বাধ্য হয়। আমার দূর সম্পর্কের এক নাতজামাই খুরশিদ আট-নয় বছর ধরে জাপানে একা পড়ে আছে একমাত্র অর্থের প্রয়োজনে। অন্য কেউ তাকে বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছায়ই পরিবার থেকে আলাদা থাকার যাতনা সহ্য করার ফায়সালা হয়েছে। পরিবারের আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে বলে সে সান্ত্বনা বোধ করে। কিন্তু আমি পরিস্থিতির শিকার হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়ে একমাত্র আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে মেনে নিয়েই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেছি।

নাগরিকত্ব বহালের দরখাস্ত

সরকারের ঘোষণা মোতাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর ২০ মে (১৯৭৬) দরখাস্ত পাঠালাম। তাতে লিখলাম, "আমি জন্মগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক। আমি মনে করি, সাবেক সরকার অন্যায়ভাবে আমার নাগরিক অধিকার হরণ করেছিলেন। আমি সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। আশা করি বর্তমান সরকার আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে আমার প্রতি সুবিচার করবে।" এ দরখাস্ত বাংলায়ই লিখলাম।

এর কোন জবাবই পেলাম না। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে বিচারপতি মুহাম্মদ সায়েমকে অপসারণ করে জেনালের জিয়াউর রহমান ঐ পদে সমাসীন হলে সরাসরি তাকে সম্বোধন করে ১২.০১.১৯৭৭ তারিখ ইংরেজিতে একটি দরখাস্ত পাঠালাম। তার সারকথা হলো–

"সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আমি ২০.০৫.১৯৭৬ তারিখে আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর দরখাস্ত দিয়েছি, যার নকল এর সঙ্গে পাঠালাম। ঐ দরখাস্তের কোন জবাব পাইনি।

আমি নিতান্তই ঘটনাক্রমে আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিদেশে পড়ে আছি। ০৩.১২.১৯৭১-এ আমার বিমান বাংলাদেশের সীমানার কাছে পৌঁছার পর বাধ্য হয়ে জেদ্দাহ বিমানবন্দরে গিয়ে অবতরণ করে। যদি দেশে পৌঁছে যেতাম তাহলে আমার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া সম্ভব হতো না। হয়তো আমাকে গ্রেপ্তার করা হতো।

বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করিনি। কারণ আমি আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারব বলে দৃঢ়বিশ্বাসী রয়েছি। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।

আপনিই সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আশা করি আমার বিষয়টা ঝুলন্ত অবস্থায় আর পড়ে থাকবে না।"

আমার এ দরখাস্তের জবাব পেলাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার এম.এ. লতীফ চৌধুরীর ২৩.০৪.১৯৭৭-এর স্বাক্ষরিত জবাব নিম্নরূপ ঃ

"With reference of your application dated 12.01.1977 addressed to the Chief Martial Law Administrator, Govt. of Bangladesh, I am directed to inform you that Govt. of the People's Republic of Bangladesh regret their inability of accede to your request to restore Bangladesh Citizenship."

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস থেকে ২৯.০৯.১৯৭৭ সালে উক্ত জবাবের কপি আমার লন্ডনস্থ ঠিকানায় পাঠানো হয়।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আমি ১৬.০১.১৯৭৮ তারিখে আবার তার বরাবর দরখাস্ত পাঠাই। এ দরখাস্তটিও ইংরেজিতেই লিখলাম। তাতে আমার পূর্ববর্তী দু'টো দরখাস্তের কথা উল্লেখ করে এবং দ্বিতীয় দরখাস্তের জবাব সম্পর্কে মন্তব্য লিখলাম ঃ

"অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না করার কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই দরখাস্ত নাকচ করা হলো। আমার প্রিয় জন্মভূমির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবার আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, পূর্ববর্তী সরকার আপনার একজন সহনাগরিকের প্রতি যে অন্যায় করেছে, আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে তা অপনোদন করবেন।"

১৯৭৮ সালের ২০ মার্চ স্বাক্ষরিত জবাব ঐ সেকশন অফিসার থেকেই পেলাম ঃ

"With Reference to your application dated 16.01.1978 addressed to the Hon'ble President, I am directed to inform you that the Govt. of the People's Republic of Bangladesh regret their inability after their earlier decision as communicated to you under their Ministry dated 23.04.1977."

দেশে আসার NOC

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে হঠাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইমিগ্রেশন ব্রাঞ্চ থেকে সেকশন অফিসার বি. আর. ভূঁইয়া কর্তৃক ১১.০৩.১৯৭৮ তারিখে স্বাক্ষরিত এক No Objection Certificate (NOC) পেয়ে চরম বিস্মিত ও পরম আনন্দিত হলাম।

NOCটি ঢাকাস্থ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টের ডাইরেক্টরকে নিম্নরূপ ভাষায় লেখা ঃ

Subject : Grant of Entry Visa to Professor Ghulam Azam. a Pak, national.

"The undersigned is directed to say that this Ministry have no objection to the grant of Visa to Professor Ghulam Azam, a Pak, national to visit Bangladesh for a short period."

NOC-টির কপি ১০ জনকে পাঠানো হয়েছে বলে লেখা হয়েছে। এর এক কপি আমার নামে এবং এক কপি আমার আম্মার নামে। অন্যান্য কপি বাংলাদূত ইসলামাবাদ, বাংলাদূত লন্ডন, ঢাকা বিমান বন্দরের ওসি (ইমিগ্রেশন) প্রমুখের নামে।

ঐ তালিকায় আম্মার নাম দেখে বুঝতে পারলাম, আম্মার দরখাস্তের ভিত্তিতেই দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি শুনেছিলাম, আম্মা প্রেসিডেন্ট বরাবর দরখাস্ত দিয়েছেন। ঐ দরখাস্তের কপি পরে পেয়েছি।

ইংরেজিতে দেওয়া ঐ দরখাস্তে আম্মা লিখেছেন, "সে আমার বড় ছেলে। '৭১-এর ৩ ডিসেম্বর তার ঢাকায় পৌঁছার কথা ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাকে বহনকারী বিমান ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে সে দেশের বাইরে রয়ে যায়। তার পিতা '৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন। সে পিতাকে শেষ দেখা দেখতে পায়নি।

আমিও গুরুতর অসুস্থ এবং যেকোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, দয়া করে তার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে তাকে তার জন্মভূমিতে ফিরে আসতে দিন, যাতে আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার ঐ ছেলেকে দেখে আমি জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।"

আমি '৭৬-এর মে, '৭৭-এর জানুয়ারি ও '৭৮-এর জানুয়ারিতে নাগরিকত্ব বহালের যে দরখাস্ত দিলাম তা তো নামঞ্জুর হয়েই গেল। আমার আম্মার দরখাস্তের ভিত্তিতে যে এনওসি পেলাম তাতেও আমার নাগরিকত্ব বহালের কোন কথা নেই। একজন বিদেশী নাগরিক হিসেবে মাকে দেখা দেওয়ার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে অল্প দিনের জন্য আসার অনুমতি পেলাম।

প্রবাস জীবনে নাগরিকত্ব পুনর্বহালের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হলো। দেশে ফিরে আসার প্রসঙ্গ ১৯৭৮ সালের আলোচনায় আসবে।

ইংল্যান্ডে আমার গোটা পরিবার একসাথে

সাড়ে চার বছর পর আমার স্ত্রী ও ছয় ছেলে '৭৬ সালে ইংল্যান্ডে একত্রিত হলাম। ছোট দু'ছেলে ওদের মায়ের সাথে গেল। বড় দু'জন '৭২ সালে এবং মেজ দু'জন ৭৫ সালে মুজিবের পতনের পর ম্যানচেস্টারে পৌঁছে গেল। আগেই লিখেছি, আমার কনিষ্ঠ ভাই ড. মাহদীউয্যামান ওখানে অবস্থান করার কারণেই আমার ছেলেরা ঐ শহরে বসবাসের সুযোগ গ্রহণ করে। আমার ছোট ভাই ডাক্তার গোলাম মোয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়লই সর্বপ্রথম সেখানে পৌঁছে।

বড় ছেলে মামূন '৭১ সালে ঢাকা সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাস করে গেলেও তাকে ম্যানচেস্টারে আবার এ লেভেলেই ভর্তি হতে হয়। দ্বিতীয় ছেলে আমীন ঢাকা সরকারি কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। সেও ওখানে এ লেভেলেই ভর্তি হয়। তৃতীয় ছেলে মোমেন ও চতুর্থ ছেলে আমানও স্কুলে ভর্তি হয়।

প্রথমে আমার ভাইয়ের বড় ছেলে ও আমার বড় দু'ছেলে কনিষ্ঠ ভাই মাহদীর বাড়িতেই ছিল। পরে স্থানাভাবের কারণে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। আমি লন্ডনে এক আত্মীয়ের বাসাতেই থাকতাম। আমার স্ত্রী ও ছোট দু'ছেলে পৌঁছার কয়েকদিন পর ওদেরকে নিয়ে ম্যানচেস্টার যাই। ভাতিজা ও চার ছেলে যে বাড়িতে থাকত সেখানে আমরাও গিয়ে উঠলাম। কয়েক বছর পর সবাই একত্র হওয়ার আনন্দে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ার জযবায় আপ্লুত হলাম।

ভাড়া বাড়িতে থেকে পোষাবে না বলে ছোট একটা বাড়ি ৪০০০ (চার হাজার) পাউন্ড দিয়ে আগেই কেনা হয়। এর ২০০০ (দুই হাজার) আমি একখান থেকে ধার নেই। বাকি দু'হাজার আমার ভাই ডা. মোয়াযযাম দেয়। সে তখন লিবিয়ায় ভালো বেতনে চাকরিরত। অবশ্য '৭৮ সালে আমি দেশে আসার আগে ঐ বাড়ি বিক্রি করে ধার শোধ করে দিই এবং আমার ভাইয়ের টাকা ফেরৎ দিই।

আমি ছেলেদেরকে কোন টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারায় প্রথম থেকেই ওরা বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে নিজেদের খরচ যোগাত। সে দেশে কাজ পাওয়া যায়। কোন ছোট কাজ করতেও কেউ হীনম্মন্যতা বোধ করে না। লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েও অনেকে রেস্টুরেন্টে 'বয়'-এর কাজ করে জীবিকা সংগ্রহ করে। আমি স্ত্রী ও ছোট দু'ছেলেকে ওদের কাছে রেখে লন্ডনে চলে আসি। মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম।

ছোট দু'ছেলের লেখাপড়া

আমার বড় ছেলে মামূন পঞ্চম ছেলে নোমানকে সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ঢাকায় সে ধানমন্ডীস্থ সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত। ওখানে প্রথমে ইংরেজি ভাষা কম জানায় সমস্যায় পড়ল। কিন্তু বয়স অনুযায়ী যে ক্লাসের উপযোগী সেখানেই ভর্তি হতে হলো। তবে যারা ভাষায় দুর্বল থাকে তাদের জন্য শিক্ষকগণ বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকেন। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই সে ভাষার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

কনিষ্ঠ ছেলে সালমান ঢাকায় নজরুল শিক্ষালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছিল। তাকে ওখানে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হলো। বাংলাদেশে তো তখন ইংরেজি ভাষা স্কুলে পড়ানোই হতো না। সে তো ইংরেজি কিছুই জানে না। তবুও স্কুলে বয়স অনুযায়ী ভর্তি হতে হলো।

আমি ওদেরকে ম্যানচেস্টারে রেখে ২১ মে (১৯৭৬) সৌদি আরব ও আরব-আমিরাত সফরে চলে গেলাম এবং ২৪ জুন লন্ডনে ফিরে এসে কয়েকদিন পর ম্যানচেস্টার গেলাম। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, সালমান ওর ভাইদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। ওর প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যবই দেখলাম। অল্প কিছু বই। গ্রামারের কোন বই দেখলাম না।

লক্ষ্য করলাম পড়ার চেয়ে লেখায়ই সে বেশি সময় ব্যয় করছে। স্কুলে যাওয়ার সময় হওয়ার আগেই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। স্কুলের প্রতি আকর্ষণ দেখে খুশি হওয়ার সাথে সাথে বিস্মিতও হলাম। স্কুল কেমন করে এতটা আকৃষ্ট করল এবং এত সে অল্প সময়ে নিঃসংকোচে কেমন করে ইংরেজি বলা শিখল, তা জানার জন্য স্কুলে গেলাম। ওর শিক্ষকের সাথে যখন কথা বলছি, তখন সালমান দৌড়ে খেলার সাথীদের সাথে মিশে গেল। আমাকে বলেও গেল না। ক্লাস তখনও শুরু হয়নি।

সালমানের শিক্ষক মন্তব্য করলেন— He is a very attentive boy. He will shine. আমি বললাম, সে ইংরেজি কিছুই জানত না। আমরা তো নিচের ক্লাস থেকেই গ্রামার পড়া শুরু করেছি। সালমানের কোন গ্রামার বই দেখলাম না। কেমন করে এত অল্প সময়ে ইংরেজিতে কথা বলা শিখল?

তিনি আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের শিশুরা যে মাতৃভাষায় কথা বলা শিখে তাদেরকে কি গ্রামার পড়ানো হয়? তার কথায় আমি পুলকিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, এমন সহজ-সরল সত্য কথাটি এত দিন পরে কেন বুঝলাম?

আমাদের শিক্ষালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির মারাত্মক গলদ এই প্রথম আমার নিকট ধরা পড়ল। জুনিয়র মাদরাসায় ক্লাস থ্রি থেকেই আরবী ও ইংরেজি ব্যাকরণের বোঝা বইতে বাধ্য হয়েছি। ভাষা শেখার আগেই ব্যাকরণ মাথার উপর চাপিয়ে ভাষা শেখার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

যদি ইংরেজি ভাষা শেখার ক্লাসে শুরু থেকে শুধু ইংরেজিতে শিক্ষকরা ছাত্রদের সাথে কথা বলতেন এবং আরবীর ক্লাসে আরবী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে আমরা এ দু'টো ভাষাই ছাত্রজীবনে আয়ত্ত করতে সক্ষম হতাম। অথচ আমাদের দেশে অনেকে ফাযিল, কামিল, দাওরা পাস করে এবং আরবীতে এমএ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও আরবীতে কথা বলতে পারে না।

১৮৮.

প্রবাস জীবনে সরকারি অনুমতির বিড়ম্বনা

কোন দেশে প্রবাসী হিসেবে বসবাস করতে হলে ঐ দেশের সরকার থেকে অনুমতি নিয়েই থাকতে হয়। এ অনুমতির নামই ভিসা। ভিসা কয়েক রকমের হয়। শুধু বেড়াতে গেলে যে ভিসা প্রয়োজন এর নাম ভিজিট ভিসা। এ ভিসায় গেলে সে দেশে কোন চাকরি করার অনুমতি থাকে না। চাকরি করতে হলে ওয়ার্ক-ভিসা সংগ্রহ করতে হয়। কোন সমস্যা সৃষ্টি না হলে এ জাতীয় ভিসা নবায়ন করে বহু বছর থাকা যায়। কিন্তু ভিজিট ভিসায় গেলে বারবার নবায়ন করা সহজ নয়।

আমি ভিজিট ভিসায় প্রথমে ছয় মাসের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র দু'মাস পরই এক আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনে আমাকে লিবিয়া যেতে হয়। দু'সপ্তাহ পরই লন্ডন ফিরে এলে আবার ছয় মাসের ভিসা দেওয়া হলো। দেড় মাস পরেই আমাকে আর এক

সম্মেলন উপলক্ষে আমেরিকা যেতে হলো। ১৮ দিন পর লন্ডন ফিরে এলে আবার ছয় মাসের ভিসা পেয়ে গেলাম। এক সপ্তাহ পরই কুয়েত ও সৌদি আরব চলে গেলাম। এক মাস পরই আবার চলে এলাম। ইমিগ্রেশনে আমার ইমেজ সৃষ্টি হলো, আমি স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সে দেশে যাই না। এমনকি একটানা ছয় মাসও থাকি না। কোন সময়ই ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য দরখাস্ত করতে হয়নি। তাই আমি লন্ডন গেলেই একজন সম্মানিত মেহমানের মতো মর্যাদা পাই। পাসপোর্টের পাতাগুলো উল্টিয়ে আমাকে কোন প্রশ্ন না করেই ছয় মাসের ভিসা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

আমার স্ত্রী ও ছোট দু'ছেলে ছয় মাসের ভিজিট ভিসা নিয়েই সে দেশে ঢুকেছে। ছয় মাসের মাথায়ই হজ্জে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। আমাকে তো প্রতি বছরই হজ্জের সময় সৌদি আরব যেতে হয়। বাংলাদেশ থেকে জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদের সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র সুযোগই হলো হজ্জের মৌসুম। আমার স্ত্রীর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন না জানিয়ে তাকেও হজ্জের উদ্দেশ্যে সাথে নিয়ে গেলাম। বড় ছেলে মামূন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে থাকায় সে-ই তার ছোট দু'ভাইয়ের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করল। হজ্জের পর ২৪ ডিসেম্বর (১৯৭৬) যখন লন্ডন ফিরে এলাম তখন আমার সাথে স্ত্রীকেও আবার ছয় মাসের ভিসা লাগিয়ে দেওয়া হলো।

'৭৬ সালের হজ্জ

১৯৭৬ সালে হজ্জ হয় ৩ ডিসেম্বর। আমার জীবনে এ সময় বিরাট এক আবেগের ঘটনা ঘটে। কারণ ঐ হজ্জের সময়ই আমার আম্মার সাথে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেখা হয়। আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররাম আম্মাকে হজ্জে নিয়ে যায়।

কোন্ মুআল্লিমের তদারকিতে তারা আসবেন, সে খবর জেনে জেদ্দাহ বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে গেলাম। ঐ দিনের হাজীদের তালিকায় তাদের নাম না থাকায় পেরেশান হয়ে মুআল্লিমের লোকদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তারা আগের দিনই পৌঁছে গেছেন। অনেক রাতে হতাশ অবস্থায় মক্কা শরীফ ফিরে এলাম।

পরদিন তাদের তালাশে বের হলাম। আমার স্ত্রী বললেন, তিনিও আমার সাথে যাবেন। আমি আপত্তি করে বললাম, এ দৌড়াদৌড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তালাশ করে পেয়ে গেলে তোমাকে নিয়ে যাব। তিনি বললেন, আমি একসাথেই যেতে চাই। আম্মাকে প্রথম দেখে আপনি কীভাবে তার সাথে মিলিত হন, তা আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই। অগত্যা তাকে নিয়েই যেতে হলো।

অনেক তালাশ করার পর আম্মার অবস্থানস্থলে পৌঁছলাম। আম্মাকে শায়িত অবস্থায় জাগ্রতই দেখলাম। সালাম উচ্চারণ করতেই তিনি উঠে বসার উদ্দেশ্যে নড়তে চেষ্টা করলেন। আমি তার শায়িত অবস্থায়ই শিশুর মতো তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গালে গাল লাগিয়ে আদর করতে লাগলাম। কাত হয়ে তাকে কতক্ষণ ধরে রাখলাম। আবেগে আম্মার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বয়ে গেল এবং স্নেহময় মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল।

কয়েক মিনিট পর উঠে বসলাম, আম্মাও বসলেন। লক্ষ্য করলাম, আমার স্ত্রীর চোখেও

খুশির অশ্রু। ছোট ভাইয়ের সাথে গভীর ভালোবাসায় আলিঙ্গন করলাম। তার স্ত্রী সাকু (বর্তমানে মরহুমা) ও সাকুর এক ফুফু তাদের সাথে ছিলেন।

একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা হলো

যে মুআল্লিমের তত্ত্বাবধানে তারা ছিলেন তার সাথে অনেক দেন-দরবার করে আম্মা ও তাঁর সাথীদের আমার সাথে একত্রে থাকা ও হজ্জ করার ব্যবস্থা করা হলো। হজ্জ উপলক্ষে এক মাস আম্মার সাথে থাকার সুযোগ পেয়ে কত যে তৃপ্তিবোধ করেছি তা কি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব! মা তো মা-ই। এর কি কোন তুলনা আছে, না বিকল্প হতে পারে? পাঁচ বছর পর ছেলেকে কাছে পেয়ে যে আম্মা কেমন খুশি হয়েছেন, তা তাঁর নির্মল চোখে-মুখে সর্বদা স্পষ্ট বোঝা যেত।

মিনা, আরাফাত, মুজদালিফায় যথাযথভাবে হজ্জের করণীয় সবকিছু সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আম্মা ও অন্যদেরকে সহায়তা করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করেছি। হজ্জের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকলে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাদের যথেষ্ট কল্যাণে এসেছে।

হজ্জের সময়কার কয়টি দিন প্রায় সব দিক দিয়েই ভালোভাবে কেটেছে। কিন্তু দু'টো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভয়ানক পেরেশান হয়েছি। মক্কা শরীফ থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় প্রথম পেরেশানীটা ভোগ করি। আমাদের থাকার জায়গা থেকে কয়েক শ' গজ দূরে হেঁটে গিয়ে বাসে ওঠার কথা। মহিলাদের হাঁটতে একটু সময় বেশি লাগবে বলে তাদেরকে আগে রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হলো। জায়গাটা চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি বাসের জায়গায় পৌঁছে দেখলাম, সবাই পৌঁছে গেছে বটে কিন্তু আম্মা ও আমার স্ত্রী পৌঁছেননি।

হাজার হাজার লোকের চলা-ফেরার ঐ রাস্তায় কয়েক শ' গজ দূরত্বে কয়েক বার পেরেশান হয়ে দৌড়াদৌড়ি করলাম। ঐ বছর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও হজ্জে গিয়েছিলেন। আমরা একসাথেই মিনায় যাচ্ছিলাম। আমার পেরেশান হাল দেখে তিনি বাসে ওঠার স্থান পার হয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বোরকা পরা দু'জন মহিলাকে রাস্তার পাশে বসা অবস্থায় পেলেন। কাছে গিয়ে জানতে পারলেন, আমি যাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তারাই সেখানে বসে আছেন চরম আতঙ্ক নিয়ে। তিনি তাদেরকে বাসের স্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন। হয়তো তারা ভুলে বেশি দূরে চলে গেছেন– এ কথা আমার মনে উদয় হলে আমি এগিয়ে খোঁজ নিতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ মহা খিদমতটি মাওলানা সাঈদীকে দিয়ে করালেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কোন একটা গল্পের একটি মহামূল্যবান কথা সেদিন মনে পড়ল। কথাটি হলো, 'স্নেহ-ভালোবাসা যত গভীর, অকারণ আশঙ্কা তত প্রবল'। তাদের খুঁজে ফেরার সময় কত রকম আশঙ্কা যে মনে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে তা এখনও মনে পড়ে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল আরাফাত থেকে ফিরে এসে মিনায় তিন দিন অবস্থানকালে। ২০০৩ সালে হজ্জ করতে গিয়ে বর্তমানে পেশাব-পায়খানার যে উন্নতমানের বিরাট

ব্যবস্থা দেখলাম তখন তা ছিল না। সেনিটারি পায়খানা ব্যবহার করতে জানে না এমন হাজীগণ ঢিলাকুলুখ ফেলে পায়খানার প্যান রুদ্ধ করে রাখায় এমন মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলো, আমি ঐ তিন দিন পায়খানাই করতে পারিনি। আমার তখন এমন কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল, ঔষধ না খেলে পায়খানাই হতো না। এ অবস্থাটা আমার জন্য সহায়ক হয়ে গেল। ঐ ক'দিন ঔষধ খেলাম না।

আমার স্ত্রী মহিলাদের পায়খানায় কোন রকমে যেতে পারলেও আম্মার যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে তাঁবুর ভেতরেই মাটি খুঁড়ে আম্মার জন্য ব্যবস্থা করতে হলো। এটা যে কত বড় একটা সমস্যা ছিল তা মনে হলে এখনও বিব্রতবোধ করি। বর্তমানে যে উন্নতমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে পায়খানার প্যান রুদ্ধ হওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই।

দেখতে দেখতে আম্মার দেশে ফিরে আসার দিন এসে গেল। আমি তো হজ্জের পর আবার স্ত্রীকে নিয়ে লন্ডন ফিরে যাব। আম্মা দেশে চলে গেলে আবার কবে দেখা হবে তা অনিশ্চিত। আমার চেয়ে আম্মাকে এ কারণে বেশি বিষণ্ন মনে হলো। আম্মাকে বিদায় জানানোর সময় তার মলিন চেহারা ও করুণ চাহনি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকল। দেড় বছর পর ১৯৭৮-এর জুলাই মাসে দেশে ফিরে এলাম। আম্মা '৮৮ সালের অক্টোবরে ইন্তিকাল করলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।)

ঐ বছর হজ্জে বাংলাদেশ থেকে যারা গেলেন

১৯৭৬ সালে ইসলামী ছাত্র-সংগঠনের পক্ষ থেকে ঢাকা সিটির সভাপতি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান হজ্জে গিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেই বললেন, জামায়াতের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঐ বছর হজ্জে যাননি।

দেশের সার্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবরাখবর তার কাছ থেকেই সংগ্রহ করলাম।

হজ্জের মৌসুমে প্রতিবছরই বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এ বছর কামারুজ্জামানকে নিয়ে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা হলো তারা হলেন—

১. ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাসের। এর পূর্বে '৭৪ সালে রাবিতার সম্মেলন উপলক্ষে মক্কা শরীফেই তার সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আগেও উল্লেখ করেছি, ঐ বছরই মে মাসে লন্ডনে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনেও তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

২. মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী পাকিস্তান থেকে হজ্জে এলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন। একদিকে মাওলানা, অপরদিকে এমএ ও এলএলবি পাস করেছিলেন। তিনি মাওলানা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে আমি পাকিস্তানে যখন আটকা পড়লাম তখন যতবারই করাচি গিয়েছি প্রতিবারই তার করাচিস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছি। তার মুখেই আমি শুনেছি, ১৯৩৯ সালে মাওলানা

মওদূদী 'মাসলায়ে কাওমিয়াত' নামে যে বই লিখেছিলেন তা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঐ বছরই তিনবার মুদ্রণ করে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ ভারতীয় কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্বের পক্ষে ইসলামের দোহাই দিয়ে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর 'মুত্তাহিদা কাওমিয়্যাত আওর ইসলাম' নামক এক ভাষণের দ্বারা মুসলিম লীগের 'Two Nation Theory' (দ্বিজাতি তত্ত্ব) সম্পর্কে মুসলিম জাতির মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

মাওলানা মওদূদী ঐ বইটি মাওলানা মাদানীর ঐ ভাষণের সকল যুক্তি কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের যুক্তি দিয়ে বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করেন। তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ মাওলানা মওদূদীর বইটিকে অত্যন্ত মযবুত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেন, ঐ বইটি মুসলিম লীগের জনসভায় পড়ে শুনানো হতো।

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি জেনারেল জিয়াউল হক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কয়েক বছর পর পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব মাওলানা জাফর আহমদের উপর অর্পণ করেন।

মাওলানা জাফর আহমদ আনসারীর যোগ্য ছেলে প্রফেসর ড. জাফর ইসহাক আনসারী ইংরেজি ভাষায় মাওলানা মওদূদীর তাফসীরের অনুবাদ করেছেন। মক্কা শরীফে মাওলানার সাক্ষাৎ পেয়ে তার কাছ থেকে বিশ্বমুসলিমের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত জানা গেল।

৩. কুয়েতের ইসলামী নেতা ও বিরাট ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়া'র সাথে প্রতি বছরই হজ্জের সময় সাক্ষাৎ হতো। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রগতিতে অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেন। তিনি কামারুজ্জামানের নিকট থেকে তাদের তৎপরতার খোঁজ-খবর নেন।

৪. শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায বহু বছর থেকে সৌদি আরবের সরকারি গ্র্যান্ড মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার ইন্তিকালের পর বর্তমান শায়খ আবদুল আযীয আল শায়খ ঐ পদে অধিষ্ঠিত। শায়খ বিন বায সৌদি আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফতী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। সৌদি রাজধানীতেই তার সরকারি অফিস। তবে হজ্জের মৌসুমে তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করতেন। প্রতি হজ্জের মৌসুমেই (৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত) তার বাড়িতে আমাকে দাওয়াত খেতে হয়েছে।

তিনি মাওলানা মওদূদীর বন্ধু ও জামায়াতে ইসলামীর পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি রাবেতা-ই-আলম আল ইসলামীরও প্রধান ছিলেন। তার অফিসে দেখা করতে গেলেই তিনি ঢাকা থেকে হজ্জ উপলক্ষে আগত জামায়াত ও শিবির নেতাদেরসহ তার বাসায় রাতের খাবারে শরীক হতে বাধ্য করতেন।

শায়খ বিন বায ২০ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু তিনি এ সত্ত্বেও ইসলামী জ্ঞানের

সমুদ্র বলে খ্যাত ছিলেন। বিশ বছরেই যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এরই ভিত্তিতে তার জ্ঞানচর্চা চালু ছিল। কয়েকজন আলেম তার নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিতাব তাকে পড়ে শোনাতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমার পাকিস্তানি পাসপোর্টের মেয়াদ নিয়মমাফিক একসাথে পাঁচ বছর বৃদ্ধি না করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো লন্ডনস্থ হাইকমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে সৌদি নাগরিকত্ব গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমার সম্মতি চান। সাবেক সৌদি মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম আমার রাজনৈতিক জীবন অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে সৌদি নাগরিকত্ব গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। আমি এ পরামর্শকেই সঠিক মনে করি।

'৭৬ সালের একটি ঘটনা

হজ্জের পূর্বে রিয়াদে অক্টোবরের (১৯৭৬) শেষ দিকে ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে এক সম্মেলন হয়। ভাইস চেন্সেলর ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত্‌তুর্কী আমাকে ঐ সম্মেলনে শরীক হওয়ার জন্য লন্ডনে ভিসা পাঠান। তাঁর সাথে দু'বছর আগে পরিচয় হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলীকে নিয়ে তার কাছে যাই। তাঁকে অনুরোধ করি যেন ড. মোহর আলীকে বাংলার মুসলমান ও বাংলাদেশে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরের মুসলিম শাসনকালের ইতিহাস লেখার সুযোগদান করেন। তিনি মেহেরবানি করে তাকে ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং বাংলাদেশে মুসলিম জাতির ইতিহাস লেখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ড. মোহর আলী দশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে ইংরেজিতে প্রায় এগারো শ' পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাস লিখেন, যা ঐ ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকেই ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। দু' খণ্ডে তা প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থের নাম History of The Muslims of Bengal (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস)। প্রথম খণ্ডে Muslim Rule in Bengal (1203-1757) আর দ্বিতীয় খণ্ডে Survey of Administration Society and Culture. সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকাস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে আমি গ্রন্থটি সৌজন্য কপি হিসেবে পেয়েছি। তারা নিশ্চয়ই এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিবেশন করেছেন। বিস্ময়ের বিষয় যে, কোনো মহল থেকেই এ গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি।

ডক্টর তুর্কীর ভিসা নিয়ে আমি সস্ত্রীক রিয়াদ পৌঁছলে আমাদের জন্য হোটেলে একটা কামরা বরাদ্দ করা হলো। আমি স্ত্রীকে নিয়ে না গেলে ঐ কামরায় আরও একজন মেহমানকে থাকতে দেওয়া হতো বলে ধারণা হলো। আমি স্ত্রী বাবদ সম্মেলনের কোন ব্যয় হওয়া সমীচীন মনে করিনি। তাই রিয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মাওলানা মওদূদীর (র) বড় ছেলে ওমর ফারুক মওদূদীর বাসায় আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি ও তাঁর স্ত্রী অতি আনন্দের সাথে অপ্রত্যাশিত মেহমানকে গ্রহণ করলেন।

রিয়াদে আমার স্ত্রীর দিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও তার ঠিকানা না জানার কারণে সেখানে পাঠানো গেল না।

১৮৯.

বাদশাহ্ খালেদের সাথে জেনারেল জিয়ার সাক্ষাৎ

৩ নভেম্বর (১৯৭৫) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মুহাম্মদ সায়েম প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন।

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান ইস্তাম্বুলে ওআইসি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফেরার পথে রিয়াদে সৌদি বাদশাহ্ খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পররাষ্ট্র সচিব জনাব তবারক হোসেন তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

১৯৭৫-এর নভেম্বরে সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ থাকায় বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা থেকে বিরত থাকে। সৌদি রাষ্ট্রদূতের অভাবে বাংলাদেশ থেকে হজ্জযাত্রীদের পাঠাতে সরকারকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তাই জেনারেল জিয়া বাদশাহ খালেদকে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

এ ব্যাপারে সৌদি সরকারের অভিমত অবগত হয়ে তিনি বাংলাদেশের আর্থিক সংকটের দিকে বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিশেষজ্ঞদের একটা ডেলিগেশন প্রকল্প নিয়ে এলে সরকার এ বিষয়ে সহযোগিতা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক প্রধান ও আইয়ূব খানের আমলের শেষ দিকে নিযুক্ত পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ডক্টর এমএন হুদা একটি ডেলিগেশন নিয়ে সৌদি আরব যান। সৌদি সরকার বিরাট অনুদান মঞ্জুর করেন।

শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর পথে সমস্যা

জেনারেল জিয়াউর রহমান সৌদি বাদশাহর দেওয়া শর্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেন। শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব পার্লামেন্টে দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যক এমপিদের সমর্থন ছাড়া গৃহীত হতে পারে না। অথচ তখন পার্লামেন্টের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংশোধনী পেশ করা ছাড়া কোন বিকল্প উপায় ছিল না। শাসনতন্ত্র সংশোধনের এ জটিল পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ সামরিক বাহিনীতে তখনও পূর্ণ শৃংঙ্খলা ফিরে আসেনি।

তখনকার সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা

মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীরবিক্রমের লেখা 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক' নামক বই-এর ২০৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে যা পেয়েছি তা উদ্ধৃত করছি ঃ

"১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা ও বগুড়া সেনানিবাসে এক সেনা-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অভ্যুত্থানে বেশ কিছু সামরিক বিশেষ করে বিমানবাহিনীর অফিসার নিহত হন।

ওই ঘটনার দু'দিন পর লন্ডনে তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এরশাদের টেলিফোন পাই। তিনি ফোনে আমাকে জানান, রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জিয়া আমাকে সত্বর ঢাকায় আসতে বলেছেন। আমি পরের দিনই আমার স্ত্রী ও কন্যাকে লন্ডনে রেখে ঢাকায় চলে আসি।

লন্ডন থেকে ফিরেই জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সেনানিবাসে তাঁর শহীদ মইনুল রোডের বাড়িতে দেখা করি। আমি আসার পূর্বেই ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েমকে সরিয়ে দিয়ে জিয়া নিজেই রাষ্ট্রপতি হন এবং একই সঙ্গে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দু'য়েকের মতো আলাপ করে বুঝতে পারি, সেনাবাহিনীতে বিশেষ করে ২ অক্টোবর ১৯৭৭-এ সংঘটিত অভ্যুত্থানের প্রভাব তখনও বিরাজ করছে। পরদিন সকালে সেনাসদরে গিয়ে এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন উপ-সেনাপ্রধান। আমি সবকিছু পর্যবেক্ষণপূর্বক অনুধাবন করি, গত দু'বছরে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বা পরিবেশের খুব একটা উন্নতি হয়নি। সবকিছুই যেন আগের মতো; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছিল এবং দলাদলি বেড়েছে। অফিসাররা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব ছিল।

এখানে প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই— লন্ডন থেকে দেশে ফেরার কয়েকদিন পর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার অফিসকক্ষে বসে তিনি, আমি ও জেনারেল এরশাদ কথা বলছিলাম। জেনারেল জিয়া সে সময় আমাকে বললেন, লন্ডনে তোমার জায়গায় একজন যোগ্য অফিসার পাঠানো দরকার। কাকে পাঠালে ভালো হয় বলে তুমি মনে করো। আমি উত্তরে কর্নেল সাবিউদ্দীনকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার, আমেরিকায় বসবাস করেন) পাঠানোর সুপারিশ করি। সঙ্গে সঙ্গে উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ, যিনি আমার পাশে ছিলেন, বললেন, 'তুমি জান না, হি ইজ নট আওয়ার ম্যান।' আমি একটু হতবাক হলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা সবাই তো সেনাবাহিনীর লোক এবং আমাদের প্রধান কাজ দেশের প্রতি সর্বতোভাবে অনুগত থাকা। আমি একটু রূঢ় ভাষায়ই বললাম, 'আই অ্যাম অলসো নট এনি বডিজ ম্যান, মাই লয়ালিটি ইজ টু মাই কান্ট্রি অ্যান্ড আর্মি।' এ সময় জেনারেল জিয়া একটু উঁচু স্বরে 'চুপ করো, চুপ করো' বলে আমাদের থামিয়ে দিলেন।"

'৭৭ সালের ঘটনাবলি

পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন (PPR) নামে সরকার একটি আইন জারি করে, যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। এর পরই পুরনো দল এবং নতুন দল সরকারি অনুমতি নিয়ে সংগঠিত হয়। বাকশালী একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়।

'৭৭-এর জুন মাসে এক সমস্যায় পড়লাম

আগেই উল্লেখ করেছি, আমার পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছেলে নোমান ও সালমান ওদের মায়ের সাথে '৭৬-এর মে মাসে লন্ডন পৌঁছার পর ওদের ম্যানচেস্টার শহরে স্কুলে ভর্তি করা

হয়। এক বছর পড়ার পর '৭৭-এর জুন মাসে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে আপত্তি জানিয়ে আমাকে আমার লন্ডনের ঠিকানায় এক চিঠি দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, আমি সেদেশে ভিজিটর হিসেবে যাতায়াত করি। কোন ভিজিটরের সন্তানের সরকারি স্কুলে পড়ার বৈধ অধিকার নেই। তাই আমি যেন আমার ছেলেদের স্কুলে আর না পাঠাই।

আমি এর জওয়াবে জানিয়ে দিলাম, এ ব্যাপারে আমি অবগত ছিলাম না। আমি অবিলম্বে ছেলেদের স্কুল থেকে উইথড্র করে নিচ্ছি।

নোমানের লেখাপড়ার যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য তাকে একাই ঢাকায় আম্মার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান ছোট বয়সের যাত্রীদের নিকটাত্মীয়ের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব নেয় বলে ওকে একাই পাঠালাম। ওর বড় খালা বিমানবন্দরে তাকে এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে গ্রহণ করবে বলে তার নাম বিমান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হলো।

ঢাকা বিমানবন্দরে এয়ার হোস্টেস ছেলেকে নিয়ে দর্শকদের গ্যালারিতে পৌঁছলে নোমান দৌড়ে ওর খালাকে জড়িয়ে ধরল। এয়ার হোস্টেস মুচকি হেসে ওর খালার দস্তখত নিয়ে ওর লাগেজ দিয়ে দিল। নোমান ওর খালাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এয়ার হোস্টেসকে ছেলের আত্মীয় কে তা জিজ্ঞাসাবাদ ও তালাশ করতে হলো না।

সালমানের বয়স তখনও ১০ বছর পূর্ণ হয়নি। তাই ওকে দেশে পাঠানো গেল না। মায়ের সাথেই ওর থাকা প্রয়োজন মনে করা হলো।

একজন ছাত্রদরদি শিক্ষক

ম্যানচেস্টারে যে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে সালমানকে ভর্তি করা হয়েছিল সে স্কুলের হেড-মাস্টারকে জানানো হলো, হোম অফিসের আপত্তির কারণে সালমানকে স্কুল থেকে উইথড্র করতে বাধ্য হলাম। হেড-মাস্টার ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "Down Home office. He is a brilliant student of my School. What is the harm if he contains as a student?" (হোম অফিসের উপর অভিশাপ! সে [সালমান] আমার স্কুলের একজন উচ্চমেধাবী ছাত্র। সে ছাত্র হিসেবে থাকলে কী ক্ষতি?)

আমরা বিস্মিত হলাম যে, হেড-মাস্টার সালমানকে রীতিমতো একটা বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করে বিদায় দিলেন। স্কুলের সকল ছাত্রের সাথে তিনি গ্রুপ ফটো তুলে এর এক কপি সালমানকে উপহার দিলেন। অনুষ্ঠানে তিনি সালমানকে তার পাশে বসালেন, যা গ্রুপ ফটোতে দেখলাম। ছাত্রের জন্য এমন দরদি শিক্ষকের কোন উদাহরণ আমার জানা নেই। অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখলেন। সালমান স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সালমানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করলেন। সকল ছাত্র সালমানকে বিদায় সংবর্ধনা জানাল।

স্ত্রী ও ছোট ছেলের জন্য পৃথক ব্যবস্থা

আমি তো কোন সময়ই ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির দরখাস্ত করিনি, করার কোন প্রয়োজনই হয়নি। কারণ, আমি প্রতিবারই ছয় মাসের ভিসা নিয়ে ঢুকি এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার

আগেই সফরে বের হয়ে যাই। কিন্তু আমার স্ত্রী ও ছেলের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের মনোভাব সম্পর্কে আমার ধারণা জন্মেছে যে, ভিজিট ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তাই তাদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি না করে তাদেরকে অন্য কোন দেশে নিয়ে রাখার ব্যবস্থা করি। আবার আমার ফিরে আসার সময় সাথে করে নিয়ে এলে ছয় মাসের ভিসা দিয়ে দেবে বলে আমার নিশ্চিত ধারণা।

কুয়েতে আমার দরদি বন্ধু শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুত্তাওয়া প্রতি বছরই সেখানে যাওয়ার ভিসা পাঠান। এবার তাঁকে আমার ভিসার সাথে আমার স্ত্রী ও ছেলের ভিসাও পাঠাতে লিখলাম। তিনি ছয় মাসের ভিসা পাঠিয়ে দিলেন।

আমি তাদেরকে নিয়ে ৭ আগস্ট কুয়েত পৌঁছলাম। সেখানে ইতঃপূর্বে যতবার গিয়েছি আওকাফ মন্ত্রণালয়ের মেহমান হিসেবে প্রথম শ্রেণীর হোটেলেই থেকেছি। কিন্তু এবার তো সপরিবারে হোটেলে থাকা সম্ভব নয়। আগে কয়েকদিনের জন্য মেহমান হতাম। এবার তো কয়েক মাস থাকতে হবে।

১৯৭৩ সাল থেকে কুয়েতে প্রতি বছরই সফরে গিয়েছি। তখন সেখানে কর্মরত পাকিস্তানিদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত ভাইয়েরা আমাকে নিয়ে দীনী মাহফিলে বক্তৃতা করাতেন। হোটেলে মেহমান হিসেবে থাকলেও হোটেলে আমার খেতে হয়নি। জামায়াতের ভাইদের বাসায় দাওয়াত খেয়েই শেষ করা যেত না। দীনী সম্পর্ক এমনই হয়ে থাকে।

এবার কুয়েতে সপরিবারে যাচ্ছি জেনে কয়েকজন পাকিস্তানি তাদের বাসায় নেওয়ার জন্য দাবি জানালেন। আমি অভিভূত হলাম তাদের আন্তরিকতা ও মহব্বত দেখে। শেষ পর্যন্ত সবার মতামতের ভিত্তিতে জনাব ইনআমুল হক কাদরীর বাসায় ওঠার সিদ্ধান্ত হলো। কাদরী সাহেব সেখানে ইসলামপন্থিদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ব্যাংকের অফিসার। তিনি শহরের মধ্যবর্তী এমন স্থানে থাকেন, যেখান থেকে আওকাফ অফিস ও মুতাওয়া সাহেবের অফিস এত কাছে যে, হেঁটেই পৌঁছা যায়। এসব বিবেচনা করেই কাদরী সাহেবের দাবি অন্য সবাই মেনে নেন।

কুয়েতে দশ মাস

দীনের ভিত্তিতে মহব্বতের কোন তুলনা নেই। কাদরী সাহেব একটি দোতলা বাসায় থাকেন। তাঁর বেডরুম দোতলায়। তিনি তাঁর বেডরুমে আমাদের থাকতে দিলেন এবং নিজে নিচে এক রুমে থাকলেন। আমার স্ত্রী ও ছেলে ঐ বাসায় ১০ মাস বসবাস করল। আমি এর মধ্যে দু'বার লন্ডন গিয়েছি। ১০ মাসের মধ্যে এক মাস হজ্জ উপলক্ষে আমরা তিনজনই সৌদি আরবে থাকায় পূর্ণ নয় মাস আমার পরিবার ঐ বাসায় ছিল। এ দীর্ঘ সময় কাদরী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী এত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন, যার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

হাফিয মুহাম্মদ শরীফ নামে আর এক পাকিস্তানি ভাই আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে আমি সম্মত হই। কিন্তু কাদরী সাহেব কিছুতেই আমাদের যেতে দিতে

রাজি হলেন না। তিনি তাঁর আপত্তির ব্যাপারে দু'টো যুক্তি দিলেন– প্রথমটি হলো, তিনি এত বড় সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে চান না; দ্বিতীয় যুক্তি হলো, কেউ মনে করতে পারে যে আমরা এতদিন পর্যন্ত রাখতে চাই না বলে যেতে দিচ্ছি, যা মোটেও সঠিক নয়। তাই যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের খাবার ব্যবস্থা

৭ আগস্ট থেকে এক সপ্তাহ তাদের মেহমান হিসেবেই খেলাম। থাকার জায়গা পেলাম। এভাবে মেহমানের মতো খেতে থাকা কিছুতেই ঠিক মনে হচ্ছে না; মেহমানের হক তো তিন দিন মাত্র। কিন্তু কাদরী সাহেবের কাছে এ বিষয়ে কীভাবে কথা বলা যায়, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত সালমানের দোহাই দিলাম যে, সে রুটি খেতে চায় না; মাছ-ভাত খেতে অভ্যস্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চালের অভাবে যখন বাধ্য হয়ে রুটি খেতে হচ্ছিল তখন এত ছোট বয়সেও সে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তা ছাড়া ওর মায়ের হাতের পাক খেতে চাচ্ছে। এসব বলে আমাদের তিনজনের জন্য সালমানের মা আলাদা করে পাক করার অনুমতি হাসিল করল।

কিন্তু চাল, ডাল, তেল, মসলা ইত্যাদি কেনার অনুমতি বেগম কাদরী কিছুতেই দিলেন না; শুধু ওর পছন্দের মাছ কেনার অনুমতি দিলেন। এটুকু অনুমতিকে পুঁজি করে মুরগি, গরুর গোশত ইত্যাদি কেনার সুযোগ নিলাম।

আমার স্ত্রী উর্দু ভাষার মাধ্যমে আলিম পাস করার ফলে উর্দু বলতে পারত বিধায় কাদরী সাহেবের বেগম ও ছেলেমেয়েদের সাথে কথাবার্তা বলায় কোন অসুবিধা হয়নি।

কাদরী সাহেবের দুই মেয়ে ও তিন ছেলের মধ্যে সবার ছোট ইহতিশাম সালমানের সমবয়সী হওয়ায় সালমান খেলার সাথীও পেয়ে গেল। কুয়েতে পাকিস্তানি দূতাবাসের পরিচালনায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ত বলে ওরা দু'জন ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলত। সালমান উর্দু বলতে অভ্যস্ত না থাকায় কাদরী সাহেবের সাথেও ইংরেজিতেই কথা বলত। কাদরী সাহেব সালমানকে ছেলের মতোই আদর করতেন। ওখানকার স্কুলে ভর্তি হওয়ায় সালমানের লেখাপড়ায় কোন ছেদ পড়েনি।

১৯০.

ইস্তাম্বুলে ইফসু সম্মেলন

IIFSO (International Islamic Federation of Students Organization) বিশ্বের ইসলামী ছাত্র-সংগঠনসমূহের একটি ফেডারেশন। এ সংস্থাটি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের রচিত সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে তা মুদ্রিত আকারে ইসলামী ছাত্র-সংগঠনগুলোর মধ্যে বিলি করে। ইসলামী আন্দোলনরত ছাত্র-সংগঠনসমূহ এসব সাহিত্য তাদের দাওয়াতী প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সহায়ক মনে করে। ইফসু (IIFSO) মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করে। সম্মেলনে ছাত্র-সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ

যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তুরস্কের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন মহানগর ইস্তাম্বুলে (তুরস্কের রাজধানী অবশ্য আংকারা) তিন দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অতিথি বক্তা হিসেবে কিছু ইসলামী চিন্তাবিদকে দাওয়াত দেওয়া হয়।

ঐ সময় ইফসু-এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মুস্তফা মুহাম্মদ তাহ্যান। তিনি লেবাননের নাগরিক হলেও পেশাগত কারণে কুয়েতে ছিলেন। ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি লন্ডনের ঠিকানায় আমাকে দাওয়াতপত্র পাঠালেন। আমি তাকে লিখলাম যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা জনাব আবদুল খালেককেও যেন সম্মেলনের দাওয়াত পাঠানো হয়। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করায় ইস্তাম্বুলে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দীনী ভাইয়ের সাথে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পর সাক্ষাতের সুযোগ হয়।

ইস্তাম্বুলে পৌঁছলাম

সম্মেলনের দু'দিন আগেই আমি লন্ডন থেকে ইস্তাম্বুল পৌঁছলাম। সম্মেলনের মেহমান ও ডেলিগেটগণের থাকার জন্য বিরাট এক হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়। ঐ হোটেলেরই সম্মেলন হলে অনুষ্ঠান হয়। হোটেলটি বসফরাস প্রণালীর তীরে অবস্থিত। যে রুমে আমি ছিলাম এর জানালা দিয়ে ঐ প্রণালীর দৃশ্য উপভোগ করতাম। হোটেল ও বসফরাস প্রণালীর মাঝখানে প্রশস্ত রাস্তায় সব সময় যানবাহন চলাচল করে। রাস্তাসংলগ্ন পানিতে বেশ কতক যান্ত্রিক নৌকা দেখা গেল। অনেককে রাস্তার কিনারায় বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেও দেখলাম। রাস্তার বাঁধাই করা কিনারায় প্রণালীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। হোটেলের ১০/১২ তলা থেকে এসব দৃশ্য সময় পেলেই দেখতাম।

পরের দিন ঢাকা থেকে জনাব আবদুল খালেক এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মীর কাসেম আলী হোটেলে পৌঁছলে খুশিতে আমার ইস্তাম্বুল সফর অত্যন্ত সার্থক মনে হলো। সম্মেলনের দাওয়াতে গিয়ে সম্মেলনের চেয়েও তাদের সাথে সাক্ষাতে আমি অধিক তৃপ্তিবোধ করেছি। তাদের কাছ থেকে দেশের পরিস্থিতি, ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের খবরাখবর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছি।

জনাব আবদুল খালেক

আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পটভূমি ও সংগঠনে অগ্রসর হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় খণ্ডে পরিবেশন করা হয়েছে। সেখানেই জনাব আবদুল খালেক সম্পর্কে লিখেছি, সর্বপ্রথম তার কাছ থেকেই আমি ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পাই। রংপুরে তিনি হাতে-কলমে আমাকে সংগঠন পরিচালনা শিক্ষা দেন। তার দেওয়া দারসে কুরআন শুনেই তাফহীমুল কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হই। তখনও এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় এ তাফসীর অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষা শিখতে বাধ্য হই।

আমি প্রাদেশিক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনকালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর ছিলেন। তার এলাকায় সাংগঠনিক সফরে সংগঠন পরিচালনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও খুঁটিনাটি

শিক্ষা তার কাছ থেকে পেয়েছি। এসব কারণেই তাকে আমি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দীনী ভাই হিসেবে ভালোবাসতাম। একজন মানুষের মধ্যে এত গুণ খুব কমই দেখা যায়। তাই ইফসু'র সম্মেলন উপলক্ষে তার সাথে ইস্তাম্বুলে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে এত আনন্দবোধ করেছি।

সম্মেলনের অনুষ্ঠান

ইফসু'র এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ড. নাজমুদ্দীন আরবাকান। সম্মেলনে ২১টি দেশ থেকে ইসলামী ছাত্র-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলন পরিচালনায় ড. আহমদ তুতুনজি নেতৃত্ব দেন। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে। মালয়েশিয়া থেকে যুবনেতা আনওয়ার ইবরাহীম, ভারত থেকে ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী ও আমেরিকা থেকে ইরাকের ইসলামী যুবনেতা হিশাম আত তালিব সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের একপর্যায়ে ইফসু'র সেক্রেটারি জেনারেল মুস্তফা মুহাম্মদ তাহ্যান হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন, একটা সুসংবাদ শুনুন—এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো গদিচ্যুত হয়েছেন। '৭৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে এমন ব্যাপক কারচুপি হয়েছে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথে সকল রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে নির্বাচন বাতিলের আন্দোলন শুরু করে। জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। কারণ তারা যাদের ভোট দেয়নি তারা বিজয়ী হয়েছে বলে কেমন করে মেনে নেবে?

লাহোরে সেনাবাহিনী যখন জনগণের ওপর গুলি চালাতে এগিয়ে আসে তখন জনগণ তাদের গায়ের জামা খুলে নগ্ন দেহে বুক পেতে দিলে সেনাবাহিনী গুলি চালাতে অস্বীকার করে। ভুট্টো পুলিশ বাহিনী দিয়ে বিক্ষোভ দমন করতে ব্যর্থ হয়ে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিলেন। সেনাবাহিনী গুলি করতে অস্বীকার করার পর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আইন জারি করেন। ভুট্টো পতনের খবরে সম্মেলনে উপস্থিত সবাই আওয়াজ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। কারণ সবাই ভুট্টোকে স্বৈরশাসকই মনে করতেন।

উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি মুসলিম উম্মাহর সামনে যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, এর মোকাবিলা করার জন্য বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করলাম। IIFSO ও WAMY-এর উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন হচ্ছে তা সমন্বয়ের সহায়ক বলে এ জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করার জন্য আমি ইফসু নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানালাম।

আমি '৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত রিয়াদ, মক্কা, ত্রিপলি, লন্ডন, শিকাগো প্রভৃতি শহরে যেসব আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেছি তার অভিজ্ঞতা থেকে ইস্তাম্বুল সম্মেলনে বললাম, বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে যাতায়াত খরচ

দিয়ে সম্মেলন উপলক্ষে একত্র হওয়ার সুযোগ দান করে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ উম্মাহর মধ্যে চিন্তা ও কর্মে ঐক্য সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। নেতৃবৃন্দ পরস্পর পরিচিত হয়েছেন, ভাবের আদান-প্রদান করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলির মাধ্যমে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সে হিসেবে ইফসু'র ইস্তাম্বুল সম্মেলন সফল ও সার্থক।

সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, উম্মাহর ঐক্য, ইসলামের প্রতি মুসলিম দেশের সরকারের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়।

সম্মেলন শেষে জনাব আবদুল খালেক ঢাকা ফিরে আসেন। ছাত্রনেতা মীর কাসেম আলী আমার সাথে লন্ডন গিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশী সুধীবৃন্দকে অবহিত করেন। ১০ দিন সফর শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তুরস্কের উত্থান ও পতন

যে তুরস্কে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে দেশটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। তুরস্ক এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত। এমনকি এর একাংশ এশিয়ায়, অপর অংশ ইউরোপে। মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে তুরস্ক এক গৌরবজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

খোলাফায়ে রাশিদীনের পর প্রায় একশ বছর উমাইয়া খিলাফত, তারপর পাঁচ শতাধিক বছর আব্বাসীয় খিলাফতের যুগ হিসেবে গণ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ নিয়ে সোয়া ছয়শ বছর উসমানী খিলাফতের যুগ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হালাকু খান আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করার পর যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তৃত খিলাফতের বিভিন্ন এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কতক এলাকা গ্রিক ও ইটালীয়রা দখল করে নেয়, তখন তুরস্কের এক অঞ্চলের আমীর উসমান ইসলামী পতাকা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে ঈমানী জযবা নিয়ে অগ্রসর হন। ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ এবং অসীম সাহসী সেনাপতি হিসেবে তিনি খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের মতোই বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে থাকেন।

খলীফা উসমানের পর তাঁর বংশধরগণও তাঁর মতোই গুণাবলির অধিকারী হওয়ায় কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বিজয় অব্যাহত থাকে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় মিসর থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত খিলাফতের বিস্তৃতি ঘটে। উসমানী খিলাফত ৩০০ বছর পর্যন্ত ইসলামের আদর্শিক ও নৈতিক মান বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং সেকালে বিশ্বের নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। এরপর আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও ভোগের রোগ দেখা দেয়। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে আবার নৈতিক উন্নতির লক্ষণও প্রকাশ পায়।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উসমানী খিলাফতের দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। যুদ্ধের পর ইউরোপের বিজয়ী দেশগুলো বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স

মুসলিম দেশগুলো দখল করতে থাকে। উসমানী খিলাফতের ক্ষমতা রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল) ও আনাতোলিয়াতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯১৯ সালে ইয়াংতুর্কন (তুর্কি যুব সংগঠন) ইউরোপের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। খলীফা ষষ্ঠ মুহাম্মদের দুর্বল নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মোস্তফা কামাল পাশা তখন তুর্কি সেনাবাহিনীর অফিসার। খলীফা তাকে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আনাতোলিয়ায় পাঠান। বিদ্রোহীরা কামাল পাশাকে নেতা মেনে নিলে তিনিও খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইয়াংতুর্কনের সমর্থকদের নিয়ে কামাল পাশা আংকারায় রাজধানী স্থাপন করে তুরস্ককে ইউরোপের দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেন।

তুরস্কের এ যুবশক্তি ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুসারী হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নেয়। ঐ সময় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'কামাল পাশা' কবিতায় 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' বলে তাকে মহাবিজয়ী হিসেবে অভিনন্দন জানান।

কামাল ইউরোপের সমর্থন পেয়ে অতি উৎসাহের সাথে তুরস্ককে ইউরোপের আদর্শে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে চরম ইসলামবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে নিজে প্রেসিডেন্ট হন ও ইসমত ইনুনুকে প্রাইম মিনিস্টার নিযুক্ত করেন।

১৯২৪ সালে কামাল পাশা খিলাফতের পরিভাষা পরিত্যাগ করেন। সর্বশেষ খলীফাকে পদচ্যুত করেন এবং তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এরপর তিনি দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেন—

১. ইসলামী আইন উৎখাত করে Swiss Code প্রবর্তন করেন।

২. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন।

৩. আরবী ভাষা চর্চা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন হরফের প্রচলন করেন। কারণ আরবীতে কুরআন পড়ার অযোগ্য না হলে পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে শিশুরা গড়ে উঠবে না। এমনকি আরবীতে আযান দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। পাগড়ি ও টুপি পরা নিষিদ্ধ করেন।

৪. পর্দাপ্রথা বিলোপ করেন ও সহশিক্ষার প্রচলন করেন।

এর ফলে ইউরোপের কালচার ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায়। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মদের প্রচলন ইত্যাদি দেশকে গ্রাস করে ফেলে।

ষাটের দশক থেকে সাঈদ নূরসীর নীরব ইসলামী আন্দোলন শুরু হলে জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা আবার জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনী কামাল পাশার

আদর্শের ধারক হিসেবে এখনও ইসলামের উত্থানকে ঠেকিয়ে রেখেছে। শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বহাল থাকায় সশস্ত্র বাহিনী এর দোহাই দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পার্লামেন্টে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে ইসলামের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ইরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তা না হলে সেনাবাহিনী তাকে সরকার গঠন করতেই দিত না।

ইসলামী শক্তির উত্থান-পতন

মুসলিম উম্মাহর দেড় হাজার বছরের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে যে, যখন ঈমান, ইলম ও আমলে সমৃদ্ধ একদল সুসংগঠিত মুজাহিদ আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জান ও মাল কুরবানী দেওয়ার জযবা নিয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের খালিস নিয়তে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অব্যাহতভাবে বিজয়ী করতে থাকেন।

রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলা কতক শাশ্বত বিধান অনুযায়ী ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে জয়-পরাজয়ের ফায়সালা হতে দেন। যে পক্ষে অধিকসংখ্যক লোক থাকে অথবা উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র থাকে অথবা অধিক জীবনবাজি রাখার হিম্মতে অগ্রগামী লোক থাকে অথবা অধিকতর উন্নত কৌশল প্রয়োগের যোগ্যতা থাকে, তারাই অপরপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এসব চিরন্তন বিধি-বিধান আল্লাহরই রচিত। যারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তারা এসবের ভিত্তিতেই বিজয়ী ও বিজিত হয়। আল্লাহ তাআলা সরাসরি সেখানে হস্তক্ষেপ করেন না বা কোন পক্ষকে সমর্থন করেন না। তিনি নিরপেক্ষভাবেই তাঁর রচিত ঐসব বিধান অনুযায়ী ফায়সালা হতে দেন।

কিন্তু যারা শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে তৎপরতা চালান তাঁদের আল্লাহ তাআলা সরাসরি সাহায্য করেন; প্রয়োজনে তাদের পক্ষে ফেরেশতাদের কর্মতৎপর করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন না। যার ফলে উপরিউক্ত চিরন্তন বিধান অনুযায়ী এক্ষেত্রে ফায়সালা হয় না। তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের বিজয়ী করেন। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত প্রতিপক্ষকেও পরাজিত করেন। বদরের যুদ্ধে এর বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা না করে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজয়ী হওয়া যাবে বলে মনে করলে মুজাহিদগণ প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশিসংখ্যক হলেও আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দেন না। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষমতার উত্থান-পতনের চিরন্তন বিধি-বিধান মুজাহিদদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তাদের বেলায় আল্লাহর নীতি ভিন্ন।

আল্লাহকে কেউ পরাজিত করতে সক্ষম নয়। তাই যারা একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করে, তাঁকেই সামনে রেখে, শাহাদাতের জযবা নিয়ে, দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ করে, একমাত্র আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে

আন্দোলন করেন তাদের সংগ্রামে আল্লাহ তাআলা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন না। তাদের সাহায্য করা তিনি কর্তব্য মনে করেন এবং তার সাহায্য পাওয়া মুমিনদের হক বলে তিনি কুরআন মাজীদে সূরা আর-রূমের ৪৭ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহর সাহায্যে বিজয়লাভের পর তাদের পরবর্তী বংশধররা যতদিন এ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে, ততদিন তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতার নেশা ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পরবর্তী প্রজন্ম যখন মুজাহিদের মান হারিয়ে ফেলে তখন আল্লাহ তাদেরকে শুধু সাহায্য থেকে বঞ্চিতই করেন না; বরং দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিতও করেন। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তাআলার এ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান দুর্গতি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াতে বলেন, "(হে নবী!) বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান কর, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কর রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাকে চাও অপমানিত কর।"

আল্লাহ তাআলা কোন স্বেচ্ছাচারী শক্তি নন। তিনি খামখেয়ালি করে যাচ্ছেতাই করেন না। তাঁর প্রতিটি কাজের পেছনে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ নিয়মনীতি রয়েছে। 'রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা' সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এ শিরোনামেই আমার লেখা একটি চটি বই ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। যারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় এবং ইসলামের বিজয় কামনা করেন তাদের এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

খিলাফত আন্দোলন

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উসমানী খিলাফতের পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন হয়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ আন্দোলনে গোটা মুসলিম জাতি চরম বিক্ষোভ প্রকাশ করে। আলেম সমাজই ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। দারুল উলূম দেওবন্দ এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ঐ আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল। মি. গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও খিলাফত আন্দোলনকে জোর সমর্থন দেয়। এভাবেই মি. গান্ধী ওলামায়ে দেওবন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইংরেজদের গোলামি থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে মিলে কাজ করা ওলামায়ে দেওবন্দ জরুরি মনে করেন। খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কের কারণে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্বও সমর্থন করেন এবং মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করতে থাকেন।

১৯১.

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় প্রধান আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের কোথাও 'আল্লাহ' শব্দটি পর্যন্ত ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৭৫-এর আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব ইসলামের পক্ষে কিছুটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেও শাসনতন্ত্রে চরম ইসলামবিরোধী ঐ দু'টো মতবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত থাকায় বাস্তবে ইসলামী তৎপরতার পথ রুদ্ধই ছিল।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট সায়েমকে অপসারণ করে নিজেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা হাতে নেন। শাসনতন্ত্রকে সংশোধন না করা হলে সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে আসবেন না বলে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। তাই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই ২৩ এপ্রিল এক সামরিক ফরমানের (Proclamation) মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ঘোষণা করেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের যে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করা হয় তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এতে রাষ্ট্রীয় আদর্শে মৌলিক পরিবর্তন আসে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' কথাটি উৎখাত করে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন করা হয় এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি বহাল রাখলেও এর মর্ম 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' বলে উল্লেখ করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনীর বিবরণ

১. শাসনতন্ত্রের শুরুতে প্রস্তাবনার (Preamble) পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' ও এর অনুবাদ লেখা হয়।

২. 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শিরোনামে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়—

"সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার– এ নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।"

১৯৭২-এর শাসনতন্ত্রে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' অন্যতম আদর্শ হিসেবে উল্লিখিত ছিল। এ সংশোধনীতে 'বাঙালি' শব্দটি পরিত্যাগ করে শুধু জাতীয়তাবাদ লেখা হয়।

৩. ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ করে যে ধারাটি '৭২-এর শাসনতন্ত্রে লিখিত ছিল তা শাসনতন্ত্র থেকে বিলুপ্ত করা হয়।

এ কয়টি সংশোধনের তাৎপর্য

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি সকল দলের স্লোগান ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। অর্থাৎ তারা বাংলাদেশে এসব মতবাদ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের পৌনে চার বছরের শাসনকালে তারা এসব মতবাদকে বাস্তবে চালু করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের শাসনামলে কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। সাবেক ইসলামী দলগুলোর সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বশীলদের গ্রেপ্তার করা হয়। যাদের গ্রেপ্তার করা যায়নি তাদের জন্মগত নাগরিকত্বও হরণ করা হয়।

এ পরিস্থিতিতে পঞ্চম সংশোধনীর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ সংশোধনী দ্বারা আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিদের বুনিয়াদি আদর্শকেই উৎখাত করা হলো। তারা যে মতবাদের ভিত্তিতে এ দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন তাকে শাসনতান্ত্রিকভাবে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হলো। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েমের প্রধান আইনগত প্রতিবন্ধকতাই দূর হয়ে গেল।

ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করার ধারাটি বাতিল হওয়ার ফলে ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনের পথে আইনগত বাধাটি খতম হয়ে যাওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করার সুযোগও এসে গেল।

এ মৌলিক পরিবর্তনে বাদশাহ ফায়সালের অবদান

ইতঃপূর্বে আলোচনায় এসেছে যে, ১৯৭৭-এর মার্চে জেনারেল জিয়াউর রহমান বাদশাহ খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের দাবি জানালে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধনের শর্ত আরোপ করেন। ঐ শর্ত পূরণের প্রয়োজনেই প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই জেনারেল জিয়া পঞ্চম সংশোধনী ঘোষণা করেন।

এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ ফায়সাল প্রচণ্ড কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি না করলে কোন বাংলাদেশ সরকারই দেশের এত বড় আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হতো না। দেশের ইসলামী শক্তি এতটা সংগঠিত ছিল না যে, আন্দোলন করে সরকারকে এ বিরাট পরিবর্তনে বাধ্য করতে সক্ষম হতো।

তবে শুধু সৌদি আরবের কূটনৈতিক চাপেই সরকার '৭২ সালের পার্লামেন্টে সর্বসম্মতভাবে প্রণীত শাসনতন্ত্রে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের মৌলিক পরিবর্তনের সাহস পেত না। জনগণের মধ্যে এমন পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলে জেনারেল জিয়ার মতো হুঁশিয়ার ব্যক্তি এ পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজে নিতে পারতেন না। জনগণ এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবে বলে তাঁর ধারণা হওয়ার পেছনে কতক ঘটনার বিরাট অবদান রয়েছে।

১. শেখ মুজিবের হত্যার পর জনগণের মাঝে ব্যাপক উল্লাস।

২. এত বড় ঘটনায়ও শেখ মুজিবের সমর্থকদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিবাদ না হওয়া।

৩. খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহকে আওয়ামী লীগের পক্ষে বলে ধারণা হওয়ায় সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

৪. ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি, যা আওয়ামীদের 'জয় বাংলা' ধ্বনির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫. শেখ মুজিবের আমলে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্থিত সমাজতন্ত্রী শক্তি এবং সেনাবাহিনীতে কর্নেল তাহেরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগঠনের প্রচেষ্টা '৭৫ সালেই ব্যর্থ হয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ

লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাস ও সৌদি আরব থেকে '৭৭-এর মে মাসের শেষ দিকে খবর পেলাম যে, বাংলাদেশ সরকার সৌদি বাদশাহর শর্ত পূরণ করার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করায় অবিলম্বে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেওয়া হবে। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলাম যে, যখনই রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হোক, এমন এক ব্যক্তি যেন বাংলাদেশের প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত হন, যিনি শুধু কূটনীতিকই নন; বরং ইসলামের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য ও আগ্রহী। তাই শায়খ আহমদ সালাহ্ জামজুম, যিনি দু'বার আমাকে বাদশাহ্ ফায়সালের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। পূর্বেও তাঁর পরিচয় দিয়েছি যে, তিনি একসময় সৌদি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় জানতে পারলাম যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইসলামী এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খতীব এমন এক ব্যক্তি, যিনি আমার কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রদূত হতে পারেন। এ কথাও জানা গেল যে, তিনি রাষ্ট্রদূত হওয়ার পর্যায়ে এখনও উন্নীত হননি। আমি পূর্বে একবার তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম অন্য এক ব্যাপারে। এবার আবার তাঁর সাথে দেখা করে পরিচয়টা আরও ঘনিষ্ঠ করে রাখলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর আমি অন্তর থেকে কামনা করতে থাকলাম যে, যখন সৌদি সরকার বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে তখন যেন এই ব্যক্তি ঐ পর্যায়ে উন্নীত হন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর নিকট আমার মনের ভাব প্রকাশ করিনি।

এর দেড় বছর পর '৭৭-এর জুন মাসের শুরুতেই আবার সৌদি আরব গেলাম। লন্ডনেই গুজব শুনলাম, অমুক (নাম মনে নেই) রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হচ্ছেন। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম। শায়খ জামজুমের নিকট থেকে খোঁজ নেব বলে মনে করলাম। কিন্তু জেদ্দায় পৌঁছার পর প্রথমেই শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খতীবের অফিসেই চলে গেলাম। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বলে তাঁর কাছ থেকেই খবর জানা সহজ হবে বলে ধারণা ছিল। তাঁর অফিস জেদ্দায়ই অবস্থিত।

তাঁর পূর্বের অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি ইসলামী এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদে প্রমোশন পেয়েছেন। তাঁর নতুন কক্ষে গেলে তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথমেই জানতে চাইলাম, যিনি পূর্বে ডিজি ছিলেন তিনি এখন কোথায়? বললেন, তিনি ভারতে সৌদি রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগদান করেছেন। বুঝতে পারলাম যে, ডিজি হওয়ায় ফুয়াদ সাহেবও রাষ্ট্রদূত হওয়ার পজিশানে উন্নীত হয়েছেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন বলে যার নাম লন্ডনে শুনে এসেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন কেন? কারণ বললাম। তিনি অদ্ভুত রকমের মুচকি হাসি দিলেন। আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার চেহারায় উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে তিনি হাত বাড়িয়ে আমার সাথে হাত মিলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমারই নাম রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রস্তাবাকারে গিয়েছে। সেখান থেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি।"

এ কথা শুনে আমি জোরে 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করে আবেগের সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁর সাথে মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করলাম। বললাম, বাংলাদেশ তো রাষ্ট্রদূত পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আপনার নামের অনুমোদন অবশ্যই আসবে। এখান থেকে যে নামই যাক তা-ই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য মনে করবে। তাই আমার প্রিয় জন্মভূমিতে আপনাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পেয়ে আনন্দের সীমা নেই। গত দেড় বছর থেকে আমি এটা কামনা করে এসেছি। অন্য লোকের নাম শুনে আমি বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে আরও জানলাম, তাঁর পিতা শায়খ আবদুল হামীদ আল-খতীব পাকিস্তানে প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁরই ছেলে ফুয়াদ বাংলাদেশের প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত হলেন। তাঁর পিতার সাথে মাওলানা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল বলে জানার পর তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠ বলে অনুভব করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, "বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস, জনগণের শতকরা কত অংশ কোন্ ধর্মের অনুসারী, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের আদর্শিক পরিচয়, প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ইত্যাদি লিখিত আকারে আমাকে দিলে আমি ভালোভাবে স্টাডি করে প্রস্তুত হয়ে যেতে চাই।" আমি তাঁকে নিশ্চয়তা দিলাম যে, লন্ডনে ফিরে গিয়ে এসব বিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য ইংরেজি ভাষায় লিখে অবিলম্বে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব ইনশা আল্লাহ।

আমি ফুয়াদ সাহেবের অফিসে যাওয়ার সময় আমার সাথে ডা. আবদুস সালামকে নিয়ে গেলাম। ডা. আবদুস সালাম রিসিপশানের কামরায় ছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে ভেতরে নিয়ে ফুয়াদ সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "আমি আপনার জন্য তথ্যাবলি ইনার কাছে পাঠাব, তিনি আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন।" এ ব্যবস্থা তিনি পছন্দ করলেন। এ অফিসে সরাসরি পাঠালে অন্য কারো হাতে পড়তে পারে, যা সমীচীন নয়।

ডা. আবদুস সালামের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তিনি জেদ্দায় সৌদি ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রসংঘের রুকন ছিলেন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহানগরীর রমনা থানার আমীর।

লন্ডনে ফিরে গেলাম

সৌদি আরবে যে উদ্দেশ্যে গেলাম তা আশাতীতভাবে সফল হওয়ায় অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে

লন্ডন ফিরে গেলাম। ১৭ জুন (১৯৭৭) লন্ডন পৌঁছলাম। ২৮ জুন তুরস্ক যাওয়ার কথা, তাই সাত-আট দিনের মধ্যেই ফুয়াদ সাহেবের ফরমাইশ মোতাবেক তথ্যাবলি রচনা করে টাইপ করিয়ে ডা. আবদুস সালামের ঠিকানায় জেদ্দায় পাঠিয়ে দিলাম। তুরস্ক থেকে ফিরে আসার কিছু দিন পরই ডা. আবদুস সালামের চিঠি পেয়ে জানলাম, প্রেরিত তথ্যাবলি পেয়ে শায়খ ফুয়াদ অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং ডা. আবদুস সালামকে একটা হাতঘড়ি উপহার দিয়েছেন বলে জানলাম। তথ্যগুলো অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে আমার প্রতি আন্তরিকভাবে শুকরিয়াও জানিয়েছেন। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শুরু করার পূর্বেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐসব তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে তাঁকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে পেরে আমিও তৃপ্তিবোধ করলাম।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার রেফারেন্ডাম

সৌদি রাষ্ট্রদূত হিসেবে শায়খ ফুয়াদ আবুদল হামীদ আল-খতীব '৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসেই ঢাকায় কার্যভার গ্রহণ করলেন। এর কিছু দিন পরই প্রেসিডেন্ট জিয়া রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জানা প্রয়োজন মনে করলেন যে, জনগণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর ওপর আস্থা রাখে কি-না। সকল সামরিক প্রশাসকই এভাবে গণরায় নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। এটা কোন নির্বাচন নয়; এতে জনগণকে হ্যাঁ বা না ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় মাত্র। তিনি প্রেসিডেন্ট আছেন; জনগণ 'না' ভোট দিলেও তিনি প্রেসিডেন্টই থাকবেন। এটা নির্বাচন নয়। নির্বাচন হলে প্রেসিডেন্টের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অন্য প্রার্থী থাকতে পারে। এটা নির্বাচনী প্রহসন মাত্র। যারা 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে তারাই শুধু ভোট কেন্দ্রে যায়। যারা 'না'-এর পক্ষে তারা ভোট দিতে যায়ই না। তারা জানে যে, তাদের ভোটের কোন মূল্য নেই।

তবুও এ জাতীয় রেফারেন্ডামের আইনগত মূল্য রয়েছে। সরকার যদি বৈধ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠান করিয়ে নিতে পারে তাহলে দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তা বৈধ বলে আদালতেও স্বীকৃতি পাবে। এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলে আদালত তা খারিজ করে দিবে। আসল কথা হলো, ক্ষমতাসীন অবস্থায় আইন মন্ত্রণালয় আইন বিশেষজ্ঞদের কৌশলে সরকার আইনগতভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয় তাই বৈধ হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষমতা দখলে রাখতে সক্ষম অবস্থায় যা করা হয় তার পক্ষে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন হাসিল করতে পারলে বিচার বিভাগের আর কিছু করার উপায় থাকে না।

২৩ এপ্রিল (১৯৭৭) সামরিক ফরমানবলে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ঘোষণার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ৩০ মে তারিখে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনগণের 'হ্যাঁ' ভোট হাসিল করেন। এ রেফারেন্ডামে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনের সাথে আরও অনেক বিষয়কেই বৈধ করার ব্যবস্থা হয়। সামরিক আইন জারির পর থেকে ফরমানবলে যত আইন জারি করা হয়, এমনকি শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর ফরমানটিও রেফারেন্ডামের আওতায় আনা হয়। এর তাৎপর্য হলো, '৭৫-এর ৭ নভেম্বর জেনারেল

জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে '৭৭-এর ২৯ মে পর্যন্ত যত আইন, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিয়েছেন তা সবই রেফারেন্ডামের মাধ্যমে আইনগত বৈধতা পেয়ে গেল। এর ফলে এসব সম্পর্কে আদালতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। যদি কেউ কোন বিষয়ে মামলা দায়ের করে তাহলে তা আইনে টিকবে না।

জেনারেল জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী জারি করে সৌদি সরকারকে অবহিত করার পরই বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যে কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হচ্ছিল না সে আসল কারণটি দূর হয়।

এরপর মে মাসে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌদি সরকার তাকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানায়। জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সমমর্যাদা নিয়ে জিয়াউর রহমান সৌদি আরব গেলে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সৌদি আরবের নিকট একটি ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের মর্যাদা লাভ করে।

এরপর থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সৌদি সরকারের নিকট আজীবন সম্মানজনক মর্যাদা ভোগ করেন।

রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ

১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট সামরিক ফরমান বলে P. P. R. (Political Parties Regulation) নামে একটি বিধি জারি করা হয়। এ বিধিতে বলা হয়, যারা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে আগ্রহী তাদের এ বিধি অনুযায়ী সরকারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। দল গঠন করা সম্পর্কে সরকার কতক শর্ত আরোপ করেছে, যা পূরণ করা হলে সরকার দল গঠন করার অনুমতি দেবে। এভাবে রাজনৈতিক দলকে কতক বিধি-বিধানও মেনে চলতে হবে। রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই এ ফরমান জারি করা হয়।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সকল রাজনৈতিক দলকে বাতিল করে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কায়েম করেন, যার নাম ছিল 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)। '৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান পিপিআর-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেন; যাতে বহুদলীয় গণতন্ত্র আবার চালু হতে পারে। বাকশালী আইন অনুযায়ী আওয়ামী লীগও দল হিসেবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। নতুন আইন অনুযায়ী আওয়ামী লীগ আবার সংগঠিত হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শেখ মুজিব আজীবন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করে ক্ষমতাসীন হয়ে গণতন্ত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। আর জেনারেল জিয়া সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক শাসনে উত্তরণের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করলেন।

রাজনৈতিক দল গঠনের আইন জারি হওয়ার পরপরই মুসলিম লীগ নেতা জনাব আবদুস সবুর খান লন্ডন গেলেন। খবর পেয়ে আমি দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন,

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামপন্থি দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশে মতবিনিময় চলছে। আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এর পক্ষে সমর্থন জানালাম। তিনি জানালেন, "দলটির নাম কী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বিতর্ক চলছে। উপমহাদেশের মুসলিম জাতির প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ। তাই এ নামেই সবাই একমত হলে ভালো হয়।" আমি বললাম, "এ প্রস্তাব অন্য কোন দলের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সবাই নিজ নিজ নামের দাবি ত্যাগ করে নতুন কোন নামেই ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করা সম্ভব।"

১৯২.

হৃদয়বিদারক মৃত্যু

ইতঃপূর্বে 'হায়রে মৃত্যু' ও 'আবার হায়রে মৃত্যু' শিরোনামে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের স্ত্রী ও দ্বিতীয় ভাই ডাক্তার গোলাম মুয়াযযামের স্ত্রী সম্পর্কে দু'টি লেখা 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। আর এবার আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহিল মামূন আল-আযামীর স্ত্রীর ইন্তিকালে 'হৃদয়বিদারক মৃত্যু' শিরোনামে লিখতে হচ্ছে।

গত ৩০ নভেম্বর (২০০৪) আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহিল মামূন আল-আযামীর স্ত্রী উম্মে সালমা মুন্নীর মৃত্যু আমাদের গোটা বংশে এবং মুন্নীর আম্মা হাফিযা আসমার বংশে চরম হৃদয়বিদারক মৃত্যু বলে অনুভূত হয়েছে।

এক হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূল (স)-এর তিন বছর বয়সের ছেলে ইবরাহীমের ইন্তিকালে তিনি কেঁদেছিলেন। অন্তরে আঘাত অনুভূত না হলে কি চোখে পানি আসে? এ হাদীসটি থেকে উপদেশ পাওয়ার সাথে সাথে পরম সান্ত্বনা বোধ হয় বলে তা উদ্ধৃত করছি।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে ইবরাহীমের ধাত্রীর স্বামী আবূ সাইফুল কাইনের বাড়িতে গেলাম। রাসূল (স) ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুমু দিলেন ও তার শরীর শুঁকলেন। পরে যখন তিনি আবার ঐ বাড়িতে গেলেন তখন ইবরাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে রাসূল (স)-এর দু'চোখ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও (কাঁদলেন)? তিনি বললেন, হে আওফের ছেলে! এটা হলো মায়া-মমতার ব্যাপার। (ইবরাহীমের ইন্তিকালের পর) তিনি আবার কাঁদলেন আর বললেন, নিশ্চয়ই চোখ কাঁদে এবং মন বেদনাহত হয়। কিন্তু আমাদের রব অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কথা আমরা বলি না। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা মর্মাহত। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে উপদেশ পাওয়া গেল যে, আপনজন মারা গেলে কাঁদা ও বেদনাবোধ করা স্নেহ-মমতার কারণেই হয়ে থাকে। এটা দূষণীয় নয়। কিন্তু এমন কোনো কথা বলা অন্যায়, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ মৃত্যু যেহেতু আল্লাহর মর্জিতেই হয়, তাই শোকে কাতর হয়ে এমন কোনো কথা বলা কিছুতেই জায়েয নয়; যাতে বোঝা যায়, শোকার্ত ব্যক্তি আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এ হাদীস থেকে সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষও আপনজনের মৃত্যুর বেদনা ভোগ করেছেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তে যদি রাসূল (স)-কেও বেদনার যাতনা সহ্য করতে হয়, তাহলে আমাদের মতো লোকদের সহ্য করাই উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা সকল বিষয়েই এবং জীবনের সকল দিক দিয়েই রাসূল (স)-কে সুন্দরতম আদর্শ বানিয়েছেন। রাসূল (স)-এর জীবন থেকে সকল অবস্থায়ই উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করা যায়। দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মানুষও তাঁর দিকে খেয়াল করলে সান্ত্বনাবোধ করবে। তিনি এমন এক মানুষ, যার পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। তিনি যখন মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের বালক তখন তিনি মাকে হারিয়েছেন। তিনি কোন ধনীর ঘরে পয়দা হননি। মাতার মৃত্যুর পর গরিব দাদা তাঁকে লালন-পালন করেন। দাদার মৃত্যুর পর চাচার আশ্রয়ে থাকেন। এর চেয়ে বেশি দুরবস্থা কার হতে পারে? তাই তিনি সবচেয়ে দুঃখী মানুষের জন্যও সান্ত্বনার উৎস।

শোকের বেদনা আল্লাহর অজানা নয়

মৃত্যুজনিত শোক ও বেদনা সম্পর্কে আরও একটি হাদীস থেকে মূল্যবান উপদেশ ও শিক্ষা পাওয়া যায়। হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যখন আমার কোনো বান্দার ছেলে মারা যায় তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার ছেলের জান কবয করেছো? তারা বলেন, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি তার অন্তরের ভালোবাসাকে ছিনিয়ে নিয়েছো? তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাহ কী বলল? ফেরেশতারা বলেন, সে আলহামদু লিল্লাহ ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলল। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহর জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি তৈরি কর এবং এর নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার বাড়ি)। (তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল, মৃতের আপনজনদের অন্তরে শোকের তীব্র বেদনা আল্লাহ তাআলা অবশ্যই উপলব্ধি করেন। তাই যে আল্লাহর সিদ্ধান্তে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর প্রতি সামান্য অসন্তুষ্টিও বোধ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ঘনিষ্ঠজনের মৃত্যু দ্বারা তিনি বান্দাহকে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পুরস্কৃত করেন।

এ হাদীস আমাদের জন্য বিরাট সান্ত্বনার উৎস। গত কয়েক বছর বৌমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহর দরবারে এত ধরনা দেওয়ার পরও আল্লাহ্ যখন তাকে নিয়েই গেলেন, তখন কলিজা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো বেদনাবোধ করা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করতে তিনি তাওফীক দিলেন বলে মহান মা'বূদের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি মরহুমার মা, স্বামী, ভাইবোন ও সন্তানদের সবরের নেয়ামত দান করেছেন।

এ বৌমার জন্য কেন এত কাঁদলাম?

আমার ব্যক্তিগত আবেগের কথা প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তির উদ্রেক করছি কি-না, সে কথা খেয়াল করা সত্ত্বেও লিখছি। যারা এ লেখা পড়েন তাদেরকে আমার

শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই বিশ্বাস করি। তাই তারা আমার প্রতি সহানুভূতি বোধ করে আমার জন্যও দোআ করবেন এবং মরহুমার জন্যও দোআ করবেন বলে আশা করি। মনের বেদনা আপনজনদের কাছে প্রকাশ করলে উপশম বোধ হয়।

তাছাড়া সর্বদিক দিয়ে এমন গুণবতী মহিলা খুবই বিরল। তার গুণাবলির কথা অন্যদের অনুপ্রেরণা যোগাতেও পারে। তার এমন দুর্লভ গুণাবলির কারণেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশ, সৌদি আরব ও ইংল্যান্ডে অগণিত মহিলা তার জন্য চোখের পানি ফেলে দোআ করেছেন এবং তার মৃত্যুর পর আঝোরে কেঁদেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের কথা তো বলাই বাহুল্য। হয়তো দূর-সম্পর্কের এমন কোন আত্মীয়ও নেই, যে তার জন্য কাঁদেনি। সবাই বলেন, সে এমন এক মানুষ, যার উপর দুনিয়ার একটি লোকও অসন্তুষ্ট নয়। কাজের ছেলেমেয়েকেও সে কোনো দিন ধমক দিয়ে কথা বলেনি।

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব আবু নাসের বললেন, আমি কোনো শ্বশুরকে বৌমার জন্য এভাবে কাঁদতে দেখিনি। এ কথা আরও কয়েকজনের মুখে শুনলাম। নাসের সাহেব একদিন বললেন, বড় ভাই সাহেবও (লন্ডন-প্রবাসী মাওলানা আবদুল আউয়াল) মুন্নীর দুরারোগ্য ক্যান্সার হওয়ায় কেঁদেছেন। ঘটনাক্রমে বৌমার স্মরণে অনুষ্ঠিত দোআর মাহফিলে (০৩/১২/০৪ তারিখে) মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেব হাজির ছিলেন। দোআর শেষে তাঁকে বললাম, আপনি নাকি মুন্নীর জন্য কেঁদেছেন? তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার ছেলেমেয়ে সবাই ওকে আপন বোনের মতো ভালোবাসে।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে বহু দুর্লভ গুণে সজ্জিত করেছিলেন। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারিণী ছিল। সে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইসলামকে এমন আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম ছিল, যারা শুনত তারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে সাড়ে তিন মাস তাফহীমুল কুরআনের সহজ বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজনে জেদ্দায় মামূনের বাসায় ছিলাম। মুন্নী ইন্টারনেট থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তথ্য যোগাড় করে এর প্রতিকার সম্পর্কে আমার সাথে অলোচনা করতে চাইল। আমি বললাম, মা! অনুবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি সময় দিতে পারছি না। তাই নাশতা ও দু'বেলা খাবার আমার সাথে খাও। তখন আলোচনা করার সময় হবে।

প্রায় নিয়মিতই এ আলোচনা চলল। কিছু দিনের মধ্যেই আমি তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক মান (High Intellectual Level) দেখে মুগ্ধ হলাম। শ্বশুর হিসেবে রীতিমতো গর্ববোধ করলাম। মহিলাঙ্গনে এ মানের ব্যক্তির গুরুত্ব আরও বেশি।

সৌদি আরবে ফিলিপাইনের বহু লোক কাজ করে। তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা অনেক। জেদ্দায় 'ইসলামিক এডুকেশন ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে নওমুসলিমদের ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। ফিলিপিনোরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। তাই তাদের সুবিধার জন্য সেখানকার মসজিদে জুমুআয়

ইংরেজিতে খুতবা দেওয়া হয়। আরবী খুতবা বুঝে না, এমন অনেক বিদেশী সেখানে জুমুয়ায় হাজির হয়। আমিও সেখানে জুমুআ আদায়ের জন্য যেতাম। প্রতি জুমুআতেই কয়েকজন করে নতুন মুসলমান হতো। সকল মুসল্লি অত্যন্ত জোশের সাথে কোলাকুলি করে তাদের অভিনন্দন জানাত; তারাও খুব খুশি হতো দেখে আমি পুলকিত হতাম।

ঐ প্রতিষ্ঠানটি জেদ্দায় বসবাসরত বিদেশী মহিলাদের ইসলামী জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করে। মুন্নী ২০০১ থেকে ক্যান্সারের রোগী। আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করতাম, ইংরেজিতে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে প্রায় সপ্তাহেই সেখানে যেত। তার পরিবেশন তারা অত্যন্ত কার্যকর মনে করত বলেই তাকে দাওয়াত দিত। আল্লাহ যাদের দীনের যোগ্যতা দান করেন তারা দীনের খিদমতের ডাক এলে অসুস্থ অবস্থায়ও সাড়া না দিয়ে পারে না।

গত জুন মাসে (২০০৪) ম্যানচেস্টারে ফোন করে জানলাম, মুন্নী পাঁচ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর কিছুটা সুস্থতা বোধ করছে এবং দীনের দাওয়াতে বের হয়ে যাচ্ছে।

আমার পাঁচ বৌমাকে তাদের নাম ধরেই ডাকি। কিন্তু শুধু মুন্নীকেই 'মা' বা 'মা মুন্নী' বলে ডাকতাম। আমাকে আল্লাহ কোনো কন্যা সন্তান দেননি বলে আমাদের পয়লা বৌমাকেই কন্যার আসন দিয়েছি। এমনিই তো সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর কন্যা। ওর ছোটকালে ওকে কোলে নিয়ে আদরও করেছি।

ওর বিয়ের ১৫ দিন পর আমার মগবাজারের বাড়িতেই আমার শাশুড়ি ইন্তিকাল করেন। আমার স্ত্রী বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মুন্নী তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আমার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আমার এক মা চলে গেলেন, আর এক মা পেলাম।' তখন থেকেই সে আমাদের মা– শুধু বৌমা নয়।

আল্লাহ তাআলা তাকে এমন মায়াবিনী চেহারা দিয়েছিলেন, ওকে দেখলে চোখ জুড়াত ও তার হাসিমুখ প্রাণে তৃপ্তি দান করত। ওর মুখে 'আব্বা' ডাক শুনে প্রাণ ভরে যেত। সে আমার ও আমার স্ত্রীর অন্তরজুড়ে অবস্থান করত। তাই ২০০১ সাল থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে বহু কেঁদেছি। তার মৃত্যুর পর চোখের পানি শুকিয়ে গেছে।

আমি ওকে 'মা' ডাকতাম

আমাকে আল্লাহ তাআলা ছয়টি ছেলে দিয়েছেন, কোনো মেয়ে দেননি। ছেলেদের বিয়ে করিয়ে ছয়টি মেয়ে যোগাড় করেছি। বৌমারা তো মেয়ের মতোই মর্যাদা পায়, যেমন– জামাতারা ছেলের মতো। কিন্তু আমার বড় বৌমাটি আরও বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। সে আমার ছাত্র-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম হাফিয ফয়েয মুহাম্মদের কন্যা। হাফিয সাহেবের বাড়ি শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানায় হলেও ব্যবসায় উপলক্ষে ঝালকাঠি শহরে বাড়ি করে থাকতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমি জামায়াতের সাংগঠনিক সফরে ঝালকাঠি গেলে হাফিয সাহেবের বাড়িতেই মেহমান হলাম। তখন এ মেয়েটির বয়স ৩/৪ বছর। শান্ত-শিষ্ট ফুলের মতো সুন্দর এ মেয়েটি আমার কোলে বসে আমাকে চাচা ডেকে মুগ্ধ করত। এরপর যতবার ঝালকাঠি গিয়েছি, ঐ বাড়িতেই উঠেছি।

হাফিয সাহেবের স্ত্রী হাফিযা আসমা খাতুন (১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে জামায়াতের দু'জন মহিলা এমপির মধ্যে একজন এবং জামায়াতের মহিলা বিভাগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি) ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ায় এ পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে হজ্জের মওসুমে হাফিয সাহেবের সাথে মক্কা শরীফে দেখা হয়। আমি বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে থাকায় হাফিয দম্পতির সাথে সম্পর্কে ছেদ পড়ে যায়।

১৯৭৭ সালে আমার বড় ছেলে মামূন ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনোমিক্সে অনার্স পাস করে এবং ০৭.০৭.১৯৭৭ তারিখে কনভোকেশনে ডিগ্রি হাতে পায়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে আসার জন্য সরকারি অনুমতি (N.O.C) পাই। তখন আমি আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে সালমানসহ কুয়েতে অবস্থান করছিলাম।

দেশে ফিরে আসার সুযোগ পেয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, মামূনের বয়স ২৫ বছর হয়ে গেছে। নবী করীম (স) এ বয়সেই বিয়ে করেছেন। তাহলে দেশে গিয়ে মামূনকে বিয়ে করানোর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন, আমি মেয়ে দেখে রেখেছি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কই আমাকে তো সে কথা বলনি? তিনি বললেন, এমএ পাস করার আগে ছেলেকে বিয়ে করাবেন বলে মনে করিনি বলেই বলিনি। জানতে চাইলাম, মেয়ের পরিচয় কী? যখন জানলাম তখন মন্তব্য করলাম, 'আমি ঐ মেয়ের চাচা হই, সে এত বড় হয়ে গেছে?' তখন মেয়ের পিতার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্ত্রীকে জানাই।

১৯৭৮-এর ১১ জুলাই ঢাকা পৌঁছলাম। কিছু দিন পরই বন্ধু হাফিয ফয়েয মুহাম্মদ আমার সাথে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে আমার আদরের ভাতিজি মুন্নীকেও নিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি আপনার সাথে দেখা করতে আসব শুনে সে 'চাচাকে দেখতে আমিও যাব' বলে আমার অনুমতি ছাড়াই সঙ্গ নিল। মুন্নী আইএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফলের অপেক্ষা করছে। মুন্নীকে দেখে মনে মনে আমার স্ত্রীর সিলেকশনের যোগ্যতার প্রশংসা করলাম। মুন্নী একটু দেখা দিয়ে আমার কুশলাদি জেনে ভেতরে চলে গেল।

হাফিয সাহেব বললেন, আমি তাড়াহুড়া করেই আসতে বাধ্য হয়েছি। মুন্নীর জন্য বিয়ের কয়েকটি প্রস্তাব হাতে আছে। হাফিযা আসমা আমাকে বলে পাঠিয়েছে, আপনি যেটা পছন্দ করেন সে প্রস্তাবই গ্রহণ করা হবে। তাহলে প্রস্তাবগুলোর বিবরণ পেশ করি। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই আপনি তো আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে দিলেন। মুন্নীর জন্য যেসব প্রস্তাব এসেছে, এর মধ্যে কোন্টা আমি সবচেয়ে ভালো মনে করি তা জানতে এসেছেন। আমি যদি বলি, মুন্নীকে আমার বাড়িতে তুলে আনতে চাই, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? এ কথা শুনে জোরে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আবেগের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। দু'জনেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলাম। ছেলে বিয়ে করাতে হলে কনের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। প্রস্তাবে

রাজি হলে যথারীতি সামাজিক প্রথা অনুযায়ী এগুতে হয়। বরের পিতা ও কনের পিতার মধ্যে প্রথমেই সরাসরি কথা হয় না। অন্যরা কথা বলে এগুনোর পর শেষপর্যায়ে বর ও কনের পিতার মধ্যে কথা হয়। এখানে কোন ঘটকের তো প্রয়োজনই হয়নি, তৃতীয় পক্ষেরও কোন ভূমিকা পালন করতে হয়নি।

পিতা কন্যাকে যেভাবে আদর করে মা ডাকে, আমিও মুন্নীকে সেভাবেই ডাকতাম। সে যেভাবে আমাকে আব্বা ডাকত তা কেউ দেখলে শ্বশুর-বৌমার মতো সম্পর্ক মনে করত না। শ্বশুরের সাথে একটু সমীহ করেই বৌমারা কথা বলে। কিন্তু বাবার সাথে মেয়ে যেভাবে কথা বলে, মুন্নী আমার সাথে ঠিক সেভাবেই কথা বলত। কোন কোন সময় মেয়ের মতো আবদারও করত।

অক্টোবরের (২০০৪) শুরুতে যখন তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, তখন থেকে ৩০ নভেম্বর তার মৃত্যু পর্যন্ত দু'টো মাস আমার মানসিক অবস্থা এমন হলো যে, লেখাপড়ার ব্যস্ততা থেকে মনটা খালি হলেই মা মুন্নীর কথা মনে হতো আর চোখের পানি ঝরতে থাকত। ঐ মায়াবিনী চেহারা আর দেখতে পাব না, চাঁদ মুখের ঐ হাসি আর দেখব না, আব্বা বলে মুন্নী আগের মতো আর ডাববে না, কোনো আবদার নিয়ে আর হাজির হবে না ইত্যাদি কথা মনে ভিড় করত। ১৫ নভেম্বর (২০০৪) ঈদের নামায শেষে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখলাম, চোখ বুজে পড়ে আছে। মা বলে ডাকতেই চোখ খুলে আস্তে করে শেষবারের মতো আব্বা বলেই চোখ বন্ধ করল।

মুন্নী বড়ই কষ্ট ভোগ করে গেল

১৯৯৭ সালে মা মুন্নীর শেষ পুত্রসন্তানটি পেটে থাকা অবস্থায়ই গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে মারা গেল। জেদ্দা হাসপাতালে ডাক্তাররা অপারেশন না করে প্রসব করাতে চেষ্টা করায় প্রচণ্ড ব্যথায় সে দীর্ঘ সময় কষ্ট পেল। প্রসবের পর সন্তানটিকে দেখে কষ্ট আরও বেড়ে গেল। ফোনে ঢাকা থেকে সান্ত্বনা দিলাম। সে বলল, আব্বা আমার সব ছেলের চেয়ে এটা দেখতে বেশি সুন্দর ছিল।

২০০১ সালের নভেম্বরে ক্যান্সার ধরা পড়ল। ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশেও রোগ নির্ণয়ে ছয় মাস দেরি হয়ে গেল। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এ মহাব্যাধিতে আমার চাচাতো ভাই জহুরে সারওয়ারের স্ত্রী (শাহ আবদুল হান্নানের বোন) মারা যায়। কিন্তু আমার এক ভাতিজি ও এক ভাগ্নির এ রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ হয়। বোঝা গেল, এ রোগ ছড়িয়ে গেলে একবার ভালো হয়ে গেলেও আবার দেখা দেয়।

ক্যান্সার চিকিৎসায় যেসব থেরাপি প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলো তার দেহের প্রতিরোধশক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে অনেক রকম উপসর্গ জন্ম নেয়। সেসব সামাল দিতে রোগীর কষ্ট বেড়েই চলে। মাথার চুল এমনকি ভ্রূ পর্যন্ত পড়ে যায়। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে মা মুন্নী মোটামুটি সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসে দুই মাস বেড়িয়ে গেল। চুল আবার গজালো। স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি মনে হলো। খুব ভালো লাগল। ২০০৩-এর

জুন মাসে আবার ঐ রোগ বেড়ে গেল। তখন সে জেদ্দায় ছিল। সৌদি আরবেও উন্নত চিকিৎসা আছে। ম্যানচেস্টারের মতোই সেখানকার চিকিৎসায় উন্নতি দেখা গেল। আবার ঢাকা এসে বেড়িয়ে গেল। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে আবার রোগ বেড়ে গেলে সৌদিতে ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করে হতাশ হয়ে গেলেন। তাই ফেব্রুয়ারিতে আবার ম্যানচেস্টার নেওয়া হলো। মে মাস পর্যন্ত সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। জুলাইয়ে আবার রোগ বেড়ে গেলে ক্যান্সার হাসপাতাল চিকিৎসা শুরু করে হতাশ হয়ে হোমিওপ্যাথি ট্রাই করার পরামর্শ দিল। তাই ঢাকায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হলো।

১২ আগস্ট মা ঢাকায় এসে পৌঁছল। ঘটনাক্রমে ১১ আগস্ট আমাকে হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। মা ১২ তারিখেই আমাকে দেখতে হাসপাতালে গেল। দেখে কি যে ভালো লাগল!

যে হোমিও ডাক্তারের সুনাম শুনে চিকিৎসা শুরু করা হলো, দেড় মাস পর অনেক অবনতি হওয়ায় ডাক্তার পরিবর্তন করা হলো। তাঁর চিকিৎসায় বিভিন্ন উপসর্গের সাময়িক উপশম হলেও অবস্থার অবনতি অব্যাহতই রইল। ১৫ নভেম্বর ঈদুল ফিতরের দিবাগত রাতে তার অবস্থা এমন হলো যে, হাসপাতালে ভর্তি করাতে বাধ্য হলাম। ইবনে সিনা হাসপাতালের মতো দীনী ভাইদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থাকায় ইবনে সিনা ট্রাস্টের জেনারেল ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম খানকে ফোনে জানানোর এক ঘণ্টার মধ্যে হাসাপাতালের আবাসিক দায়িত্বশীল ডাক্তার আকমান এম্বুলেন্স নিয়ে নিজেই এসে নিয়ে গেলেন। ঈদের রাতে ডাক্তার পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু রাত ১১টায় বড় দু'জন ডাক্তার ডেকে দেখানোর ব্যবস্থা করলেন।

বাড়িতে থাকাকালেও মাঝে মাঝে অক্সিজেন দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করা হতো। হাসপাতালের কেবিনে সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০ নভেম্বর দুপুরে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিতে হলো। ২৩ তারিখ সকাল ১০টায়ও হুঁশ ছিল বলে মনে হয়েছে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় বড় ডাক্তার দেখে মন্তব্য করলেন, রাতটা পার হয় কি-না বলা যায় না। ৩০ তারিখ সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায় থেকে মা মুন্নী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

ইবনে সিনা হাসপাতালের প্রশাসন, ডাক্তার, নার্স, ক্লিনার ও সকল স্টাফ যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে খিদমত করেছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ ও অভিভূত। আল্লাহ তাআলা তাদের পর্যাপ্ত পুরস্কার দান করুন।

এ রোগে প্রচণ্ড ব্যথা ও অন্যান্য দৈহিক যাতনায় রোগী যে কষ্ট ভোগ করে তা দেখলে মর্মাহত হতে হয়। মাকে ব্যথা-বেদনায় কাতরাতে দেখলে মনে বড়ই আঘাত পেতাম। তিন বছর মা এত কষ্ট ভোগ করেছে, যা আমাদের অশ্রুসজল করে দিত। আল্লাহর রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন, সামান্য কাঁটা ফোটার ব্যথারও সওয়াব দেওয়া হবে। এ সান্ত্বনা নিয়েই আছি যে, আল্লাহ তাআলা এসব কষ্টের বদলে তাকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন।

১৯৩.

মা মুন্নীর অবদান

আমাদের পরিবারে মা মুন্নীর অবদানের স্মৃতি সবাইকেই তৃপ্তি দেয়। আমার ছেলেদের মধ্যে মামূনকে আল্লাহ তাআলা দীনী ইল্ম ও জযবা যে পরিমাণ দিয়েছেন, তার জীবনসাথী হিসেবে মুন্নী এমন মানানসই হয়েছে যে, সে মামূনের জীবনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বলে আমরা সবাই অনুভব করতাম। মামূনের দীনী জিন্দেগীকে সে সমৃদ্ধ করেছে। তার সান্নিধ্য মামূনের জীবনে পূর্ণতা এনে দিয়েছে। বিয়ের পর ২২ বছর পর্যন্ত একটানা দু'জন একসাথে ছিল দেশে ও বিদেশে। ছেলেদের লেখাপড়ার প্রয়োজনে ইংল্যান্ড পাঠাতে হলো। বিদেশে সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য মুন্নীকে ম্যানচেস্টার পাঠাতে বাধ্য হলো। জেদ্দায় মামূন একা তিন-চার মাসও থাকতে পারত না। মামূনের প্রতিটি ব্যাপারে মুন্নী এতটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, মুন্নীর অভাবে তার মানসিক ভারসাম্যের অভাব অনুভূত হলো।

২০০১ সালের নভেম্বরে মুন্নীর ক্যান্সার হওয়ার পর থেকে ২০০৪ সালের ৩০ নভেম্বর মুন্নীর মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর মামূনই মুন্নীর খিদমতের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেল। এত দিন মুন্নী ছাড়া মামূনের চলত না। এ তিন বছর এর বিপরীত অবস্থা দেখা গেল। এমন আদর্শ জীবনসাথীকে হারিয়েও আল্লাহর রহমতে মামূন মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত নয়। আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সে মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিন বছরের কঠিন পরীক্ষায় মামূন উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ!

সন্তানদের প্রতি অবদান

মা মুন্নী একজন আদর্শ মুসলিম মাতার ভূমিকা পালন করে আমার নাতি-নাতনিদের প্রতি বিরাট অবদান রেখেছে। সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে তাদের দীনের পথে ধরে রাখা যে কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে আমার ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে দীনের দিক দিয়ে মযবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। তাদেরকে পিতামাতা উভয়েই গড়ে তুলেছে। তবে মায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া পিতার একার পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

তাদের বড় ছেলে নাবীল (২০০৩) ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাস করেছে। এ বছর (২০০৪) কায়রোতে আরবী শেখার জন্য এমএ পড়া মুলতবি করেছে। আগামী বছর 'Human Resource Management'-এ মাস্টার্স করার আশা রাখে। সে ম্যানচেস্টারে ইয়ং মুসলিম অরগানাইজেশনের প্রধান দায়িত্বশীল এবং ইসলামী আন্দোলনে পূর্ণরূপে সক্রিয়।

মায়ের খিদমত করার জন্য ২১ অক্টোবর সে ঢাকা এসেছে। ঈদের পরদিনই ঢাকা থেকে কায়রো চলে যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু যেতে পারল না।

দ্বিতীয় ছেলে নাযীল এ-লেভেল পাস করে আরবী শেখার জন্য এক বছর বিলম্ব করে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে 'ফিজিক্স'-এ অনার্স পড়ছে। তৃতীয় ছেলে ওসামা এ-

লেভেল পাস করে আরবী শেখায় এক বছর ব্যয় করে এবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামিক হিস্ট্রি উইথ ফারসীতে (আরবী তো জানেই) অনার্সে ভর্তি হয়েছে। সে ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম সম্পর্কে অরিয়েন্টালিস্টদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির মোকাবিলা করার জযবা নিয়ে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও ঐ কোর্স পড়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। ওর আগ্রহ দেখে আমরাও ওর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম, সে একজন ডাক্তার হোক। তাই প্রথমে আপত্তি করেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছেলে আরবী শেখার পর সামার ভ্যাকেশনে ম্যানচেস্টারে আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোর্স চালু করেছে। ছোট দু'ভাই আরবীর শিক্ষক হয়ে গেল দেখে বড় ভাইও আরবী শেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কুরআন ও হাদীস সরাসরি অধ্যয়নের জন্য আরবী ভাষা শেখা অপরিহার্য। তাই ওদের আরবী শেখার আগ্রহ দেখে আল্লাহর প্রতি লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ওরা তিনজনই বাপ-মায়ের তাগিদ ও চাপ ছাড়াই প্রথম থেকেই দাড়ি রেখেছে। সুন্দর তরুণ মুখে কালো দাড়ি কতই না চমৎকার দেখায়! ওদের দেখে চোখ জুড়ায়, প্রাণ শীতল হয় এবং দিল থেকে দোআ বের হয়ে আসে।

মা মুন্নী হাসপাতালে থাকাকালে বাড়িতে এক লোক ফোনে মামূনের সাথে কথা বলতে চাইল। বড় ছেলে নাবীল ফোন ধরে বলল, আব্বা হাসপাতালে। ঐ লোক জিজ্ঞেস করল, তুমি কি মামূনের ছেলে? হ্যাঁ-বোধক জবাব দিলে ঐ লোক জিজ্ঞেস করল, তুমি নামায পড়ো তো? ফোনে কথা শেষ হলে নাবীল বিস্মিত হয়ে আমাকে বলে, দাদা এ লোকটি কি জানেন না, আমি কেমন ফ্যামিলির ছেলে? কেমন করে এমন প্রশ্ন করল?

মামূন-মুন্নীর তিন ছেলের পর দু'মেয়ে। বড় মেয়ে লুবাবা জেদ্দাস্থ মানারাত স্কুল ও কলেজ থেকে গত জুন (২০০৪) মাসে এ-লেভেল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ের খিদমত করার জন্য ম্যানচেস্টার যেতে বাধ্য হলো। তাকে ম্যানচেস্টারে নতুন করে এ-লেভেলে ভর্তি হতে হয়। মায়ের অসুখের কারণে ওর দু'টো বছর নষ্ট হয়ে গেল। সে গত বছর আমার ও আমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করেছে বলে আমি ওকে 'আরাফাতী বোন' বলি। সে ইংরেজিতে কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করে এবং ইসলামী ছাত্রীসংগঠন 'মুসলিমাত'-এর ম্যানচেস্টার শাখার দায়িত্বে আছে।

ছোট মেয়ে নুসাইবা জেদ্দাস্থ মানারাত স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছিল এবং বাংলাদেশী এক হাফিযার নিকট কুরআন হিফয করছিল। আড়াই পারা মুখস্থও হয়েছিল। ওর মায়ের সাথে চলে আসায় স্কুলের পড়া ও হিফয মুলতবি হয়ে আছে। এখন সে তার আব্বার সাথে জেদ্দা যাচ্ছে। সেখানে স্কুল ও হিফযের পড়া শুরু করার আশা করছে। ইসলামী আন্দোলনের এক সহকর্মীর বাসায় থাকবে। মামূন নিজের বাসা ছেড়ে দিয়ে অনেক আসবাবপত্র বিক্রয় করে গত ফেব্রুয়ারি (২০০৪) মাসে মুন্নীকে নিয়ে ম্যানচেস্টার গিয়েছিল।

আমার বাড়ি নির্মাণে মা মুন্নীর অবদান

আমি মগবাজারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিতে সেমিপাকা টিনশেডে বসবাস করছিলাম। বাবা মামূন ও মা মুন্নী আমার ও আমার স্ত্রীর আরামের জন্য বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল। মামূন জেদ্দাস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে ১৯৯৬-এর মার্চে যোগদানের পরই তারা এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়ার পূর্বে নিজেদের টাকায় কাজ শুরু করতে হয়। জমির মালিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করলে ব্যাংক পরে শরীক হয়।

মা মুন্নী লন্ডনে স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করে পাঁচ লাখ টাকা সঞ্চয় করেছিল। সর্বপ্রথম ঐ ৫ লাখ টাকা দিয়েই বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করা হয়। এরপর মামূন ১০ লাখ টাকা দেয় এবং অন্য ছেলেরা আড়াই লাখ করে দেয়।

১৯৯৮ সাল থেকে আট তলা বিল্ডিং-এ আরামে বসবাস করছি। এ বিল্ডিং তৈরিতে মা মুন্নীর অবদান সর্বপ্রথম।

মা মুন্নীর অন্তিম অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের আগমন

গত ঈদুল ফিতরের দিবাগত রাত ১৫ নভেম্বর (২০০৪) মা মুন্নীর অবস্থার এতটা অবনতি হলো যে, হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হলাম। আমার স্ত্রী বললেন, ম্যানচেস্টারে এখনই মেসেজ দিতে হবে, যেন মা মুন্নীর ছেলে-মেয়েরা অবিলম্বে ঢাকা চলে আসে।

তিন ছেলে দু'মেয়ের মধ্যে ছোট মেয়ে মায়ের সাথেই আগস্টে এসেছে। বড় ছেলে অক্টোবরে পৌঁছে গেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছেলে এবং বড় মেয়ে ১৭ নভেম্বর '০৪ তারিখ সকাল ৯ টায় বিমানবন্দর থেকে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। আমার তৃতীয় ছেলে মোমেন সেখানে একটা বড় ট্রাভেল এজেন্সিতে কর্মরত থাকায় ১৬ তারিখেই রওয়ানা করিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

আমার এ দৃশ্যটা দেখার খুব আগ্রহ ছিল যে, ওরা যখন মার কাছে আসবে তখন ওরা এবং ওদের মা কেমন আবেগ প্রকাশ করে। যদি মা মুন্নী বাড়িতে থাকত তাহলে এটা সম্ভব হতো। হাসপাতালে থাকার কারণে আমি দৃশ্যটা দেখতে পারলাম না। ওরা হাসপাতালে মাকে দেখে যখন বাড়িতে পৌঁছল তখন ওদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মা মুন্নী সামান্য আবেগও প্রকাশ করেনি। একেবারে ধীরস্থির কণ্ঠে ওদেরকে বলল, তোমরা দোআ, করো যেন আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের দারাজাহ দান করেন। আমি বুঝতে পারলাম, সে যে বাঁচবে না, এ বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে।

রাসূল (স) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন রকম মৃত্যুতে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে। মৃত ব্যক্তির ঈমান থাকা অবশ্য শর্ত। যদি কোনো ঈমানদার ব্যক্তি পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, দুর্ঘটনায়, প্লেগে, পেটের পীড়ায় নিহত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। সে হিসেবে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু হওয়ায় মা মুন্নী ঐ মর্যাদা পেতেও পারে। আমরা দোআ করি এবং সবার কাছে দোআ চাই, আল্লাহ তাআলা যেন তার এ অন্তিম কামনা পূরণ করেন।

সকল আত্মীয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা সে পেয়েছে

ঢাকায় মা মুন্নীর সাড়ে তিন মাস অবস্থানকালে দূরের আত্মীয়রা পর্যন্ত পেরেশান হয়ে দেখতে এসেছে, প্রাণভরে দোআ করেছে এবং খাবার জন্য অনেক কিছু এনেছে। নিকটাত্মীয়রা তো হৃদয় উজাড় করে আরোগ্যের জন্য কাতরভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাস প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে। আত্মীয়, আত্মীয়দের আত্মীয় ও তাদের পরিচিত বহু লোক অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রক্ত দান করেছে।

মুন্নীর বড় ভগ্নিপতি শেখ আলী আশরাফ ইনসাফ হাসপাতালের অন্যতম মালিক এবং ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সাথেও সম্পৃক্ত। তিনি মা মুন্নীর চিকিৎসা, অক্সিজেন যোগাড় ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে সর্বদা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। এসব খাতে যত টাকা খরচ হয়েছে তা পরিশোধ করার অনুমতি মামূনকে দেননি। মা মুন্নীর ছোট ভগ্নিপতি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার প্রয়োজনে সারা রাত জেগে রক্ত সংগ্রহ করেছেন। মুন্নীর ছোট ভাই সাইফুল্লাহ মানসূর ও তাদের দু'বোনকে তাদের প্রিয়তম বোনের চিকিৎসা ও সেবায় রাত-দিন ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। মা মুন্নীর বৃদ্ধা মা মুহতারামা হাফিয়া আসমা মুন্নী ঢাকা আসার পর একদিনও মেয়েকে রেখে অন্য কোথাও যাননি। এক-আধ দিন তাঁর ছেলে বা মেয়ের বাসায় বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেও তাঁকে রাজি করাতে পারিনি। তিনি ২০০৩-এর এপ্রিল থেকে ১৪ মাস মেয়ের সেবার জন্য জেদ্দায় ছিলেন, যে বয়সে তার খিদমত পাওয়া উচিত, সে বয়সেই তিনি খিদমত করে গেলেন।

মুন্নীর বড় বোন শাম্মীর বড় বৌমা ডাক্তার কানিজ ফাতেমা শীলা বারবার এসে একজন মহিলা ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। সে যে দরদ ও মহব্বতের সাথে সেবা করেছে তাতে মুন্নী খুবই সন্তুষ্ট হয়েছে। বাড়িতে অন্য কোন মহিলা ডাক্তারকে এতবার এনে ঐ দায়িত্ব পালন করানো অত্যন্ত কঠিন হতো।

মুন্নী ম্যানচেস্টার থাকাকালে আমার অন্যান্য ছেলে ও বৌমা'রা এবং ভাতিজা ও বৌমা ওখানকার ব্যস্ত জীবন সত্ত্বেও ওদের প্রিয় বড় ভাবির জন্য যথেষ্ট করেছে। বিশেষ করে আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের স্ত্রী ডালিয়ার খিদমতের কথা মামূন খুবই স্মরণ করে।

মা মুন্নীকে ঘিরে আমার পেরেশানির নিত্যশরীক আমার স্ত্রীর মুখে মুন্নীর স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হওয়ার পর থেকে আর হাসি দেখিনি। আমরা দু'জন মা'র কথা যখনই আলোচনা করতে চেয়েছি, চোখের পানির বন্যায় আমরা ভেসে গেছি। তখন মুখ দিয়ে আর কথা বের হতো না।

আমার ভাইদের ছেলে-মেয়েরা যে ওদের ভাবিকে কত ভালোবাসত তা তাদের চেহারা ও আচরণে সুস্পষ্ট ছিল। সংসার ও কাজকর্ম ফেলে ওরা বারবার এসে খোঁজ নিত। পাড়া-প্রতিবেশীরাও ওর জন্য প্রাণভরে দোআ করত। সে সত্যিই বড় ভাগ্যবতী।

মামূন-মুন্নী মানিকজোড়

ওদের দু'জনকে একসাথে দেখলে মানিকজোড় মনে হতো। ওরা আমাদের চোখের মণি ও মনের শান্তির উৎস ছিল। পরিচিত মহলে ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে গণ্য ছিল।

একটি আদর্শ ইসলামী দম্পতির নমুনা স্থাপন করায় সফল ছিল।

সূরা আর-রূমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া পয়দা করেন, যাতে তার মধ্যে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনিই তোমাদের (দু'জনের) মধ্যে বন্ধুসুলভ মহব্বত ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

সত্যিই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে মহব্বত ও একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখা যায়, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অপার দান। এ সম্পর্কের কোনো তুলনা নেই। এটাই দম্পতিকে প্রকৃত শান্তি দেয়। ঐ মানিকজোড়ের মধ্যে এ সম্পর্ক যে অত্যন্ত গভীর ছিল তা আমরা অনুভব করতাম। অসুস্থতার একটানা তিন বছরে মামূন যা করেছে, তা ঐ রকম গভীর সম্পর্ক না থাকলে কিছুতেই সম্ভব হতো না।

মামূন এমন একজন আদর্শ জীবনসাথী থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। দোআ করি আল্লাহ তাআলা যেন বেহেশতে তাদের আবার মিলিত করেন।

মা মুন্নী আন্দোলনের নেতাদের স্নেহধন্য

মা মুন্নী শুধু আমার স্নেহধন্যাই ছিল না; ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দেরও সে পরম স্নেহধন্যা ছিল। ইসলামী আন্দোলনের মহিলা মহলের নেত্রী মুহতারামা হাফিযা আসমার মেয়ে ও ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যা এবং বিদেশে মহিলাঙ্গনে দীনের দা'য়ী হিসেবে মা মুন্নী মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিল। মাওলানা ইউসুফ ফোন করে প্রায়ই ওর খোঁজ-খবর নিতেন।

মাওলানা সাঈদীর সাথে আমার পরম ঘনিষ্ঠ মহব্বতের কারণে তিনিও মুন্নীকে আপন মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন। আমার মতো তাঁরও কোন কন্যাসন্তান নেই। তিনি প্রতি বছরই একাধিকবার সৌদি আরব ও ইংল্যান্ড যান। জেদ্দা ও ম্যানচেস্টারে তিনি শুধু ফোনে খবর নেওয়াই যথেষ্ট মনে করতেন না, সময় করে বাসায় গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি কথা বলে মুন্নীর স্বাস্থ্যের অবস্থা জেনে নিতেন। মুন্নীর ছেলে-মেয়েরা 'সাঈদী দাদা'র ভক্ত। গত মে মাসে তিনি ম্যানচেস্টার গেলেন। আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বাড়িতে তখন মুন্নী ছিল। সেখানে আমার পাঁচ ছেলে, চার ছেলের ছেলে-মেয়েরা, আমার বৌমারা একত্রিত হয়। আমার বড় ভাতিজা সোহায়লও সপরিবারে হাজির হয়। মাওলানা সাহেব সবাইকে নিয়ে মুন্নীর জন্য দোআ করেন। তিনি ঢাকা ফিরে এসে জানালেন, তিনি আমার প্রক্সি দিয়ে এসেছেন।

গত তিন বছর মাওলানা সাঈদী মা মুন্নীর আরোগ্যের জন্য চট্টগ্রামের তাফসীর মাহফিলসহ দেশ ও বিদেশে বহু মাহফিলে আবেগের সাথে দোআ করেছেন। তাঁর বেগম ও বৌমারা মুন্নীকে দেখার জন্য বারবার এসেছেন। এমনকি তার বড় ছেলের শাশুড়িও এসেছেন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বড় জামাতা সাইফুল্লাহ মানসূরের বড় বোন হিসেবে মুন্নী নিজামী সাহেবের (দেশী পরিভাষায়) ঝিয়ারি এবং হাফিযা আসমা তাঁর বেহাইন। আন্দোলনের সম্পর্ক ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মুন্নী তার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিল।

বেশ কয়েক মাস আগে আমার বোন ও কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সাবেক সেক্রেটারি বেগম জাহানারা আযহারী ক্যান্সারে আক্রান্ত অবস্থায় আমি এক কেন্দ্রীয় ইউনিট বৈঠকে আমার বোন ও বৌমা'র জন্য উপস্থিত জামায়াত-নেতৃবৃন্দকে নিয়ে দোআ করতে আমীরে জামায়াতকে অনুরোধ করলাম। তিনি 'আমাদের বোন ও আমাদের মেয়ে' হিসেবে উল্লেখ করে দু'জনের জন্য চোখের পানি ফেলে দোআ করলেন।

আল্লাহর রহমতে বোন মোটামুটি সুস্থ হলেও অত্যন্ত দুর্বল। জাহানারা আমীরে জামায়াতকে অনেকদিন আগেই চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে, যেন মহিলা বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব কারো উপর ন্যস্ত করা হয়।

মা মুন্নীর ইন্তিকাল

৩০ নভেম্বর (২০০৪) মা মুন্নীর ইন্তিকালের দিন ঘটনাক্রমে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারি জেনারেল সরকারি সফরে বিদেশে ছিলেন। আমীরে জামায়াতের পিএস ফোনে মরক্কোতে এ খবর জানালে তিনি ঐ দিনই নিজের হাতে লেখা সান্ত্বনাবাণী ফ্যাক্স করে আমাকে এবং মুন্নীর আম্মাকে পাঠান। ৩ ডিসেম্বর দোআর মহফিলে সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৯টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর হাসপাতাল থেকে ১১টায় লাশ বাড়িতে পৌঁছে। ডাক্তাররা সাবধান করে দিলেন, দাফন করতে যেন দেরি করা না হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত যথেষ্ট হয়েছে। বিলম্ব হলে নাক-মুখ-কান দিয়ে রক্ত বের হতে পারে। ফোনে খবর পেয়ে মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা সাঈদী সাড়ে ১১টায়ই বাড়িতে পৌঁছলেন এবং আমার সাথে কোলাকুলি করে কাঁদলেন। তারা জানাযায় শরীক হয়ে বেলা ২টায় বিদায় নিলেন।

আমীরে জামায়াত ৬ তারিখে মরক্কো থেকে ফিরে এসেই কেবিনেট মিটিং, বিকেলে প্রেস ক্লাবে কেয়ারটেকার দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথির দায়িত্ব এবং পরদিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার পর ৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পথে মামূন ও মুন্নীর সন্তানদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সাক্ষাতে সময় দিলেন।

জানাযায় জামায়াত নেতাদের মধ্যে যারা এত শর্ট নোটিশে উপস্থিত হতে পেরেছেন তারা হলেন– মাওলানা আবদুস সুবহান এমপি, পাঁচজন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সর্বজনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবূ তাহের ও ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, তিনজন নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাস্টার মুঃ শফীকুল্লাহ, জনাব বদরে আলম ও মীর কাসেম আলী, দু'জন কেন্দ্রীয় কর্ম-

পরিষদ সদস্য মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ও অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, ঢাকা মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমীর এডভোকেট জসীমউদ্দীন সরকার, নায়েবে আমীর মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাসুম, সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এবং কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি ও মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম।

মৃত্যুর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা পর জানাযা হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে জানাযায় বিরাটসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত হয়েছেন।

৩ ডিসেম্বর দোআর মাহফিলে প্রায় ৪০০ মহিলা ও সমসংখ্যক পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। মহিলাগণ বাড়ির ছাদে এবং পুরুষগণ মসজিদে সমবেত হন। দোআর মাহফিলে মরহুমার বড় ছেলে ও স্বামীর বক্তব্যের সময় উপস্থিত অনেকের চোখেই পানি দেখেছি। আর দোআর সময় তো প্রায় সবাই অশ্রুসজল হয়েছেন।

দোআর পর অশ্রুসিক্ত চেহারায় আবদুল কাদের মোল্লা বললেন,"আমার তিন বোন মারা গেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুতে এত কাঁদিনি, যত কেঁদেছি মুন্নীর মৃত্যুতে।" মোল্লা সাহেব মামূনকে ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহ করেন।

মুন্নীর একটি স্মৃতি

মা মুন্নী তো প্রাণজুড়েই আছে। সর্বত্র তার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। আমার পরম স্নেহের নাতি-নাতনিরা তো ওর স্মৃতিই বহন করছে।

তদুপরি ২০০৩ সালের এপ্রিল থেকে সর্বক্ষণই ওর একটা স্মৃতি আমার দেহে বিরাজ করছে। সেটা হলো একটা হাতঘড়ি। যে জিনিস ব্যবহার করা হয় তা যদি কেউ দিয়ে থাকে, তাহলে ব্যবহার করার সময় তার কথা মনে পড়ে। সে হিসেবে এ ঘড়িটা সর্বক্ষণ তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২০০৩ সালে জেদ্দায় যখন মাওলানা মওদূদী কৃত কুরআনের উর্দু অনুবাদের বাংলা তরজমার কাজ সমাধা করলাম, তখন মা মুন্নী আমাকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। আমি বললাম, আমার তো কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই, কী পুরস্কার দেবে? শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর সুপারিশে হাতঘড়ি নিতে রাজি হলাম। আমি ঘড়িতে সাতটি বৈশিষ্ট্য থাকার শর্ত আরোপ করলাম। ঢাকা ফিরে আসার আগে শেষ ওমরাহ উপলক্ষে সবাই মক্কা শরীফ গেলাম। কাবা শরীফ সংলগ্ন একটা দোকানে ঐ সাতটির মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ঘড়ি পাওয়া গেল। ঐ ঘড়িটি আমার ২৪ ঘণ্টার সাথী ও মা মুন্নীর স্মৃতি।

মা মুন্নীর অপূর্ণ সাধ

মা মুন্নী ৪৫ বছর বয়সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল—যখন ওর বড় সন্তানের বয়স ২৪ বছর ও ছোট সন্তানের বয়স সাড়ে দশ বছর। পাঁচটি সন্তানকে গড়ে তোলার জন্যই তার সবটুকু বয়স ব্যয় হয়ে গেল। আল্লাহর রহমতে সে সন্তানদেরকে আদর্শিক দিক দিয়ে যেমন দেখতে চেয়েছে ওরা তার সে আশা অনুযায়ীই গড়ে উঠেছে। ওদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত না হলেও সঠিক ও সন্তোষজনকভাবে উচ্চশিক্ষায় অগ্রসরমান দেখে সে নিশ্চয়ই পরম তৃপ্তিবোধ করেছে।

সন্তানদেরকে সব দিক দিয়ে গড়ার জন্য যে সাধনা ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাতে পিতামাতার বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং যথেষ্ট মানসিক পেরেশানি ভোগ করতে হয়। এরপর যখন সন্তানদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখার সুযোগ হয় এবং তাদেরকে বিয়ে-শাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তখন পিতামাতার জন্য বিরাট আনন্দের উপকরণ হয়। এ আনন্দ উপভোগ করার নিকটবর্তী সময়ে মা মুন্নীকে চলে যেতে হলো। সন্তানদেরকে মানুষ করার কষ্ট সবটুকুই সে ভোগ করে গেল, আর ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

সে অসুস্থ অবস্থায়ই বড় ছেলে নাবীলকে বিয়ে করাতে চেয়েছিল। মেয়ে দেখাও চলছিল। সে সাধ অপূর্ণই রইল। আগামী আগস্ট মাসে (২০০৫) ওর বিয়ের সময়ও ঠিক করা হয়েছিল। সেদিন নাবীল ফোন করে ওর দাদুকে বলল, "আম্মার ইচ্ছার কারণেই এত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা হয়েছিল। আম্মা চলে যাওয়ায় আমি বিয়ে আরও বিলম্বিত করতে চাই। আমার মাস্টার্স ডিগ্রিটা হয়ে যাক। আমার বয়স এখন মাত্র ২৪ বছর।" ওর এ কথার সাথে আমরাও একমত হলাম।

১৯৪.

আইডিএল গঠন

পিপিআর-এর বিধি মোতাবেক পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হতে থাকল। মুসলিম লীগের নেতারা তাদের দলীয় নাম পরিত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ একজোট হয়ে জনাব আবদুস সবুর খানকে সভাপতি ও শাহ আজিজুর রহমানকে সেক্রেটারি জেনারেল বানিয়ে তাদের দলকে পুনরুজ্জীবিত করে।

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলোর নেতারা '৭২ ও '৭৩ সালে কারাগারে আটক থাকাকালে নাকি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন, জেলখানা থেকে বের হয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দল গঠন করে ইসলামী তৎপরতা চালাবেন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের দলীয় নাম ত্যাগ না করায় ঐ ওয়াদা পূরণ হতে পারেনি।

জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, যার সভাপতি ছিলেন জনাব নূরুল আমীন), এডভোকেট ফরমানুল্লাহ খানের ইসলামিক পার্টি, গফরগাঁয়ের মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগীর ইমারত পার্টি ও বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি– এ সাতটি দল মিলে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) নামে একটি দল গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে সাংগঠনিক রূপ লাভ করে।

এ সাতটি দলের মধ্যে সাংগঠনিক দিক দিয়ে ও জনশক্তির বিবেচনায় জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান এক নম্বরে। এরপর নেযামে ইসলাম পার্টির পজিশন। দলটি গঠন করার সময়ই পদ বণ্টনের ব্যাপারে ছোট দলগুলোর নেতারা একজোট হয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার কারণে জামায়াতের সবাই স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়।

আইডিএল-এর চেয়ারম্যান করা হয় নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা সিদ্দীক আহমদকে। সিনিয়র নেতা হিসেবে এতে জামায়াতের কোন আপত্তি ছিল না। জামায়াত

চেয়ারম্যান পদ দাবি করেনি। সেক্রেটারি জেনারেলের পদ জামায়াতের কোনো নেতাকে দেওয়া হবে বলে ধারণা ছিল। কিন্তু এ পদটি পিডিপির এডভোকেট শফিকুর রহমানকে দেওয়া হয়। দলকে কর্মতৎপর করার প্রধান দায়িত্ব এ পদাধিকারী ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত থাকে। জামায়াতকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাওলানা আবদুর রহীমকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, মাওলানা আবদুস সুবহান ও এডভোকেট সা'দ আহমদকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়।

এভাবে দল গঠনের শুরুতেই ঐক্যের বদলে বিভেদ জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা হলো। সবাই যদি আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতেন, তাহলে প্রধান দুটো পদের একটা জামায়াত নেতাদের মধ্যে কারো উপর অর্পিত হতো। সংগঠন গড়ে তোলা, কর্মীদের সংগঠিত করা, সর্বত্র দলের শাখা কায়েম করার জন্য যে ধরনের তৎপরতা প্রয়োজন তার অভাবে কিছু দিনের মধ্যেই সারা দেশে জামায়াতের সক্রিয় জনশক্তি অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল।

দলের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেল সারা দেশ সফর করে দলের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতার উদ্যোগ গ্রহণ করা ময়দানের স্বাভাবিক দাবি ছিল। '৭৫-এর পট পরিবর্তন, বিশেষ করে ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার সংহতি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতে আইডিএল দ্রুত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতো, যদি প্রধান দু'পদের অধিকারীদ্বয় যথাযথভাবে তৎপর হতেন।

দলের সম্প্রসারণের বদলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, কুৎসা রটনা ও দোষারোপ চলতে লাগল। এর ফলে দলটি ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হতে থাকল। এ পরিস্থিতিতে দল গঠনের ঠিক এক বছর পরই ১৯৭৭-এর ২৩ আগস্ট জামায়াত নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে দলের কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান করার রিক্যুইজিশন দেওয়া হলো।

দলের চেয়ারম্যান এতে সম্মত না হওয়া সত্ত্বেও রিক্যুইজিশন মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। কাউন্সিলের ঐ মিটিংয়ে মাওলানা আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান ও মাওলানা আবদুস সুবহানকে সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। অর্থাৎ ৭ দলীয় সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গেল। দলের সাবেক কর্মকর্তাগণ কিছু দিন বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ ও আপত্তি করতে থাকার পর মাওলানা সিদ্দীক আহমদ নেযামে ইসলাম পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

আইডিএল দলটি জামায়াতের দখলে চলে আসে এবং সারা দেশে জামায়াতের জনশক্তি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সংগঠন সম্প্রসারণে তৎপর হয়।

কুয়েত থেকে সপরিবারে হজ্জ যাত্রা

'৭৬ সালে লন্ডন থেকে হজ্জে যাওয়ার সময় যেমন ভিজিট ভিসায় রিয়াদ যাওয়ার সুযোগ হয়, ঠিক তেমনি '৭৭ সালে হজ্জে যাওয়ার সময়ও WAMY (World Assembly of Muslim Youth) থেকে ভিজিট ভিসা নিয়ে রিয়াদ যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। WAMY অফিস থেকে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর আহমদ তুতুনজি কুয়েতের ঠিকানায় ভিসা পাঠান।

হজ্জ ভিসায় গেলে মক্কা, মদীনা ও জেদ্দা ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই। তাছাড়া বড় সমস্যা হলো হজ্জ ভিসায় যারা যায় তাদের বিমানবন্দরেই কোনো একজন মুআল্লিমের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হয়। মুআল্লিম বিমানবন্দরেই পাসপোর্ট নিয়ে নেয়।

হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান মুআল্লিমের পূর্ণ তদারকিতেই আদায় করতে হয়। মিনা ও আরাফাতে যাতায়াত এবং মদীনায় যাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা সবই মুআল্লিম করে। বিমানবন্দর থেকে হাজীদের দায়িত্ব নিয়ে মুআল্লিমই দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বিমানবন্দরে বিদায় জানায়।

ভিজিট ভিসায় যাওয়ার সুযোগ পেলে শুধু হজ্জের কয়েকদিন মিনা ও আরাফাতে মুআল্লিমের মাধ্যমে যেতে হয়। এর আগে ও পরে স্বাধীনভাবে সর্বত্র চলাফেরা করা যায়। তাই হজ্জে গেলেও আমি ভিজিট ভিসা যোগাড় করে নিতাম। সাধারণত হজ্জের মৌসুমে ভিজিট ভিসা দেওয়া হয় না। বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভিসার আবেদন করলে তা মঞ্জুর হয়।

কুয়েত থেকে WAMY'র ভিজিট ভিসা নিয়ে আমি আমার স্ত্রী ও ছোট ছেলে সালমানকে নিয়ে রওয়ানা হলাম। আমরা রিয়াদ যাচ্ছিলাম। আমাদের সৌদি বিমান দাম্মাম বিমানবন্দরে থেমে রিয়াদ যাওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী দাম্মামেই ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। বিস্ময়ের বিষয় যে, ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের পাসপোর্টে ভিজিট ভিসা থাকা সত্ত্বেও জোর করেই হজ্জ ভিসা লাগিয়ে দিল। এমনকি আমাদের তিন জনের হজ্জ ফিও আদায় করতে বাধ্য করল। আমার কোনো কথাই শুনল না। সৌদি অফিসারদের স্বভাব হলো, তারা যদি কোনো বিষয়ে রায় ঘোষণা করে ফেলেন তাহলে শত যুক্তি দেখালেও রায় পরিবর্তন করেন না।

রিয়াদ পৌঁছলাম

দাম্মাম বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ হওয়ায় রিয়াদ বিমানবন্দরে নেমেই অল্প সময়ের মধ্যে বের হয়ে গেলাম। গত বছর (১৯৭৬) আমার স্ত্রীর যে আত্মীয়ের ঠিকানা জানা ছিল না, এবার তাকে আগেই খবর দেওয়ায় সে বিমানবন্দর থেকেই আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে গেল। রিয়াদে সপ্তাহখানেক ছিলাম ঐ বাসায়ই; আর কোথাও থাকতে হয়নি। ২৭ অক্টোবর (১৯৭৭) রিয়াদে পৌঁছে ঐ দিনই ওয়ামী অফিসে গিয়ে দাম্মাম বিমানবন্দরে যা ঘটল তা জানালাম।

ওয়ামী'র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর আহমদ তুতুনজি রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আমরা ভিজিট ভিসা পাঠালাম, এ সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে হজ্জ ভিসা লাগিয়ে দিল কীভাবে? তিনি এটা ওয়ামীর জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করলেন। হোম অফিস ভিসা মঞ্জুর করা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অফিসারের তা অগ্রাহ্য করার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তিনি পরবর্তী বিমানেই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আমাদের তিনজনের পাসপোর্টসহ ওখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট এক কড়া চিঠি লিখে পাঠালেন। ঐ লোক পরদিন ফিরে এলে দেখা গেল, পাসপোর্টে লেখা হজ্জ ভিসা বাতিল করা হয়েছে এবং তিনজনের হজ্জ ফি হিসেবে যত টাকা আমি দিয়েছিলাম সে টাকা তিনি সম্পূর্ণ ফেরত নিয়ে এসেছেন। তুতুনজি সাহেব খুব খুশি হলেন এবং আমি তার দাপট দেখে মুগ্ধ ও পুলকিত হলাম।

১৯৭২ ও '৭৩ সালে সৌদি আরবে আমার পরিচিত বাংলাদেশী কেউ ছিল না। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষকদের মধ্যে যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম। এক পাকিস্তানি ডাক্তার বাদশাহ খালেদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি জামায়াতের লোক ছিলেন। তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বাসায় নিয়ে খাওয়ালেন, আমার স্ত্রীকে শাড়িও উপহার দিলেন।

রিয়াদে এক সপ্তাহ

আমার স্ত্রীর ভাগ্নে ইঞ্জিনিয়ার নূরুল উলা ভানুর বাসায় উঠলাম। ভানুর নানী আমার স্ত্রীর আপন ফুফু, যিনি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও জমিয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি মরহুম প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারীর মাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একই সময়ের ছাত্র। তিনি আমার দু'বছরের জুনিয়র ছিলেন। ছাত্রজীবনে দেখা হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা জন্মেনি।

রিয়াদে ভানুর বাসায় আমরা বেশ ক'দিন ছিলাম। ভানুর পিতা ও চাচা ডক্টর আবদুল বারীর দু'বোনকে বিয়ে করেন। এ দু'ভাইয়ের সন্তানরাও পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভানু তার চাচাতো বোন মুকুলকে বিয়ে করে। মুকুল খালাতো বোনও বটে।

সালমানের বয়স তখন মাত্র ১১ বছর। সে ভানু ও মুকুলের সাথে এমন চমৎকার কৌতুকপূর্ণ কথা বলল, আমরা বিস্মিত হলাম এবং কৌতুকটি উপভোগও করলাম। সে বলল, ভানু ভাই ও মুকুল আপা! এটা আপনারা কী করলেন? ভানু ভাই যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতেন তাহলে আমি তাকে ভাবি ডাকতে পারতাম এবং মুকুল আপার অন্যত্র বিয়ে হলে আমার আর একজন দুলাভাই হতো। মাত্র ১১ বছর বয়সের বালকের এমন চমৎকার কৌতুকে ভানু ও মুকুল অত্যন্ত পুলকিত হলো।

রিয়াদে থাকাকালে ওয়ামী অফিসের সম্মেলনকক্ষে দুটো প্রোগ্রামে শরীক হই। একটি ছিল ওয়ামীর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সাথে পরিচিতির উদ্দেশ্যে, অপরটি বিদেশ থেকে আগত ওয়ামীর প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এতে ওয়ামীর কার্যাবলির রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা হয়। ঐ সম্মেলনে আমাকেও বক্তব্য রাখার অনুরোধ করা হলে আমি ওয়ামীর কর্মতৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করে কিছু সম্প্রসারণের পরামর্শ দিই।

মক্কা শরীফে জামায়াত ও শিবিরের প্রতিনিধি

এক সপ্তাহ রিয়াদে অবস্থানের পর আমরা তিন জন মক্কায় চলে গেলাম। কয়েকদিন পরে ঢাকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও আইডিএল-এর চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য সাখাওয়াত হোসাইন বকুল মক্কা শরীফ পৌঁছলেন। মাওলানা থেকে আইডিএল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেল। তিনি আফসোস করে বললেন, আইডিএল-এ শামিল সবগুলো দল মিলেও জামায়াতের সমান হওয়া তো দূরের কথা, কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারীও নয়। অথচ তারা জামায়াতকে কোনো মর্যাদাই দিতে চান না। তাই বাধ্য হয়ে জামায়াত আইডিএলকে দখল করে তৎপরতা শুরু করল। তারা নিজেরাও কাজ করেন না, আমাদেরও কাজ করার সুযোগ দেন না।

জামায়াতের আমীর ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিনিধিদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক হয়। জামায়াতের নামে না হলেও সাংগঠনিকভাবে কর্তৎপরতা চালানোর সুযোগ পাওয়া গেল বলে আমরা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। জামায়াতের নামে যখনই কাজ করার সুযোগ আসে তখন অতি সহজেই এ তৎপরতা জামায়াতের খাতে শামিল হবে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর ফলে জামায়াতে ইসলামীর নামে সংগঠন করার আইনগত বাধা দূর হলেও পিপিআর (পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন) অনুযায়ী সরকারের অনুমতি না নিয়ে আইনত সংগঠন শুরু করা যাবে না বলে এ বিষয়ে মাওলানা আবদুর রহীমের সাথে আলোচনা হলো। আমি সরকারের নিকট অনুমতি চাওয়া মোটেই সমীচীন মনে করিনি বলে জানালাম। ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠন কায়েমের জন্য বাতিল শক্তির অনুমতি নিলে সরকার সবসময়ই দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বা জবাবদিহির সুযোগ নিতে পারে। মাওলানা এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেননি।

'৭৭ সালের হজ্জ

১৯৭৭ সালে আমার ছোট ভাই ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম ও তার স্ত্রী হাসিনা বেগম হজ্জ করতে যায়। তাদের সাথে দীর্ঘ পাঁচ পছর পর দেখা হল। আমার ভাই প্রথমে তার ছাত্র ডা. আবদুস সালামের বাসায় উঠায় আমিও সেখানে গেলাম। '৭১ সালে ডা. আবদুস সালাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। তাই দেশের ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে তাকে সিলেট মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ডাক্তারি ডিগ্রি নিতে হয়। ঐ সময় ডা. গোলাম মুয়ায্যাম সিলেট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিল। সে হিসেবে ডা. আবদুস সালাম তার ছাত্র হওয়ায় এ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তার আবদুস সালাম তখনও বিয়ে করেননি। তার জেদ্দাস্থ বাসায় দু'দিন বেড়ালাম।

মক্কায় কাবা শরীফের কাছেই থাকার জায়গা পেয়ে গেলাম। আমরা তিনজন, আমার ভাই সস্ত্রীক, মাওলানা আবদুর রহীম, ছাত্র নেতা বকুল একই বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। পাকিস্তানি এক দীনী ভাইয়ের সহযোগিতায় ঐ জায়গাটি পেলাম। তিনি সৌদি আরবের একটি স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক। তার সাথে আরও কয়েকজন পাকিস্তানি ছিলেন। তাদের সাথে আমার ও মাওলানা আবদুর রহীমের আলাপ-আলোচনা উর্দু ভাষায়ই হতো। আমার ভাই ও সালমান তাদের সাথে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলত। ঐ পাকিস্তানি শিক্ষকের নিকট সালমান এত প্রিয় হয়ে গেল যে, তিনি অবসর পেলেই সালমানকে ডেকে আদর করে পাশে বসিয়ে আলাপ করতেন। তিনি আমাকে বললেন, আমরা সন্তানদের যথেষ্ট সঙ্গ দিই না বলে তাদের যথাযথ তরবিয়্যাত (প্রশিক্ষণ) হয় না। আপনার সাথে থাকার সুযোগ পাওয়ায় সালমান এমন তরবিয়্যাত পেয়েছে, তার আদব-কায়দা, কথা বলার ঢং ও মুসলিম চেতনা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

আমরা যারা মক্কা শরীফে একসাথে ছিলাম তারা আরাফাতে একই তাঁবুতে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিলাম। হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো আরাফাতের ময়দানে

অবস্থান। রাসূল (স) বলেছেন, "হজ্জ হচ্ছে (নির্দিষ্ট সময়ে) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছে, সে হজ্জ পেয়েছে।" [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

নিয়ম অনুযায়ী আরাফাতের ময়দানে যোহরের নামাযের সাথে সাথেই আসরের নামায আদায় করতে হয়; যাতে মাগরিব পর্যন্ত সবটুকু সময় আল্লাহর নিকট দোআ ও ইস্তিগফারে কাটানো যায়। নামাযের পর খেয়ে ঘণ্টাখানেক শুয়ে বিশ্রাম নিলাম; যাতে ৩টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টা একটানা আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে পড়ে থাকা যায়।

আমরা পৃথক পৃথকভাবেই দোআতে মশগুল রইলাম। আল্লাহর দরবারে চাওয়ার তো শেষ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ যেন পাই এবং সকল অকল্যাণ থেকে যেন আশ্রয় পাই, সে প্রার্থনা করলাম। মাবূদের দরবারে প্রাণভরে চাইতে থাকাও বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। সবচেয়ে বড় চাওয়া হল গুনাহ মাফের আবেদন।

ব্যক্তিগত খাস দোআ সবারই থাকে। আমারও ছিল। আমি জানতে পারলাম, আমার ঘনিষ্ঠতম দীনী ভাই জনাব আবদুল খালেকের ডায়াবেটিস হয়েছে বলে খাওয়া-দাওয়া অনেক বেছে খেতে হয়। আমি ময়দানে দোআ করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে এমন অসুখ দিও না, যার কারণে তোমার অনেক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। দেশে ফিরে আসার বছরখানেক পর আমার নিম্নচাপ দেখা দিল। আমার ভাই ডাক্তার মুয়ায্যাম আমাকে তার সহপাঠী ডাক্তার নূরুল ইসলামের (জাতীয় অধ্যাপক) নিকট নিয়ে গেল। তিনি বললেন, এটা কোনো রোগই নয়। পুষ্টিকর জিনিস বেশি করে খান। আমি বললাম, আরাফাতের ময়দানে আমি যে দোআ করলাম তা আল্লাহ তাআলা এভাবেই কবুল করলেন মনে হয়। আমি দোআ করলাম, যেন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হই। এখন এ অসুখ দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, যত খেতে ইচ্ছে হয় খেতে থাক।

সালমানেরও একটা ব্যক্তিগত খাস দোআ ছিল। ফল-মূল ও তরিতরকারি সে খেত না। চেষ্টা করেও খাওয়ানো যায়নি। লন্ডনে ডাক্তারকে এ বিষয়ে জানালে ডাক্তার বললেন, পছন্দ করে যা খায় তাতেই চলবে। আমরা তাকে তাগিদ দিতাম যে, এসব না খেলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না। বেচারা খেতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাই সে এ বিষয়ে আরাফাতের ময়দানে বিশেষ দোআ করল।

ওর বিশেষ দোআর বিষয়টা আমার মনে ছিল না বলে আমিই তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। সে বলল, আলিগড়ে থাকার সময় তরি-তরকারি খেতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু ফল খাওয়ার ব্যাপারে আমার দোআ এখনও কবুল হয়নি। ওর ছোট মেয়ে সাফাত (তিন বছর বয়স) কোনো ফল খায় না। বিস্ময়ের বিষয় যে, সালমানের মামাতো বোন বিলকিসের অসুখ হলে সালমান তার জন্য রক্ত দিল। এরপর থেকে বিলকিস আর ফল খেতে পারে না। অথচ এর আগে সে ফল খেত। সালমানের রক্ত গ্রহণ করা নিরাপদ নয় বলেই বোঝা গেল। ফল না খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

১৯৫.

কুয়েতে মাওলানা আযহারী

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (তখন রমযান মাস) মাওলানা আযহারী বিনা খবরে কুয়েত পৌঁছে গেলেন। বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম। গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। দৌড়ে এসে একজন জানাল, আমার জরুরি ফোন এসেছে। ফোন ধরে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারীর কণ্ঠ। তিনি আমার একান্ত স্নেহের বোন জাহানারার স্বামী। আমার ভগ্নিপতি হিসেবে তো একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছেই, এর চেয়েও বেশি সম্পর্ক হল দীনের একজন সাহসী মুজাহিদ হিসেবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হওয়ার পর যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন তারা ইসলামকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি মনে করে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত উৎখাত করতে লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াতকেও বাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করল। আলেম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। ইসলামের জন্য কোন কর্মতৎপরতা শুরু করার সাহস তখন কারোই ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরব বিশ্বের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে রেডিও বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য মাওলানা আযহারীকে দায়িত্ব দেয়। আধুনিক আরবী ভাষায় তার মতো আর কোন দক্ষ ও যোগ্য লোক ছিল না। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি সরকারের সুদৃষ্টি লাভ করেন।

আমি ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে লন্ডন পৌঁছার পর মাওলানা আযহারীর সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়। আমি তাকে একজন অত্যন্ত সাহসী মানুষ হিসেবে জানতাম বলে তাকে পরামর্শ দিলাম যে, 'মসজিদ মিশন' নামে একটা সংগঠনের মাধ্যমে দাওয়াতে দীনের কাজের সুযোগ নেওয়া যায় কি-না দেখুন।

রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে সরকারের সাথে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা যোগ্যতার সাথে কাজে লাগিয়ে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের আস্থা অর্জন করেন এবং তাকে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের পজিশন দিয়ে 'বাংলাদেশ মসজিদ মিশন' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। তিনি আমৃত্যু এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটিই এ দেশে মসজিদভিত্তিক একটি সক্রিয় সংগঠন। বর্তমানে সারা দেশে এর শাখা চালু রয়েছে।

মাওলানা আযহারীর সাথে সম্পর্কের সূচনা

তিনি ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় আরবী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পূর্বে যখন বাংলা একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন, তখনই আমার বোন জাহানারার সাথে ১৯৫৯ সালে তার বিয়ে হয়। আব্বা মগবাজারস্থ তার আবাসিক জমি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে জাহানারার প্রাপ্ত জমিতে তিনি একতলা ভবন নির্মাণ করে বসবাস করায় তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। আমরা চার ভাই ছিলাম। তিনি পঞ্চম ভাইয়ের মর্যাদায় গণ্য হলেন। জাহানারা সব ভাইয়ের ছোট বলে

সবারই আদরের বোন ছিল।

আমার বিয়ের সময় জাহানারা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার স্ত্রীর অতি স্নেহের ননদ হিসেবে জাহানারার বিশেষ পজিশন ছিল। তাই আযহারী সাহেব কুয়েতে কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী তাকে তার রান্না করা খাবার খেতে আমাদের আবাসস্থলে আসতে বাধ্য করলেন। তিনি সরকারি সফরে। বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তিনি কুয়েত হয়ে দেশে আসেন। আমি তার ফোন পেয়ে তার সাথে হোটেলে গিয়ে দেখা করলাম। তিনি আমাদের বাসায় এলে পর্দার আড়াল থেকেই আমার স্ত্রী তার প্রিয় ননদের খোঁজ-খবর জেনে নিলেন।

প্রায় ছয় বছর পর কুয়েতে তার সাথে দেখা হওয়ায় আমি আনন্দে উদ্বেলিত হলাম। বিনা খবরে অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে পেয়ে যতক্ষণ একসাথে ছিলাম, আমাদের কথা যেন ফুরাচ্ছিল না।

এক বহুমুখী প্রতিভা

মিসরের বিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর সেখানেই তিনি দু'বছর শিক্ষকতা করেছেন। আরবী ভাষা তার মাতৃভাষার মতোই আয়ত্তে আসে। তিনি আরবী বলা ও লেখায় সমান পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজিতেও বই লিখেছেন। বইটির নাম 'The Theory And Sources of Islamic Law for Non-muslims'. বাংলা ভাষায় 'কুরআনে বিজ্ঞান', 'নীতি ও দুর্নীতি', 'সহজ আরবী ভাষা শিক্ষা', উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর জন্য 'ইসলামী শিক্ষা', মাধ্যমিক স্কুলের জন্য আরবী সাহিত্য 'আল আদাবুল আসরী', আরবী রচনাগ্রন্থ 'আল ইনশাউল আসরী', তাফসীরে আযহারী (ভূমিকা ও সূরা ফাতিহা) সাত খণ্ডে প্রণীতব্য, ইসলামের ইতিহাসের আংশিক প্রণয়ন তার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বাংলা একাডেমীতে কর্মরত থাকাকালে আরবী থেকে বাংলা বিশাল অভিধান রচনা করেছেন। বাংলা একাডেমী পৌনে তিন হাজার পৃষ্ঠার অভিধানটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে। তিনি বাংলা থেকে আরবী ও উর্দু থেকে বাংলা অভিধানও আংশিক রচনা করেছেন। বেঁচে থাকলে সবই হয়তো সম্পন্ন হতো।

অধ্যাপনা ও জনসভায় সময় ব্যয় করার পরও এ জাতীয় গবেষণামূলক কাজ কেমন করে সমাধা করতেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি খাওয়া, বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের কোন পরওয়া করতেন না। তার স্ত্রী এ নিয়ে অভিযোগ করলে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। অসুখ হলে ডাক্তার দেখানোর অবসর পেতেন না। ডাক্তার দেখালেও ঔষধ-পথ্যের তেমন ধার ধারতেন না।

তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে কুয়েতে তার স্ত্রীর ২৮.০২.'৭৮-এ লেখা চিঠিতে এ অভিযোগ পেয়ে তাকে এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে লিখলাম। এর আগে তার ১১.০২.'৭৮-এ লেখা চিঠি কুয়েতে ২৭.০২-এ পেলাম। এটাই তার শেষ চিঠি। ২৭.০৩.'৭৮-এ তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি...)। ফোনে ঐ দিনই খবর পেয়ে ৩০.০৩-এ তার সম্পর্কে দু'পৃষ্ঠায় যা লিখে ঢাকায় পাঠালাম তা নিম্নরূপ ঃ

মাওলানা আযহারীর ইন্তিকাল

কুয়েত ২১.০৪.১৩৯৮ হি.
৩০.০৩.১৯৭৮ খ্রি.

২৭.০৩.'৭৮ তারিখ সকাল সাড়ে ৮টায় (ঢাকার সময় ১১-৩০) আমীনুর রহমান ও মাস্টার শফীকুল্লাহ ঢাকার সিদ্দিক বাজার থেকে আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এমন এক মর্মন্তুদ খবর তারা দিলেন, আমি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। সেদিন সকালেই আমাদের অতি প্রিয় আযহারী সাহেব হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

১৬.০৩.'৭৮ থেকে ক্রমাগত তিন দিন ফোনে মাওলানা আযহারীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে লাইন পেতে ব্যর্থ হই। মক্কা শরীফে রাবেতায় এক সম্মেলনে তার যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারছেন কি-না তা জানার জন্য এবং কুয়েতের আওকাফ উজির সরকারি সফরে ২১.০৩-এ ঢাকা যাচ্ছেন বলে খবর দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ফোনে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ২৮.০৩.'৭৮-এ এক চিঠিতে জানতে পারলাম, ১৬.০৩-এই আযহারী সাহেবের আলসার অপারেশন হয় এবং ক্যান্সার বলে প্রমাণিত হয়।

হায়াত ও মওতের মালিক আল্লাহ্ তাআলা এবং তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাই তাঁর ইন্তিকালকে 'অকাল মৃত্যু' বলতে পারি না। তবে নিতান্ত অল্প বয়সেই যে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এ কথা সত্য। সার্টিফিকেটে তার জন্ম ১৯৩৫ বলে লিখিত। আসল বয়স চার-পাঁচ বছর বেশি ধরা হলেও তার বয়স মাত্র ৪৭ বা ৪৮ বছর হয়েছিল।

তার মৃত্যু সংবাদে মনে এমন তীব্র বেদনাবোধ করলাম, পাশেই কান্নারত বিবিকে না দেখলে কেঁদে মনটা হালকা করতে পারতাম কি-না জানি না। মনে হলো যেন একান্ত আপন ভাইকে হারালাম। পারিবারিক দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে, গৌরবময় এক ভাই থেকে চিরবঞ্চিত হলাম। দেশের দীনী খিদমতে তার যে স্থান ছিল তাতে মনে হয়, একজন বড় সহকর্মী হারালাম। আর দেশ হারাল এমন এক বিরাট প্রতিভা, যার সমকক্ষ আপাতত দেশে যে নেই এ কথা সর্বজন স্বীকৃত।

তার অবর্তমানে তার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কেউ না কেউ সেসব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তার সমান যোগ্য লোকের অভাব হলেও কাজ বন্ধ হবে না হয়তো। কিন্তু যখন এ কথা মনে করি, আমি এমন একটি ভাই আর পাব না; আমার অতি আদরের বোন জাহানারা তো আর এমন প্রতিভাধর স্বামী পাবে না, তখন মনকে কিছুতেই যেন সান্ত্বনা দিতে পারি না।

তার তিরোধানে ছাত্রসমাজ একজন যোগ্য শিক্ষক হারাল, তার সহকর্মীরা একজন মহান সাথী থেকে বঞ্চিত হলেন। দেশে ইসলামী জনতা তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ আর শুনতে পাবে না। মসজিদ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবে যে জনপ্রিয়তা তার ছিল তা মিশনের কর্মীরাই সঠিক অনুভব করতে পারেন।

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা যে, তিনি তার কর্মবহুল জীবনে সবার জন্য যে সক্রিয়তা, নিষ্ঠা

ও দায়িত্ববোধের আদর্শ রেখে গেছেন তা চিরদিন অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং তার স্মৃতিকে অমর করে রাখবে। তিনি পরম সুনামের সাথে তার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে সবারই প্রশংসা কুড়িয়ে গেছেন। তার লিখিত বই তাকে হামেশা জীবিত রাখবে। তারই অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় আমাদের আদরের বোনটি বিয়ের পরও শিক্ষা চালু রেখে বাংলায় এমএ পাস করে সে শিক্ষাকে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং মাসিক 'মুসলিম মহিলা' সম্পাদনা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কর্মই তার নেশা ছিল এবং তার সাথে যারাই কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তারাই কাজের প্রেরণা লাভ করেছেন। তিনি বিরামহীন কর্মের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

আব্বার ইন্তিকালের পর ঢাকার মগবাজারস্থ কাজী অফিস লেন নামক ছোট্ট মহল্লাটির তিনিই মুরব্বী ছিলেন। মহল্লার মসজিদটিতে জুমুআ ও ঈদে তার বক্তৃতা ও ওয়াজে কত লোক যে উপকৃত হতো! মহল্লার যুবকরাও তার কাছ থেকে দীনের প্রেরণা পেত।

আব্বার মৃত্যুর সময় আমি বিদেশে এবং আমার ছোট ভাই ডাক্তার গোলাম মোয়াযযামও সিলেটে থাকায় আযহারী সাহেবই আমাদের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আমরা চার ভাইয়ের কেউই আব্বার শেষ জীবনে কাছে থাকতে পারিনি। ছোট দু'ভাইও কাছে ছিল না। একজন বিলাতে এবং অন্যজন ঘোড়াশালে ছিল। আযহারীই যেন আব্বার একমাত্র ছেলে ছিলেন এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি আমাদের পরিবারের এমন অংশ ছিলেন, যার অভাব আমি চিরদিন অনুভব করব। বহু ব্যাপারে তিনি আমার পক্ষ থেকে কাজ করতেন। আজ যেন আমি সাথীহারা হলাম। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোআ করে এবং কেঁদে সান্ত্বনাবোধ করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাআলা তার সব নেক আমল কবুল করুন এবং তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন!

আযহারীর 'প্রিয় দাদা'

আযহারীর প্রিয় দাদা

আমাকে তিনি দাদা ডাকতেন। কারণ তার স্ত্রী জাহানারা আমাকে দাদা ডাকে। বড় ভাইকে দাদা ডাকা আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু আমাকে অন্য কারণে দাদা ডাকা হয়।

জাহানারার জন্মের পূর্বেই আমাদের দাদা ইন্তিকাল করেন। আমি দাদার বড় নাতি হিসেবে তার সাথে এত বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, আব্বার সাথে প্রায়ই দাদাকে নিয়ে আলোচনা করতাম। জাহানারার বয়স যখন চার-পাঁচ বছর তখন এ ধরনের আলোচনা শুনে সে আব্বাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা কে? জাহানারা সব সময় আব্বার সাথে থাকার চেষ্টা করত। আব্বা আমাকে দেখিয়ে বললেন, এই তো তোমার দাদা। তখন থেকে জাহানারা তো দাদা ডাকা শুরু করলই; এরপর আমার কনিষ্ঠতম বোন জান্নাতের জন্ম হলে, আমি তারও দাদা হয়ে গেলাম। এমনকি জাহানারার বয়সের ও এর পরের আমার সকল চাচাতো ভাই-বোনও আমাকে দাদাই ডাকে।

খতীব মাওলানা আযহারী

১৯৬৪ সালে মগবাজারে বাড়ি নির্মাণের পর থেকে তিনি এ মহল্লার মসজিদে জুমুআয় খুতবা দিতেন এবং নামায পড়াতেন। তিনি লিখিত খুতবা পড়তেন না। বক্তৃতার আকারে পেশ করতেন। ১৯৭১ সালের ১ রমযান থেকে এ মহল্লার বর্তমান মসজিদটিতে নামায শুরু হয়। আব্বা নিজের সঞ্চিত টাকা থেকে একাই মসজিদটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তার নির্মিত একতলা মসজিদটি এখন তিনতলায় উন্নীত হয়েছে। মাওলানা আযহারী শুরু থেকেই এ মসজিদের খতীব। এ মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বে আমরা রমনা থানা সংলগ্ন মসজিদে নামায পড়তাম। সেখানেও তিনি খতীবের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি চমৎকার কিরাআত পড়তেন বলে তার ইমামতিতে নামাযে বেশ তৃপ্তিবোধ হতো।

প্রতিভার মূল্যায়ন

মাওলানা আযহারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাকে বিরাট ও বিরল প্রতিভার অধিকারী হিসেবে উপলব্ধি করে আমি গৌরব বোধ করেছি। তার প্রতিভার বিকাশ যখন হলো তখন দেশে এমন এক ইসলাম-বৈরী সরকার কায়েম হয়, যারা স্বাভাবিক কারণেই তার মতো ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে অক্ষম ছিল। অবশ্য অপরিহার্য কূটনৈতিক কারণে রেডিও বাংলাদেশে আরবী বিভাগ প্রবর্তন করতে তার মুখাপেক্ষী হতে সরকার বাধ্য হয়। তার তৈরি লোকরাই এখনও রেডিও'র আরবী বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে যারা এ দায়িত্বে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মাওলানা আযহারীর প্রিয় ছাত্র ও জামাতা মাওলানা মুফাযযাল হোসাইন খান। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম ডাইরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নর-এর সদস্য। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তাকে দেখা যায়।

বাংলাদেশের কোন সরকার আরবী ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি। যদি করত তাহলে শিক্ষাঙ্গনে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত মাওলানা আযহারীর রচিত বিশাল আরবী-বাংলা অভিধানটি বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। বাজারে এক খণ্ডে কয়েকটি ক্ষুদ্র অভিধান রয়েছে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এত বড় মূল্যবান অভিধান বাজারে নেই।

আমার আফসোস লাগে যে, আমি বিদেশে থাকতে বাধ্য হওয়ায় তার কোন কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ পেলাম না। তার সাত খণ্ডে রচিত ইসলামের ইতিহাসের যেটুকু তিনি রচনা করে যেতে পেরেছিলেন তা উইপোকার শিকারে পরিণত হয়ে গেল। তার রচিত বাংলা-আরবী ও উর্দু-বাংলা অভিধানের কাজও তিনি সমাধা করার সময় পেলেন না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ মাওলানা আযহারীর অবদান সম্পর্কে কৃতী ছাত্র মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান এমএ-কে পিএইচডি ডিগ্রি হাসিলের সুযোগ দিয়েছে। বাংলা ভাষায় আরবীর খিদমতে তার বিশেষ অবদানের ওপরই তিনি গবেষণা করে এ ডিগ্রি হাসিল করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুবারকবাদ

গত ১৮ ডিসেম্বর (২০০৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২তম সমাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন মানের ডিগ্রিধারীদের বিশালতম সমাবেশে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মুসলিম বিশ্বের গৌরব ডা. মুহাম্মদ মাহাথিরকে আমন্ত্রণ জানানোর হিম্মত করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মাহাথির মুহাম্মদ নামে তিনি মুসলিম বিশ্বে পরিচিত। একটানা ২২ বছর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশ গড়ার যে গৌরবময় উদাহরণ স্থাপন করেছেন, তাতে বিশ্বে তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত অনুন্নত দেশগুলোর জন্য তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

প্রায় দেড়শ কোটি মুসলিম উম্মাহর বিবেক হিসেবে তার মর্যাদা আরও বড়। গত বছর কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর অন্তরের দীর্ঘ দিনের গুমরানি বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারণ করে তিনি উম্মাহর মহান নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ইসলামের যোগ্য মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করে উম্মাহকে উদ্দীপ্ত করেছেন। বিশ্বের নেতৃত্বের দাবিদার গোটা পাশ্চাত্য শক্তিকে ইহুদীদের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করে ভয়ানক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এ মহাসত্য উচ্চারণের সাহস আর কোন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা সকলকেই অনুপ্রাণিত করার কথা। তবে কুরআনের আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট তিনি মৌলবাদী আখ্যায়িত হতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নেতৃস্থানীয় একটি গ্রুপ বলিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। ডা. মাহাথিরের কুরআন সম্পর্কিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে তারা এখনও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কি-না জানি না। মাহাথিরের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে উচ্চারিত বলে প্রতিবাদ করা সহজ নয়। লাখ লাখ আলেমের মুখে ঐ কথা উচ্চারিত হলেও উচ্চশিক্ষিত মহলে এমন প্রভাব পড়বে না, যা ডা. মাহাথিরের বক্তব্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কুরআনের পক্ষে এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা।

ডা. মাহাথির মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন থাকাকালেও আমেরিকার মুসলিম-বিদ্বেষী নীতির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ-এর মুরব্বিয়ানার পরওয়া না করেই মালয়েশিয়ার উন্নয়নে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি সত্যিকার নির্ভরতা থাকলে এবং দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারলে পরাশক্তির ভ্রূকুটির পরওয়া করার প্রয়োজন পড়ে না।

মুসলিম দেশের শাসকগণ যদি মাহাথিরের মতো সাহসী হতেন তাহলে আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করার চিন্তাও করত না। আমেরিকার ভয়ে সবাই অস্থির। আমেরিকার মর্জির যারা অনুগত তারা ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা কর্তব্য মনে করে। আমেরিকার নির্দেশে তারাও ইসলামকে মৌলবাদ বলে গালি দিচ্ছে। সুদান ও ইরান ইসলামের অনুসারী বলে আমেরিকা তাদের হুমকি দিচ্ছে। লিবিয়ার নেতা

গাদ্দাফিও তার বিপ্লবী জযবা হারিয়ে আমেরিকার অনুগত হয়ে গেলেন। মুসলিম উম্মাহর আসল সমস্যাই হলো মুসলিম শাসকদের ঈমানী দুর্বলতা ও কতক শাসকের ইসলাম-বৈরিতা। তারা উম্মাহর নেতৃত্বের অযোগ্য। এটাই মুসলিম উম্মাহর আসল মুসীবত।

আনন্দ ও বিষাদ মিলেই দুনিয়ার জীবন

আল্লাহ তাআলা সুখ ও দুঃখ দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় শুধু সুখ ও শুধু দুঃখ নেই। এ দু'অবস্থা মিলেই দুনিয়ার জীবন। আখিরাতে এ দুটো সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে। বেহেশতে শুধু সুখ ও দোযখে শুধু দুঃখ।

গত ৩০ নভেম্বর (২০০৪) আমার বড় বৌমা মা মুন্নী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ায় মন চরম বিষাদময় হয়ে রইল। তিন সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই এক পরম আনন্দের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সে আনন্দে শরীক হতে বাধ্য হলাম। এটাই দুনিয়ার বাস্তবতা।

আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বড় মেয়ে আতিয়ার (আমার এক ডজন নাতনির মধ্যে সবার বড়) বিয়ে হলো ১৯.১২.০৪ তারিখে। বিয়ের অনুষ্ঠান ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরে। আমি ঢাকা থেকে বিয়ের খুতবা দিলাম। ওখানে মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরীর বড় ছেলে মাওলানা উসামা ইজাব-কবুল করালেন। আমি নবদম্পতিকে নসীহতমূলক কথা বলে দোয়া পরিচালনা করলাম। ওখানে ফোনের সাথে মাইক লাগিয়ে সবাইকে শুনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ নাতনিটি ম্যানচেস্টারে মেডিক্যালে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী এবং ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলা। নাত-জামাই মুতিউর রহমান চৌধুরী ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়। সে উচ্চ ডিগ্রিধারী এবং একটা বড় কোম্পানিতে চাকরিরত।

সে লন্ডনের নিকটেই নিজস্ব বাড়িতে থাকে। সে পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা জনাব আবদুল করীম চৌধুরী বর্তমানে মৌলভীবাজার শহরে ব্যবসা করেন। ম্যানচেস্টার থাকাকালে তিনি আমার বড় ছেলে মামূনের সাথে ইসলামী আন্দোলনে সহকর্মী ছিলেন। এ বিয়ের ঘটকালি করে আমার বড় বৌমা মরহুমা মা মুন্নী। সে বিয়েতে উপস্থিত হতে পারল না। বিয়ের ১৮ দিন পূর্বে সে ঢাকায় ইন্তিকাল করে। এ বিয়েতে পরার উদ্দেশ্যে সে যে শাড়ি কিনেছিল তা আর পরা হলো না।

আমার দাদা-দাদি ও আব্বা-আম্মা তাদের ছেলের ঘরের নাতি বা নাতনির বিয়ে দেখে যেতে পারেননি। আমি ও আমার স্ত্রী নাতনির বিয়ে দেখলাম, আলহামদু লিল্লাহ। এখন বিবাহবন্ধন হলো। মেয়ে উঠিয়ে নেওয়ার কথা আগামী জুলাই (২০০৫) মাসে। তখন আমাদেরও যাওয়ার আশা ইনশাআল্লাহ। আমাদের চার ছেলে ও বড় ছেলের ছেলে-মেয়েরা ম্যানচেস্টারেই থাকে। বড় ছেলে তার ছোট মেয়েকে নিয়ে জেদ্দায় আছে। একমাত্র ৪র্থ ছেলেই দেশে আছে সেনাবাহিনীতে। আগামী জুলাইতে এরা ছয় ভাই সপরিবারে দীর্ঘ ২৮ বছর পর ম্যানচেস্টারে একত্র হওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ আশা পূরণ করুন। আমীন!

আজকাল টেলিফোনে বিয়ের প্রচলন হয়েছে। বর ও কনের মধ্যে ইজাব-কবুল ফোনে

করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমার এক আত্মীয় আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বললাম, এভাবে ইজাব-কবুলকে বিয়ের এ্যানগেজমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিয়ের ইজাব-কবুলের সময় কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী থাকা জরুরি। টেলিফোনে ইজাব-কবুল হলে সাক্ষীর উপস্থিতি সম্ভব নয়। তাই ফোনে ইজাব-কবুলের পর বর ও কনে যখন একত্র হবে তখন আবার ফরম্যালি বিয়ে পড়াতে হবে; যাতে সাক্ষীর উপস্থিতির শর্ত পূরণ হয়।

টেলিফোনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিয়ে পড়ানোর কোন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কি-না জানি না। বিয়ে পড়ানোর পর আমাদের পরিবারস্থ সবাই (বোন জাহানারাও) খেজুর খেয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করল।

১৯৬.

দেশে ফিরে আসার প্রস্তুতি

আগেই বলেছি, আমার আম্মা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট আমার ব্যাপারে দরখাস্ত করলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বিদেশী নাগরিক হিসেবে অল্প সময়ের জন্য দেশে আসার অনুমতি (NOC) দেওয়া হয়। আম্মা '৭৭ সালের নভেম্বরে দরখাস্ত দেন। সরকার ১১.০৩.১৯৭৮ তারিখে NOC ইস্যু করে। লন্ডন থেকে সরকারি চিঠি আমার কুয়েতের ঠিকানায় পৌঁছে এপ্রিলের মাঝামাঝি। আমি তখন কুয়েতে সপরিবারে অবস্থান করছি।

প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে কী যে আনন্দবোধ করলাম তা প্রকাশ করার ভাষা কোথায় পাব! বাধ্য হয়ে বিদেশে যারা থাকেনি, তারা আমার মনের ঐ আবেগ উপলব্ধি করতে অক্ষম।

NOC পাওয়ার সাথে সাথে প্রথমে খেয়াল হলো, আমার ভবিষ্যৎ তো একেবারেই অনিশ্চিত। আমার জন্ম বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও দেশের সরকার আমার নাগরিকত্ব স্বীকার করে না। আমাকে অল্প সময়ের জন্য (short period লেখা) ভিজিটের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দেশে গিয়ে কত দিন থাকতে দেবে, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকা সম্ভব কি-না, সম্ভব না হলে কী করব, কোথায় যাব ইত্যাদি সবই অনিশ্চিত। এ সত্ত্বেও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দেশে একবার যেতে পারলে আমাকে জোর করে বের করতে পারবে না। বড় জোর জেলে আটক করে রাখবে। আমি জেলে পড়ে থাকতে তৈরি; কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশ থেকে বের হতে প্রস্তুত নই।

এরপর খেয়াল জাগল, দেশে ফিরে যাওয়ার পথে পাকিস্তানে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করে গেলে কেমন হয়? সেই ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে লন্ডনে শেষবারের মতো দেখা হয়েছে। দেশে তো অনিশ্চিত অবস্থায় যাচ্ছি। মাওলানার সাথে আর দেখা হবে কি-না বলা যায় না। দেশে যাওয়ার পথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে মাওলানা মওদূদীকে চিঠি লিখলাম, তিনি ত্বরিত জবাব দিলেন, "বাংলাদেশের পাসপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান আসবেন না। এখন আসলে করাচি বিমানবন্দরে ছাত্রসংগঠন ও জামায়াতের লোকেরা আপনাকে সংবর্ধনা জানিয়ে এমন দৃশ্যের সৃষ্টি করবে, যার ফলে আপনার ঢাকা যাওয়ার অনুমতিই বাতিল হয়ে যাবে।" মাওলানার

মতামত জানার পর ঐ চিন্তা ক্ষান্ত করলাম। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সফরে গিয়ে করাচি বিমানবন্দরে মাওলানার ঐ অভিমতের সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৩৩ বছর পরও যা দেখলাম, '৭৮ সালে গেলে যে কেমন অবস্থা হতো তা অনুমান করে মাওলানার দূরদৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগল।

আমি, আমার স্ত্রী ও সালমান ছাড়াও ম্যানচেস্টারে অবস্থানরত আমার তৃতীয় ছেলে মোমেনও আমার সাথেই দেশে ফিরে যাবে। তাই আমাদের লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে বাংলাদেশের ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। লন্ডন রওয়ানা হওয়ার জন্য দিন-তারিখ বাদ দিলাম। আমি সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকার পর জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছি জেনে আমার কুয়েতি ও পাকিস্তানি বন্ধুরা খুব খুশি হয়ে রীতিমতো বিদায় সংবর্ধনা দিতে লাগলেন। তাদের বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়ালেন এবং নানারকম উপহার সামগ্রী দিলেন।

তখন কুয়েতে বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি আমাদের গ্রামেরই। প্রাইমারি স্কুলে তিনি আমার চতুর্থ ও কনিষ্ঠ ভাই ড. মুহাম্মদ মাহদীউয্যামানের সহপাঠী। তিনি পূর্বে একবার তাঁর বাসায় আমাদের দাওয়াত করে খাওয়ান। তিনিও বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। তাঁর নাম জনাব ফজলুর রহমান। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

লন্ডনে দেশে ফেরার তৎপরতা

১৫ জুন (১৯৭৮) আমরা লন্ডন ফিরে গেলাম। ভিসার ব্যাপারে হাইকমিশনে আমার পূর্বপরিচিত ও জামায়াত-সমর্থক এক ভাইকে জানালাম, NOC-তে লেখা আছে যে, আমাকে short period-এর জন্য ভিজিট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি তো ছয় মাসের ভিসা চেয়ে দরখাস্ত করতে চাই। শর্ট পিরিয়ড বলতে কী বোঝায়? তিনি আমাকে ফোনে জানালেন, হাইকমিশনের তিন মাসের বেশি ভিসা দেওয়ার ক্ষমতাই নেই। আমি বললাম, তাহলে তিন মাসের ভিসা চেয়েই দরখাস্ত আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। দেখবেন, যাতে তা মঞ্জুর হয়।

NOC-তে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, আমি ঢাকা বিমানবন্দরেও ভিসা সংগ্রহ করতে পারব। আমি লন্ডন থেকে ভিসা নেওয়াই নিরাপদ মনে করলাম। ঢাকা বিমানবন্দরে আবার কোন্ ঝামেলায় পড়ি বলা যায় না। ইমিগ্রেশন অফিসার ভিসার মেয়াদের ফায়সালা করতে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে বিলম্ব হয়ে যেতে পারে। যা হোক তিন মাসের ভিসা নিয়েই ঢাকা রওয়ানা দিলাম। আমার স্ত্রী ও দু'ছেলে বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়েই সে দেশে গিয়েছে। তাই ভিসা-সমস্যা শুধু আমার, তাদের নয়।

হাইকমিশনে ঐ পরিচিত লোকের সহায়তায় পূর্ণ তিন মাসের ভিসা পেয়ে গেলাম। ঐ লোক না থাকলে হয়তো এক মাসের বেশি মেয়াদে ভিসা পেতাম না। কারণ হাইকমিশনের মঞ্জুর করার এখতিয়ার মাত্র তিন মাস। পূর্ণ এখতিয়ার একবারেই মঞ্জুর করতে বাধ্য নয়। হয়তো বলত যে, দেশে গিয়ে মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন; আমরা এক বা দেড় মাসের ভিসা দিলাম। একটানা তিন মাসের ভিসা পাওয়ায় এটুকু সুবিধা হলো যে, তিন মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য দরখাস্ত করতে হবে না।

ঢাকা পৌঁছলাম

১০ জুলাই (১৯৭৮) রাতে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে আমি, আমার স্ত্রী এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ছেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। একটানা ১৪ ঘন্টার সফরে জন্মভূমিতে ফিরে আসার উত্তেজনায় ঘুমাতে পারলাম না। ছয় বছর আট মাস পর দেশে যাচ্ছি। দেশের ও বাড়ির কত কথা মনে বারবার জাগতে লাগল। সবচেয়ে বেদনাময় অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল আব্বার স্মৃতি। '৭১-এর নভেম্বরে আব্বাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রেখে গেলাম। এবার গিয়ে আব্বাকে আর দেখতে পাব না, এ চিন্তা নতুন করে মনকে বিষাদময় করে তুলল। একান্ত প্রিয় ভাই মাওলানা আযহারী দাদা ডেকে সম্ভাষণ জানাবেন না। অল্প বয়সে বিধবা বোন জাহানারার জন্য নতুন করে বেদনাবোধ করলাম।

এরপরই জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভাবনা জাগল। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আমীরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে একাধিকবার চিঠি লিখে আমাকে তাগিদ দিয়েছেন দেশে ফিরে এসে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। আমি দেশে না থাকায় তিনি এ দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রতি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। তাই বুঝতে পারলাম, দেশে ফিরে এলে এ দায়িত্বের বোঝা আমার উপর পড়বে। কিন্তু আমার নাগরিকত্বের সমস্যা নিয়ে কেমন করে এ দায়িত্ব পালন করা যাবে, সে কথা ভেবে কোন কূল-কিনারা পেলাম না। সারা পথ এসব চিন্তা-ভাবনা আমাকে জাগ্রত করে রাখল।

ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমান থেকে বের হয়ে জন্মভূমির পরিচিত আলো-বাতাসে মনে হলো, শুকনায় ছটফট করা মাছ যেন পানিতে এসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে না থাকলে হয়তো এমন অনুভূতি সৃষ্টি হতো না।

বিদেশী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন

জন্মভূমিতে আমাকে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করতে হলো। এ কলঙ্ক শেখ মুজিবেরই প্রাপ্য। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জন্মসূত্রে নাগরিককে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে তিনি কলঙ্কিত হলেন। জন্মসূত্রে নাগরিক দেশের আইনবিরোধী আচরণ করলে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব সরকার পালন করবে; কিন্তু তাকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ঘোষণা করার কোন বৈধ ক্ষমতা সরকারের নেই। ১৯৯৪ সালের জুনের ২২ তারিখ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে মুজিব সরকারের ঐ ঘোষণা বেআইনি বলে রায় দেওয়ায় তিনি কলঙ্কের ভাগী হলেন।

ঐ অবৈধ ঘোষণার ফলে আমার নিজের দেশের সরকার আমার সাথে বিদেশী হিসেবে আচরণ করল। আমার নাগরিকত্ব বহালের জন্য '৭৬, '৭৭ ও '৭৮ সালে তিন বার দরখাস্ত করলাম। জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায় ছিলেন। আমি সরাসরি তাঁর বরাবরই দরখাস্ত পাঠাই। যদি তিনি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করতেন তাহলে আমি বাংলাদেশী পাসপোর্টেই দেশে ফিরে আসতাম। আমার নিজের দেশের ভিসা নিয়ে আসতে হতো না। দেশে আসার পর আমার সাথে বিদেশী হিসেবে আচরণ করার প্রয়োজনও হতো না। '৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুজিব সরকার থেকে নিয়ে ১৯৯১-'৯৬ সালের বেগম জিয়ার সরকার পর্যন্ত সকল সরকারকে অবৈধ আচরণের দোষে অপরাধী বলে গণ্য হতে হতো না।

ঢাকায় পৌঁছার পরদিনই আইনের চাপে আমাকে বিদেশী হিসেবে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। ঐ কলঙ্কজনক সার্টিফিকেটের কপি সংযুক্ত করা হল।

FORM B (DUPLICATE)

PART II

(To be retained by the Foreigner.)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(*See* Rules 6, 7, 8 and 17.)

Photograph of Foreigner.

1. Name .. Mr./Mrs./Miss (in block capitals, Surname first). PROF. GHULAM AZAM

Maiden Name..............................

2. Date, place and country of birth....22. 11. 1922, Dacca. Bangladesh
3. Nationality (present). .....Citizen of Pakistan (Previous, if any)..................
4. Profession and purpose of visit and proposed length of stay in Bangladesh..Pensioner,.... To... see... mother, 3 (three) months.....................
5. Army, Navy or Air Force rank held, if any.....NO..........
6. Number, date and place of issue of passport..........AF. 091383, 11. JAN. 1977,
7. Visa No. and place and date of issue....Con/V. 2009/78, 27. 6. 78, LONDON
8. Port of embarkation........LONDON.............

Port of disembarkation........DACCA..............

9. Name or other particulars of the vessel by which arrived.....B.D.A.C.............

Date of arrival......11. 7. 1978...........................

10. Intended address in Bangladesh.....120, Elephant Road. Dacca.....

Last address outside Bangladesh.....189, Acomb Street, Manchester

Serial No. of Registration..........................12. 7. 78...........

(To be filled in by the Registration Officer.)

Signature of Registration Officer. 12/7

Signature of Foreigner.................... 12/7/78

Registration transferred to:

District.	Date.	Signature and seal of Registration Officer of District in Column 1.
1	2	3

Note :—No alteration should be made on this Form : corrections should be noted and attested on the reverse.

১৯৭২ থেকে '৯৪ সাল পর্যন্ত ২২ বছর বাংলাদেশে যত সরকার ছিল সবাই উক্ত কলঙ্কের ভাগী। তাই স্থায়ী রেকর্ড রাখার উদ্দেশ্যেই ঐ সার্টিফিকেট সংযুক্ত করলাম।

বিমান থেকে নীরবে বাড়িতে গমন

বিমান থেকে অবতরণের সাথে সাথে বিমানের পাশেই আমাকে নীরবে অভ্যর্থনা জানালেন জনাব শামসুল হক (মরহুম)। তিনি বিমানের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি জামায়াতের রুকন ছিলেন। তিনি আমাদেরকে ইমিগ্রেশনের ঘাঁটি পার করে বাইরে নিয়ে এলেন।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তক্রমে বিমানবন্দরে আমাকে রিসিভ করার জন্য অফিস সেক্রেটারি অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ও পাকিস্তান আমলের অফিস সহকারী আমীনুর রহমান বিমানবন্দরে গেলেন। আমাকে আনার জন্য তাঁরা একটা মাইক্রোবাস নিয়ে গেলেন এবং ডা. আজিজুল হক চৌধুরী (মরহুম) গাড়িতেই বসে ছিলেন।

বাড়ি থেকে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররাম আমাদেরকে রিসিভ করতে গেল। তখন সে ঢাকায়ই কর্মরত ছিল।

আমার স্ত্রী ও দু'ছেলেকে নিয়ে আমার ভাই আলাদা গাড়িতে করে বাড়িতে এল। আর জামায়াতের গাড়িটি আমাকে নিয়ে নীরবে চলে এল। মগবাজারের বাড়ির পুরনো টিনের ঘরে কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিলেন।

প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো যে, আমাদের টিনের ঘরে থাকা আমার জন্য নিরাপদ নয়। তাই আমার স্ত্রী ও দু'ছেলে আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ভেতরের এক কামরায় উঠল। আমার সাথে জামায়াতের লোকজন এসে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনে আমি বোন জাহানারা আযহারীর বৈঠকখানায় একটা বিছানা পেতে থাকলাম।

এভাবে কিছু দিন থাকার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, নিজের বাড়িতে না থাকলে বাড়ির উন্নয়নের কোন কাজ করা সহজ হবে না। তাই কয়েকদিন ভাই ও বোনের বাড়িতে থেকে আব্বার কাছ থেকে ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত টিনের ঘরেই গিয়ে উঠলাম। সপ্তাহখানেকের মধ্যে মনে হলো, নিরাপত্তারও কোন সমস্যা নেই। তাই সিদ্ধান্তক্রমে নিজের ঘরেই উঠলাম।

তখন প্রচণ্ড গরম। শীতের দেশে কয়েক বছর থাকার পর ঢাকায় গরম তীব্র মনে হওয়ারই কথা। তাছাড়া বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করার মতো পৃথক কোন ঘরও ছিল না। তাই থাকার মতো একটা কামরা ও বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আরও একটা কামরা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল।

আব্বা আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে জমি ভাগ করার সময় আদি টিনের ঘরটি আমার ভাগে রাখলেন। অন্য ভাইয়েরা দালান করবে বলে তাদের জন্য খালি জায়গা বরাদ্দ করলেন। কাযী অফিস হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আব্বা দেয়ালের উপর টিনের চাল দিয়ে সেমিপাকা একটা বড় ঘর রাস্তার পাশে তৈরি করেছিলেন। আমার জন্য বরাদ্দ জায়গায়ই ঘরটি নির্মাণ করলেন।

১৯৭০ সালে আব্বা কাযী হিসেবে অবসর নেন। আব্বার চেষ্টায় আমার সর্বকনিষ্ঠা বোন জান্নাত আরার স্বামী পীরযাদা মাওলানা সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ কাযী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে আব্বার অফিসটিই ব্যবহার করছিলেন।

আমি দেশে ফিরে আসার পর আমার বৈঠকখানা ও চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ঐ ঘরটি কাযী সাহেব ছেড়ে দিলেন। ঘরটি বড় ছিল বলে মাঝে দেয়াল দিয়ে আমার চেম্বার, সেক্রেটারির কামরা ও দর্শনার্থীদের কামরার ব্যবস্থা করা হয়।

আব্বার তৈরি এ ঘরটির দেয়াল ঘেঁষেই আমার থাকার জন্য সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করা হলো। '৭৮-এর শেষদিকে এ ঘর তৈরি হয় এবং '৯৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ বছর ঐ ঘরেই কাটাই। বর্তমান বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ '৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়।

আমার একান্ত সচিব হিসেবে আবদুল কাদের মোল্লা

ঢাকা আসার সাথে সাথেই আমার জন্য একজন একান্ত সচিব সরবরাহ করা প্রয়োজন মনে করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আবু নাসের সদ্য ছাত্রজীবন সমাপ্তকারী আবদুল কাদের মোল্লাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। মোল্লা এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সভাপতি ছিলেন। পরে শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোল্লা আমার পিএস হিসেবে সেদিনই কাজ শুরু করেন। আমার সাথে যারা দেখা করতে আসেন তাদের ডিল করাই তার প্রধান দায়িত্ব।

সাধারণত সেক্রেটারির জন্য আলাদা কামরার প্রয়োজন হয়। দর্শনার্থীরা প্রথমে সেক্রেটারির কামরায় হাজির হন। যথাসময়ে এক-একজনকে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব। কিন্তু তখন পর্যন্ত পৃথক কামরার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সাক্ষাতের কামরায়ই সেক্রেটারিকেও বসতে হয়। এর ফলে আমি যখন কারো সাথে আলোচনা করতাম তখন মোল্লাও সেখানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হতেন।

সচিব বা সেক্রেটারির ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। ইতঃপূর্বে এ জাতীয় দায়িত্ব পালনের কোন অভিজ্ঞতা মোল্লার ছিল না। মোল্লা তো ছাত্রনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই আলোচনার সময় উপস্থিত থাকার সুযোগে তিনিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার মতও প্রকাশ করার সুযোগ নিতে থাকলেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ তাআলা মোল্লাকে নেতৃত্বের গুণাবলি ও যোগ্যতা দান করেছেন। রেল কোম্পানি যেমন ইঞ্জিন কমই তৈরি করে। একটি ইঞ্জিন অনেক বগি টেনে নিয়ে যায় বলে ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় বগি তৈরি করতে হয়। মানবসমাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলাও অল্প সংখ্যায়ই নেতামার্কা লোক তৈরি করেন। মোল্লা তাদেরই একজন বলে বুঝতে পারলাম।

কয়েক মাস পরই নভেম্বরে মোল্লা জামায়াতের রুকন হয়ে গেলেন। সেক্রেটারির জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা হওয়ার পরও বছরখানেক মোল্লা আমার সেক্রেটারি ছিলেন।

সেক্রেটারি হিসেবে ফযলুর রহমান

মোল্লার পর ফযলুর রহমান আমার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি '৭৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স পাস করেন। তিনি সেখানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য হিসেবে বায়তুল মাল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৯ সালের শেষ দিক থেকে প্রায় দশ বছর তিনি আমার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমার সেক্রেটারি হওয়ার পর জামায়াতের রুকন হন। সেক্রেটারির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর তিনি কলেজে অধ্যাপনা এবং স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও আমার লেখা কতক বই প্রকাশনার দায়িত্ব পালনের কারণে আমার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ

'৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব ও আইডিএল-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পৃথক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। মাওলানা আবদুর রহীম '৭৭ থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য আমীর নির্বাচিত হন। তিনি জামায়াতের আমীর ও আইডিএল-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মাওলানা আইডিএল-এর চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন এবং '৭৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৭৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য উপনির্বাচনের মাধ্যমে আমীরের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। ঐ উপনির্বাচনে আমাকে আমীর নির্বাচিত করা হয়।

জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমীর পরিবর্তন হলে মজলিসে শূরার পুনর্নির্বাচন হতে হবে। তাই অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য মজলিসে শূরারও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমার উপর দায়িত্ব আসার পর মাওলানা ইউসুফকে নায়েবে আমীরের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং জনাব শামসুর রহমানকে সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী তখনো প্রকাশ্যে কর্মতৎপরতা শুরু করেনি। জামায়াতের স্থায়ী চার দফা কর্মসূচির প্রথম দু'দফা নীরবে পালন করা হচ্ছিল, তৃতীয় দফা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে এবং চতুর্থ দফা (রাজনৈতিক) আইডিএল-এর মাধ্যমে পালন করতে হয়েছিল। পিপিআর-এর অধীনে দরখাস্ত করে জামায়াত তখনো অনুমতি পায়নি। জামায়াত দরখাস্ত দিয়েছিল; কিন্তু আরও কতক তথ্য চেয়ে তা ফেরত পাঠানো হয়। জামায়াত এরপর আর এ পথে অগ্রসর হয়নি।

১৯৭.

নাগরিকত্ব বহালের জন্য পরামর্শ

আমি মাত্র তিন মাসের ভিসা নিয়ে দেশে এলাম। '৭৮-এর ১০ অক্টোবর এর মেয়াদ শেষ। তাই দেশে ফিরে আসার মাসখানেক পরই চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করা শুরু হলো যে, নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামীদুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা করলাম। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী। মুজিব সরকার নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে

প্রথম কিস্তিতে ৩৯ জনের যে তালিকা প্রকাশ করে তাতে প্রথম নামই ছিল হামীদুল হক চৌধুরীর। দ্বিতীয় নাম এডভোকেট এ. টি. সাদীর ও তৃতীয় নাম আমার।

হামীদুল হক চৌধুরী সাহেবের নাগরিকত্ব বহাল হয়েছে আগেই। তার সাথে পরামর্শ করতে গেলাম। তিনি বললেন, আপনি জন্মসূত্রে নাগরিক, আপনার নাগরিকত্ব আজ হোক কাল হোক সরকার তা স্বীকার করতে বাধ্য। আমি বললাম, আপনার নাগরিকত্ব কীভাবে বহাল হলো? তিনি বললেন, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আমি নাগরিকত্ব বহালের দরখাস্ত পাঠালে তারা দেশে আসতে সুযোগ দিল। আমি বললাম, আমি তিন বার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও নাগরিকত্ব বহাল করতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমার আম্মার দরখাস্তের ভিত্তিতে আমি ভিসা নিয়ে দেশে এলাম। আমি তো বিদেশী নাগরিক হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়ে আছি। বিদেশী নাগরিক যেভাবে এ দেশের নাগরিকত্বের জন্য সরকারি ফরমে দরখাস্ত করে আমি সেভাবে দরখাস্ত করব কি-না?

তিনি বললেন, আপনি কি বিদেশী নাকি? বিদেশী হিসেবে দরখাস্ত করবেন কেন? চুপ করে থাকেন। আপনাকে বড় জোর জেলে আটক করবে। তখন হাই কোর্টে মামলা ঠুকে দেবেন। তিনি নাগরিকত্ব চেয়ে দরখাস্ত করতে নিষেধ করলেন।

ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি

দেখতে দেখতে দু'মাস চলে গেল। যদি নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করা না হয় তাহলে যথাসময়ে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য দরখাস্ত দিতে হবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে ভিসার মেয়াদ আরও তিন মাস বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলাম। ৫ অক্টোবর ('৭৮) তারিখে জারিকৃত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট-এর ডাইরেক্টরকে জানানো হয়েছে, আমার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ৯ নভেম্বর ('৭৮) সমাপ্ত হবে। চিঠিতে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, This is the last extention (এটাই সর্বশেষ মেয়াদ বৃদ্ধি)। অথচ বাস্তবে এটা First Extention (প্রথম বৃদ্ধি) মাত্র।

বিদেশী নাগরিক হিসেবে রেজিস্টার্ড হওয়ায় আমার ব্যাপারে সরকারি সকল চিঠিপত্রই ইংরেজি ভাষায় পাঠানো হয়। আমিও ইংরেজিতেই দরখাস্ত দিই।

২৩ অক্টোবর আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর দরখাস্ত দিলাম। তাতে লিখলাম, ভিসার মেয়াদ তিন মাস বৃদ্ধি করার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, মাত্র এক মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমার শাশুড়ি ৯.১০.১৯৭৮-এ ইন্তিকাল করলেন। অসুস্থ আম্মাকে এ অবস্থায় রেখে আমার চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই মানবিক কারণে ভিসার মেয়াদ আরও দু'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

তখন রমযান মাস শুরু হয়েছে। ভিসার মেয়াদ না বাড়ালে আমাকে ঈদের আগেই চলে যেতে হবে। সরকারের ভাব-গতি থেকে মনে হলো, ভিসার মেয়াদ আর বৃদ্ধি করবে না। এ পরিস্থিতিতে আমার এক দীনী বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় সহকারী কমিশনার ক্যাপটেন মুহাম্মদ আবদুর রব (মরহুম) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির দরখাস্তের কপি নিয়ে সচিবালয়ে

দরবার করতে গেলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা তারই জুনিয়র সহকর্মী। তার প্রচেষ্টায় ভিসার মেয়াদ আরও একমাস বৃদ্ধি করা হল। অবশ্য এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে অবশ্যই দেশ থেকে চলে যেতে হবে।

এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধুর কথা

১৯৭৮-এর ১১ জুলাই দেশে ফিরে আসার মাস দেড়েক পর অপ্রত্যাশিত এক ফোন এল। কথা বললেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ (মরহুম)। পাকিস্তান আমলে তার নামের সাথে আজাদ শব্দটি ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি ছদ্মনাম হিসেবে আজাদ নামকরণ করেছিলেন।

ফোনে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার কুশলাদি জেনে নিলেন এবং আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করলেন। তবে এ সাক্ষাৎ গোপন রাখতে হবে বলে সরাসরি আমার বাড়িতে না এসে পাশে অবস্থিত আমার ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছবেন বলে সিদ্ধান্ত হল।

সামাদ সাহেবের সাথে আমার বন্ধুত্বের ভিত্তি হলো ১৯৬৬ সালের পিডিএম (PDM) (Pakistan Democratic Movement)। এটা আওয়ামী লীগের ৬ দফার বদলে ৮ দফার আন্দোলন। ৬ দফার আন্দোলনকে পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী গণ্য করে পাঁচটি রাজনৈতিক দল ঐ আন্দোলন পরিচালনা করে। দলগুলোর নাম— পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (যার কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সভাপতি ছিলেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (PDP) (যার সভাপতি ছিলেন জনাব নূরুল আমীন ও সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন উক্ত জনাব আবদুস সামাদ), পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি (যার সভাপতি ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন মৌলভী ফরীদ আহমদ এডভোকেট), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) (যার সভাপতি ছিলেন মিয়া মোমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সভাপতি ছিলেন সৈয়দ খাজা খাইরুদ্দীন) এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান (যার আমীর ছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)।

পিডিএম-এর প্রাদেশিক সভাপতি ছিলেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান, সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম ও ট্রেজারার জনাব আবদুস সামাদ। মগবাজার চৌরাস্তার মোড়ে এক বিল্ডিংয়ের দোতলায় পিডিএম-এর অফিস ছিল। প্রায় রোজই আমরা তিন জন অফিসে একসাথে বসতাম। আন্দোলনের দাবি পূরণের জন্য যা যা করণীয়, এর পরিকল্পনা করা হতো এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলত। নেযামে ইসলাম পার্টি ও মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) প্রতিনিধি দু'জনও নিয়মিত আসতেন।

আমরা সারা দেশে একসাথে সফর করেছি ও জনসভায় বক্তৃতা করেছি। একটানা প্রায় আড়াই বছর একসাথে কাজ করার কারণে আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি '৬৯ সালে আইয়ূব খানের আহূত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর

সামাদ সাহেব আওয়ামী লীগে যোগদান করা সত্ত্বেও তার সাথে আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সামাদ সাহেব আওয়ামী লীগের টিকিটে বিজয়ী হলে আমি তাকে মুবারকবাদ জানাই। তখন ফোনে তার সাথে যে সংলাপ হয় তা থেকে ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মিলে। এ সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম'-এর তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। এরই প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন সামাদ সাহেব আমার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

আমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক '৯১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের দাওয়াতে তার সাথে দেখা হলে প্রাণভরে কোলাকুলি হতো। ১৯৯২ সালে যখন জামায়াতে ইসলামী আমীরে জামায়াত হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করল এবং এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল তীব্র প্রতিবাদ জানাল, তখন হোটেল সোনারগাঁও-এ এক অনুষ্ঠানে তার সাথে দেখা হলে আমি আগের মতোই হ্যান্ডশেক করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালাম। তিনি হাত গুটিয়ে নিয়ে, "হাত মিলালেই ফটো উঠে যাবে", বলেই সরে গেলেন। এটা '৯২ সালের জানুয়ারির কথা। এর পর থেকে তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কের অবসান ঘটে।

মুজিব হত্যার পর প্রথম নির্বাচনী ঘোষণা

১৯৭৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিব হত্যার পর '৭৯ সালের ফেব্রুয়ারির পূর্বে দেশে কোন নির্বাচন হয়নি। '৭৮ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিলেন। '৭৬ সাল থেকেই পিপিআর (Political Parties Regulation) অনুযায়ী অনেক রাজনৈতিক দল সরকারি অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছিল। নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো জোরে-শোরে দাবি তুলল যে, পিপিআর বাতিল করতে হবে। তা না হলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এ দাবি জোরদার হলে ১৭ নভেম্বর ('৭৮) সরকার দাবি মেনে নিলে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

'জামায়াতে ইসলামী' নামে তখনো প্রকাশ্যে কাজ শুরু করা হয়নি। আইডিএল নামেই জামায়াত রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। নির্বাচনের আর মাত্র তিন মাস সময় আছে। পিপিআর বাতিল হয়ে যাওয়ার পর জামায়াতে ইসলামী নামে সংগঠন প্রকাশ্যে চালু করার পথে কোন বাধা নেই বটে; কিন্তু জামায়াতের নামে কাজ শুরু করতে হলে দল গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। তাই জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল, এ নির্বাচন আইডিএল নামেই করতে হবে। পরবর্তীতে সময় বুঝে জামায়াতের পুনর্গঠন করা যাবে।

রমযানে প্রথম ই'তিকাফের সুযোগ

১৯৭৮ সালের আগস্টে রমযান মাস এল। তখন আমার তেমন কোন কর্মব্যস্ততা ছিল না। তাই ই'তিকাফ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পাকিস্তান আমলে অনেকবারই ই'তিকাফের কামনা করেছি; কিন্তু জামায়াতের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক উভয় রকম দায়িত্ব আমাকে

পালন করতে হতো বলে সময় বের করা সম্ভব হয়নি। '৭৮-এ কোন দায়িত্বই না থাকায় ই'তিকাফ করা সহজ হয়ে গেল। এটাই আমার জীবনে প্রথমবারের ই'তিকাফ। ই'তিকাফের সময় ইসলামী ঐক্যের পক্ষে একটা বই রচনা করি। ইসলামী সকল শক্তিকে একটি মঞ্চে সমবেত দেখা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন প্রবাস জীবনেই একটা বিশেষ রূপলাভ করে।

এ পুস্তকের পটভূমি ঃ আমার বাধ্যতামূলক সাড়ে ছয় বছরের প্রবাস জীবনে একটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমাদের জন্মভূমিতে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। কয়েক লাখ আলেম জনগণের মধ্যে ঐ সবের মাধ্যমে দীনের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। মসজিদের মুসল্লী, মাদরাসার ছাত্র, খানকার মুরীদান, ওয়ায-মাহফিলের শ্রোতা ও তাবলীগের ইজতিমায় শরীক সকলে মিলে ইসলামের পক্ষে বিরাট শক্তি রয়েছে। কিন্তু দীনের খাদিমগণের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন না থাকায় এ শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তাই এ শক্তি কোন কাজে আসছে না।

আরও দুঃখের বিষয় যে, দীনের খাদিমগণের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ববোধেরও অভাব রয়েছে। এরই ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বেদীনদের নেতৃত্বই কায়েম রয়েছে। দীনকে বিজয়ী করতে হলে বিচ্ছিন্ন ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কীভাবে এ ঐক্য গড়া যায় এবং কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে দীনের খাদিমগণকে এক মঞ্চে সমবেত করা যায়, এ বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোআও করতে থাকলাম। '৭২ সাল থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই হজ্জের সময় মক্কা ও মদীনা শরীফে আমাকে হাজির হতে হতো। দোআ কবুলের সকল স্থানেই দোআ করতে থাকলাম; যাতে ইসলামী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কোন ফর্মুলা মন-মগজে আসে। বিশেষ করে '৭৬ সালে মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে রওযাতুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান) নামক স্থানে একাধারে কয়েক দিন আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে রইলাম। ক্রমে ক্রমে ইসলামী ঐক্যের একটা ফর্মুলা বুঝে এল।

'৭৭ সালে লন্ডনে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে দেখা হলে ঐ ফর্মুলাটি সম্পর্কে তার সাথে আলোচনা করলাম। তিনি উৎসাহের সাথে তা পছন্দ করলেন। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনার মাহফিলসমূহে বহু আলেম উপস্থিত থাকেন। সম্ভব হলে আপনি মাহফিলের শেষে আলেমগণের সাথে বৈঠক করে এ ফর্মুলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।

'৭৮ সালে দেশে এসে ঐ ফর্মুলা সম্পর্কে আরও চিন্তা-ভাবনা করে মনে এ বিষয়ে এতমিনান বোধ করেছি। তাই ই'তিকাফে ঐ ফর্মুলাটি লিখিত আকারে তৈরি করে ফেললাম। '৭৮-এর নভেম্বর মাসেই 'ইসলামী আন্দোলন' নামে তা প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর নভেম্বর থেকে বইটির নাম বদলিয়ে 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৪ সালে বইটির মুদ্রণ সংখ্যা ১১-তে পৌঁছেছে।

উক্ত ফর্মুলার সারকথা

১. প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, দীনের সকল খিদমতের গুরুত্ব সকল খাদিমকেই স্বীকার করতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, যারা দীনের যে ধরনের খিদমত করেন তারা নিজেদের খিদমতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কিন্তু অন্যান্য ধরনের খিদমতকে স্বীকৃতি দিতে চান না। যেমন কাওমী মাদরাসার কোন কোন খাদিম আলিয়া মাদরাসার খিদমতকে নগণ্য মনে করেন। তাবলীগ জামায়াতের কেউ কেউ তাদের কাজকে 'নবীওয়ালা' কাজ বলে গণ্য করেন; আর অন্যান্য খিদমতকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।

তাই আমার লেখা বইটিতে মক্তবের খিদমতের গুরুত্বও তুলে ধরেছি। ফোরকানিয়া, হাফেযী, কওমী ও আলিয়া মাদরাসাসমূহের খিদমত বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তেমনিভাবে মসজিদ, খানকাহ (পীর-মুরীদী), ওয়ায-নসীহত, ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ, তাবলীগ জামায়াত, ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ, স্থানীয় বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ছাত্রসংগঠন ইত্যাদি দ্বারা যেসব খিদমত হচ্ছে তা আলাদা আলাদাভাবে লিখেছি।

দীনের সকল প্রকার খাদিমগণ যদি সব রকম খিদমতকে স্বীকৃতি দেন তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠবে। সবাই যেন উপলব্ধি করেন, তারা বিভিন্নভাবে একই দীনের খিদমত করছেন এবং সকল রকম খিদমতই একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

২. বিভিন্ন ধরনের খিদমতে দীনের দায়িত্বশীলগণের নেতৃস্থানীয় ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন কায়েম করতে হবে। পরে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এর শাখা কায়েম করা হবে।

৩. এ ধরনের সংগঠন কায়েমের পথে বড় বাধা হল ব্যক্তিগত নেতৃত্ব। কোন একজনকে সভাপতি বা সেক্রেটারি করতে চাইলে নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা হতে পারে এবং এ বিষয়ে কোন্দল সৃষ্টি হয়ে সংগঠন ভেঙে যেতে পারে। তাই কোন এক ব্যক্তিকে সভাপতি না করে সামষ্টিক নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রধান দায়িত্বশীলগণকে নিয়ে মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী) গঠন করতে হবে। সংগঠনের প্রথম বৈঠকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন। পরবর্তী বৈঠকসমূহে মজলিসে সাদারাতের সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৪. মজলিসে সাদারাতে যেসব খিদমতে দীনের প্রতিনিধি রয়েছেন সেসব থেকেই একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হবে। বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের শাখা কায়েম করার দায়িত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করলে দ্রুত সংগঠন সম্প্রসারিত হতে পারে।

৫. মজলিসে সাদারাতের প্রধান দায়িত্ব নিম্নরূপ :

ক. ইসলামী ঐক্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য সকল ধরনের খাদিমে দীনকে সংগঠনভুক্ত করা।

খ. জনগণকে ইসলামের দিক দিয়ে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় হেদায়াত ও নসীহত করা।

গ. সরকারকে ইসলামের পক্ষে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান।

ঘ. ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান।

ঙ. ইসলামের খাদিমগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করা।

৬. মজলিসে সাদারাতের সদস্যদের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৭. এ সংগঠন কোন রাজনৈতিক দলের মতো ভূমিকা পালন করবে না। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে মতামত ব্যক্ত করবে না।

এ ফর্মুলা অনুযায়ী যেকোনো নামে সংগঠন চালু হতে পারে। সংগঠনের নামও সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাছাই করতে হবে।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হাসিলের দরখাস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত

১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে চলে যেতেই হবে বলে সরকারি নির্দেশ জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে পেরেশান করে তুলে। ভিসার মেয়াদ যেহেতু আর বৃদ্ধি করা হবেই না, দেশে অবস্থান করার আইনগত পথ তালাশ করে জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল, একজন বিদেশী যেভাবে কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে সরকারি পদ্ধতিতে আবেদন জানায়, আমাকেও তেমনিভাবে দরখাস্ত করতে হবে।

এডভোকেট হামীদুল হক চৌধুরীর অভিমতের বিরুদ্ধেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চৌধুরী সাহেবের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য দেওয়া প্রথম দরখাস্তই মঞ্জুর করা হয়। আমি তিনবার দরখাস্ত দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিবারই নামঞ্জুর করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার সম্পৃক্ততার কারণেই একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমার সাথে ভিন্ন আচরণ করা হলো। চৌধুরী সাহেব রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ফলে তাকে নিরাপদ মনে করা হয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে যখন আমার দেশে থাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ চলছে, তখন আইডিএল-এর ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট সা'দ আহমদ সরকারের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিলেন, এবার দেশ থেকে চলে গেলে আবার দেশে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। তিনি আন্তরিকতার সাথেই চেয়েছিলেন, সরকারকে ক্ষুব্ধ করে যাতে বিপদে পড়তে না হয়।

আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম, আমার জন্মগত নাগরিক অধিকার বহালের দায়িত্ব আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আমি এ বিষয়ে জামায়াতকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই না। এটাকে একান্তই আমার ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছি। কিন্তু জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন, জামায়াতের কারণেই আমাকে দেশ থেকে তড়ানো হচ্ছে। তাই তারা আমার চলে যাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং নাগরিকত্ব চেয়ে দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত দেন।

১৯৮.

নাগরিকত্ব বহাল না হওয়া পর্যন্ত দেশে থাকার অনুমতি প্রার্থনা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়ই আমার জন্ম। তাই একজন বিদেশী হিসেবে নিজের দেশের নাগরিকত্ব ভিক্ষা করতে অন্তরে চরম বিক্ষোভ সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত '৭৮ সালের ২৮ নভেম্বর দেশে থাকার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করতে বাধ্য হলাম। প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে উক্ত দরখাস্তে লিখলাম ঃ

আমার জন্মগত নাগরিকত্ব পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে আমার দীর্ঘ প্রচেষ্টা সরকারি সিদ্ধান্তে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে আপনাকে লিখছি ঃ

১. আমি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করছি, আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। আমি দেশ থেকে পালিয়ে যাইনি। '৭১-এর ২২ নভেম্বর দলীয় কর্মপরিষদ বৈঠকের উদ্দেশ্যে লাহোর যাই। ৩ ডিসেম্বর পিআইএ'র বিমানে করাচি থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। ঢাকা বিমানবন্দরে ঐ দিনই ভারতীয় বিমানবাহিনী বোমা ফেলায় ঐ বিমান ঢাকার কাছাকাছি এসে নিরাপত্তার জন্য জেদ্দায় চলে যায়। এভাবে আমি বাধ্য হয়ে বিদেশে রয়ে যাই।

২. আমি লন্ডনে নির্বাসন-জীবন কাটাই। দেশে আসার অনুমতি পেয়ে পাকিস্তানি পাসপোর্টেই আসি। আমি এ সময় পাকিস্তান যাইনি।

৩. আমার স্ত্রী ও সন্তানাদি সবাই বাংলাদেশী নাগরিক।

৪. আমার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাকা শহরের মগবাজারস্থ বাড়িটির মালিকানা ভোগ করছি।

৫. বিদেশে কোথাও আমার সামান্য কোন সম্পদও নেই।

৬. আমার অসুস্থ বৃদ্ধা আম্মাকে এ অবস্থায় রেখে আমার কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে আমার জন্মভূমিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। আশা করি মানবিক কারণে আমার এ আবেদন মঞ্জুর করবেন।

আমার বাড়িতে পুলিশ ইন্সপেক্টর

১৯৭৮-এর ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমি ২৮.১১.১৯৭৮-এ উপরিউক্ত দরখাস্ত দিয়ে বাড়িতে জেঁকে বসে যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ১০ ডিসেম্বর এক গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে হাজির। বৈঠকখানায় বসিয়ে ধীরে-সুস্থে জানতে চাইলাম, কী মনে করে এসেছেন? বললেন, স্যার! আজ আপনার দেশ থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল। আমি বললাম, দেখতেই পাচ্ছেন আমি যাইনি। বললেন, স্যার! আমি রিপোর্টে কী লিখব? বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, আপনার রিপোর্ট আপনিই লিখবেন। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করেছেন? আমি প্রেসিডেন্টের নিকট গত ২৮ নভেম্বর দরখাস্ত দিয়েছি। আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশে থাকার অনুমতি চেয়েছি।

তিনি জানতে চাইলেন, আমার দরখাস্ত কীভাবে পাঠিয়েছি। বললাম, বঙ্গভবনে হাতে হাতে পৌঁছানো হয়েছে এবং আর এক কপি রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠিয়েছি। পোস্ট অফিসের রশিদ দেখতে চাইলেন। দেখালাম। তিনি নোট নিলেন। আরও জানতে চাইলেন, একনলেজমেন্ট ডিউ কার্ড আছে কি-না। তাও দেখালাম। নোট নিয়ে সালাম দিয়ে ও শুকরিয়া জানিয়ে চলে গেলেন।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আইনগতভাবে আমার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সুযোগ সরকারের নেই। অন্যায়ভাবে হেরাস করতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। পুলিশের আচরণ থেকে মনে হলো, হেরাস করার কর্মসূচি তখনও গ্রহণ করা হয়নি।

প্রেসিডেন্টের সাথে আইডিএল নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

কয়েকদিন পরই আইডিএল-এর চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। আলোচনা শেষে মাওলানা আবদুর রহীম আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তিনি কেমন করে চলে যাবেন? কোথায় যাবেন?

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি যাননি? ঠিক আছে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলে দেব, যেন তাঁকে ডিস্টার্ব করা না হয়। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এসে আমাকে সুসংবাদটা দিলেন। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, মাওলানা আবদুস সুবহান পরদিনই এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে কথা বলবেন।

মাওলানা আবদুস সুবহান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের বাসায় গেলেন। এ প্রসঙ্গ তোলার সাথে সাথেই মন্ত্রী বললেন, প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোনে বলে দিয়েছেন যাতে অধ্যাপক সাহেবকে বিরক্ত করা না হয়। তিনি দেশে থাকুক। তবে আমরা তাঁকে লিখিতভাবে কিছুই বলব না।

মাওলানা মন্ত্রীর বাসা থেকে সরাসরি আমার বাড়িতে এসে সব কথা জানালেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে কয়েকবার 'আলহামদু লিল্লাহ' উচ্চারণ করে বললাম, আমার দেশে থাকা দরকার। সরকারের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন নেই। অনুমতি দিলে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ তাতে উল্লেখ করা থাকবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমাকে আবার অনুমতি চাইতে হবে। এসব ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম। '৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের পর থেকে '৯২-এর মার্চ পর্যন্ত কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। প্রায় ১৩ বছর আমার ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রইল।

সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবোত্তর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে প্রথম ও '৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। জামায়াতে ইসলামীর নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় আইডিএল নামেই

নির্বাচন করতে হলো। মুসলিম লীগের সাথে আইডিএল-এর সমঝোতার ভিত্তিতে আইডিএল ৭২টি আসনে এবং অবশিষ্ট ২২৮ আসনে মুসলিম লীগ নমিনেশন দেয়। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১৪টি ও আইডিএল ৬টি আসনে বিজয়ী হয়। আইডিএল নিজস্ব কোন প্রতীক দাবি না করে মুসলিম লীগের হারিকেন প্রতীক নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

আইডিএল-এর নিম্নলিখিত ৬ জন নির্বাচিত হন ঃ

১. পিরোজপুর জেলা থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

২. লক্ষ্মীপুর থেকে মাস্টার মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ।

৩. ঝিনাইদহ থেকে মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী।

৪. গাইবান্ধা থেকে অধ্যাপক রেজাউল করীম।

৫. ঝিকরগাছা থেকে মাস্টার মকবুল আহমদ।

৬. কুড়িগ্রাম থেকে অধ্যাপক সিরাজুল হক।

মুসলিম লীগের সাথে এক প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিলেও সংসদে এ ছয়জন পৃথক পার্লামেন্টারি গ্রুপ হিসেবেই আসন গ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুর রহীম গ্রুপ লিডার নির্বাচিত হন।

উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ৩৯টি আসন লাভ করে। ময়মনসিংহের জনাব আসাদুয্যামান খান পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার নির্বাচিত হন। সংসদে আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তিনিই 'লিডার অব দ্য অপজিশন' হন। মুসলিম লীগ সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বিরোধী দল, যার পার্লামেন্টারি লিডার হন খান আবদুস সবুর খান। আইডিএল তৃতীয় বিরোধী দল হিসেবে গণ্য হয়। জিয়াউর রহমানের বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন দখল করতে সক্ষম হয়। লিডার অব দ্য হাউস হন শাহ আজিজুর রহমান এবং স্পিকার হন মির্জা গোলাম হাফীজ এডভোকেট।

জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করা হয়। তখনো জামায়াত প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করেনি। সংসদ নির্বাচনের পর জামায়াতের প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানকে আহ্বায়ক করে জামায়াতে ইসলামীর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি এড্হক কমিটি গঠন করা হয়। তিনি '৭৯ সালের মে মাসের ২৫, ২৬ ও ২৭ তারিখে ঢাকাস্থ ইডেন হোটেলে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান করেন।

উক্ত সম্মেলনে জামায়াতের শুধু রুকনগণকেই ডেলিগেট হিসেবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তান আমলে এ দেশের রুকনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশ' ছিল। 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নতুন করে সংগঠিত করার সময় সিদ্ধান্ত হয় যে, তখনকার প্রতিকূল পরিবেশে সকল রুকনকেই নতুন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন বেআইনি থাকার কারণেই হোক বা নিজের এলাকা থেকে দেশে বা বিদেশে

স্থানান্তরে চলে যাওয়ার দরুনই হোক সকলে শপথ গ্রহণ করেননি। সম্মেলনের সময় পর্যন্ত নতুন রুকন যারা হয়েছেন তারাসহ সকল রুকনই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

আন্ডারগ্রাউন্ডে সংগঠন বেশ সম্প্রসারিত হচ্ছিল। আদর্শিক আন্দোলন সাইনবোর্ড ছাড়াও সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে সক্ষম। উদ্বোধনী অধিবেশন থেকে শুরু করে সম্মেলনের সকল অধিবেশনেই জনাব আব্বাস আলী খান সভাপতিত্ব করেন।

তখন জনাব শামসুর রহমান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন বলে তিনিই সম্মেলন পরিচালনা করেন। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও জনাব আবদুল খালেক সম্মেলন পরিচালনায় সেক্রেটারি জেনারেলকে সক্রিয় সহযোগিতা দান করেন।

আমি সংগঠনের আমীর হওয়া সত্ত্বেও সম্মেলনের কার্যাবলিতে অংশ নিতে পারিনি। সিদ্ধান্তক্রমেই আমি শুধু সমাপনী অধিবেশনে হাজির হই। 'বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি ও কার্যসূচি' শিরোনামে আমি লিখিত বক্তব্য পেশ করি। ঐ লেখাটি পুস্তিকাকারে 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' নামে প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালের নভেম্বরে পুস্তিকাটি সপ্তম বার মুদ্রিত হলো।

এ সম্মেলনের মাধ্যমে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের নিকট প্রকাশ্যে আবির্ভূত হলো। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকেই সংগঠন শুরু হয়। আইনগত প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকাশ্য তৎপরতা সম্ভব হয়নি। দীনের কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না। তাই ঈমানের তাগিদে সংগঠন চালু করে ফরয আদায় করতে হয়েছে। '৭৬ সালে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করার সুযোগ হলে জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতা আইডিএল-এর মাধ্যমে চালু করা হয়েছিল। এখন 'জামায়াতে ইসলামী' নামেই রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সম্মেলনে ঘোষণা করা হলো, ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচিই এখন বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচিগুলো হলো : ১. দাওয়াত ও তাবলীগ, ২. সংগঠন ও তরবিয়্যাত, ৩. সমাজ-সংস্কার ও সেবা, ৪. ইসলাহে হুকুমাত বা সরকার সংশোধনের কাজ (যা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে পরিচিত)।

১৯৬৪ সালে আইয়ূব খান জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করেন। নয় মাস পর যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ঐ ঘোষণাকেই বেআইনি সাব্যস্ত করা হয় তখন জামায়াতকে পুনর্বহালের জন্য কোন সম্মেলনের প্রয়োজন হয়নি। মাওলানা মওদূদী ঘোষণা করলেন, 'জামায়াত' নামক রেল গাড়িকে বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। গাড়ি রেল লাইনেই দণ্ডায়মান ছিল। প্যাসেঞ্জাররা গাড়ি থেকে নেমে যায়নি। সুপ্রিম কোর্ট রেড্ সিগন্যাল নামিয়ে দিয়েছে। এখন গাড়ি আবার চালু হয়ে গেল।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়েছে। তাই সরকারি হিসাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালের মে মাসের ২৭ তারিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আমার ভাষণের সারকথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার কারণে ভারতের আধিপত্য কায়েমের আশঙ্কায় জামায়াতে ইসলামীসহ আরও কতক রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এ অজুহাতে জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতাবিরোধী বলে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

তাই আমার ভাষণের শুরুতেই দেশপ্রেম সম্পর্কে জামায়াতের নিম্নরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয় :

বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক

মুসলিমের দৃষ্টিতে আল্লাহর গোটা দুনিয়াই তাঁর বাসভূমি। কিন্তু মহান স্রষ্টা আমাদেরকে যে দেশে পয়দা করলেন সে দেশের সাথে স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিশেষ ধরনের এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। কারণ আমরা ইচ্ছা করে এ দেশে পয়দা হইনি। আমাদের স্রষ্টা এ দেশে পয়দা করাই যখন পছন্দ করেছেন, তখন এ দেশের সাথে আমাদের মহব্বত অন্য সব দেশ থেকে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

মানুষ যে দেশের আবহাওয়ায় শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত গড়ে ওঠে, সে দেশের প্রকৃতির সাথে তার গভীর আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। শিশু অবচেতনভাবেই যেমন মাকে ভালোবাসে, তেমনি জন্মভূমির ভালোবাসাও মানব মনে স্বাভাবিক। ... প্রত্যেক নবী যে দেশে পয়দা হয়েছেন, সে দেশেই তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। বাধ্য না হলে কোন নবীই দেশ ত্যাগ করেননি। ... আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করাই আমাদের পার্থিব প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জমিন হলো জন্মভূমি।

জনগণের সাথে সম্পর্ক

এক মায়ের সন্তানদের মধ্যে যেমন একটা বিশেষ ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেয়, তেমনি এক দেশে জন্মলাভের দরুনও দেশবাসীর মধ্যে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ... মাকে কেন্দ্র করে যেমন পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে, তেমনি জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে দেশভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জন্মে। তাই নিজ দেশের সকল মানুষই অন্য দেশের মানুষের তুলনায় অধিকতর আপন মনে হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি

বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহাপ্লাবন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সরকারি অপচেষ্টা এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবোধের নিকট যেভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তির সুস্পষ্ট সন্ধান দেয়। বাংলাদেশ এখন আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ হিসেবে গৌরববোধ করে। ... বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের কলঙ্কস্বরূপ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উল্লেখ ছিল দেশবাসীর ইসলামী চেতনাবোধ তা বরদাশ্ত করেনি। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ভিত্তি অত্যন্ত মযবুত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ

১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লব ও ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসকদের হুঁশিয়ার করে দিল যে, একনায়কত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতন্ত্র এ দেশের মাটিতে স্থান পাবে না; দেশের সত্যিকার ক্ষমতা জনগণের হাতেই তুলে দিতে হবে এবং অবাধ জনমতের ভিত্তিতেই সরকার গঠন করতে হবে। ...

যারা শক্তি প্রয়োগের হুমকি ও অস্ত্রের রাজনীতি করতে চায়, তারা গণতন্ত্রকে ভয় পায়। বাংলাদেশে এ ধরনের মনোবৃত্তি যাদের আছে, তাদেরকে গণদুশমন হিসেবে চেনার যোগ্যতা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করা গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদেরই দায়িত্ব।

জামায়াতের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

জামায়াতে ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে কর্মতৎপরতা চালাবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াত কেমন আচরণ করা যথার্থ মনে করে এবং দেশে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের নীতিমালা মেনে চলা কর্তব্য মনে করে, সে সম্পর্কে জামায়াতের এ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা কর্তব্য মনে করি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক

বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে আমরা এ কারণেই শ্রদ্ধা করি যে, তারাও দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, দেশকে উন্নত করতে চান, দেশের সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী এবং জনগণের কল্যাণকামী। তারা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নন, গোটা দেশের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের লোকদের সঠিক প্রচেষ্টায়ই একটি দেশ সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা দেশ গড়ার চিন্তাই করেন না; যারা কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠায়ই ব্যস্ত, তারা দেশের সম্পদ নয়, তারা দেশের আপদ। যারা শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতি করেন, তারা দেশের কলঙ্ক। আর যারা দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রশক্তির বলে জনগণের ওপর শাসক সেজে বসতে চায়, তারা দেশের ডাকাত।

সব রকম রাজনৈতিক দলের প্রতি সম্মানবোধ সত্ত্বেও সবার সাথে আমাদের সমান সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানদণ্ডে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১. যেসব দল ইসলামকে দলীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করেন,

২. যেসব দল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী,

৩. যেসব দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গড়তে চায়।

আমরা যেহেতু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু প্রথম শ্রেণীভুক্ত দলগুলোর সাথে আমাদের আদর্শিক সম্পর্কের দরুন তাদের সঙ্গে আমাদের নিম্নরূপ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

ক. ইসলামবিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের কারো ওপর হামলা হলে আমরা ন্যায়ের খাতিরে তাদের পক্ষে থাকব ও হামলা প্রতিহত করতে সাহায্য করব।

খ. ইসলামী দল হিসেবে যারা পরিচয় দেয়, তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব। এ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই দীনী ভাই হিসেবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।

গ. ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য যেসব বিশেষ গুণ অপরিহার্য, সে বিষয়ে কোন দলের মধ্যে কোন কমতি বা ত্রুটি দেখা গেলে মহব্বতের সাথে সে বিষয়ে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে দেব। অনুরূপভাবে তারা আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা কবুল করব।

ইসলামী দল হিসেবে যারা পরিচয় দেয় :

ঘ. কোন সময় যদি কোন ইসলামপন্থি দল আমাদের বিরোধিতা করে, তবুও আমরা তাদের বিরোধিতা করব না। প্রয়োজন হলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় জবাব দেব।

ঙ. নির্বাচনের সময় তাদের সাথে দরকার হলে সমঝোতা করব।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দলগুলোর সাথে আমরা নিম্নরূপ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করব ঃ

ক. যেসব রাজনৈতিক দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে জীবনাদর্শ মনে করে না, তাদের সাথেও আমরা কোন প্রকার শত্রুতার মনোভাব পোষণ করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মত ও পথ বাছাই করার স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। আমরা তাদের মত ও পথকে ভুল মনে করলে যুক্তির মাধ্যমে শালীন ভাষায় অবশ্যই সমালোচনা করব।

খ. তাদের কেউ আমাদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করলেও আমরা আমাদের শালীনতার মান বজায় রেখেই জবাব দেব। গালির জবাবে আমরা কখনও গালি দেব না বা অন্যায় দোষারোপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করব না।

গ. দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যেসব কাজকে আমরা মঙ্গলজনক মনে করব, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযেগিতা করব।

সরকারি দলের সাথে সম্পর্ক

দেশের স্বার্থ এবং জনগণের কল্যাণের নামে সরকার যা কিছু করে তার সাথে সবাই একমত নাও হতে পারে। তা ছাড়া সরকার ভুল করছে বলে আন্তরিকতার সাথেই কেউ অনুভব করতে পারে। তাই সরকার তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা পরামর্শ হিসেবে যদি গ্রহণ করে, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে। যারা অন্ধভাবে সব সময় সরকারকে সমর্থন করে, তারা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে তা করতে পারে। আর যারা সব ব্যাপারেই বিরোধিতা করে, তারা বিরোধিতার জন্যই তা করে থাকে। আমরা এর কোনটাকেই গণতন্ত্রের সহায়ক ও দেশের জন্য কল্যাণকর মনে করি না।

সত্যিকার বিরোধী দলের আদর্শ ভূমিকাই আমরা পালন করতে চাই। সরকারের ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজের দোষ ও ভুল ধরিয়ে দেওয়াই আমাদের পবিত্র

দায়িত্ব। সৎ কাজে উৎসাহ দান ও অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা এ ভূমিকারই অঙ্গ। বিরোধীদলীয় ভূমিকার নামে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাকে আমরা জাতির সেবা মনে করি না। কিন্তু সরকার নিজেই যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ বেছে নেয় বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনসমর্থনের পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমাদের কর্তব্য মনে করব এবং তখন দেশ ও জনগণের স্বার্থে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করা আমরা ফরয মনে করব।

সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নীতিমালা

যারা রাজনীতি করেন, তাদের ওপরই ভালো-মন্দ প্রধানত নির্ভরশীল। ভ্রান্ত রাজনীতি গোটা দেশকে বিপন্ন করতে পারে। ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের দুর্গতির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে প্রতিযোগিতার এ দুনিয়ায় বাঞ্ছিত উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য :

১. সকল রাজনৈতিক দলকেই নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণই খিলাফতের (রাজনৈতিক ক্ষমতার) অধিকারী ও সরকারি ক্ষমতার উৎস।

২. গণতন্ত্রের এই প্রথম কথাকে স্বীকার করার প্রমাণস্বরূপ নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং এর বিপরীত আচরণ সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে। অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশকে সহজেই দুনিয়ায় নিন্দনীয় বানায়। তাই দেশের সম্মান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারি দলের।

৪. অভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা এবং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করাকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি ও লুটতরাজ মনে করে ঘৃণা করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থে লুটতরাজ ও গুণ্ডামি করাকে সবাই অন্যায় মনে করে। কিন্তু একশ্রেণীর ভ্রান্ত মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে এসব জঘন্য কাজকেই বলিষ্ঠ নীতি হিসেবে ঘোষণা করে। এ ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয়দাতাদের গণতন্ত্রের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

উপরিউক্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের আচরণের ওপর নির্ভরশীল। তাদের সহনশীলতা ও নিষ্ঠাই অন্যদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে। সরকারি দল ক্ষমতায় অন্যায়ভাবে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে যদি এ নীতিমালা অমান্য করে, তাহলে তাদের পরিণাম পূর্ববর্তী শাসকদের মতোই হবে– এ কথা তাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

১৯৯.

জামায়াতে একটা সাংগঠনিক সমস্যা সৃষ্টি হলো

সম্ভবত ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি দৈনিক সংগ্রাম ভবনে আমার সভাপতিত্বে একটা বৈঠক হচ্ছিল। বৈঠকে আইডিএল-এর কয়েকজন এমপি এবং জামায়াতের বেশ ক'জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। এটা জামায়াতের কোন ফোরামের বৈঠক ছিল না। ইনফরমাল ধরনের একটা বৈঠক চলছিল। বৈঠকে আইডিএল-এর চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এমপিও উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় কী ছিল, তা এখন মনে পড়ছে না।

হঠাৎ একপর্যায়ে আইডিএল-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সা'দ আহমদ এডভোকেট নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে ফেললেন। মাত্র মাস দেড়েক পূর্বে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইডেন হোটেলে তিন দিনব্যাপী সম্মেলন করে জামায়াতের স্থায়ী চার দফা কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করার উদ্দেশ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সা'দ আহমদ সাহেব উক্ত বৈঠকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "জামায়াত ও আইডিএল দুটো সংগঠনই রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। ইতঃপূর্বে যেহেতু জামায়াত ঐ চার দফা কর্মসূচির তিন দফার কাজ অপ্রকাশ্যে চালিয়ে গেছে, সেহেতু এখনও ঐ তিন দফার মধ্যেই জামায়াতের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। পূর্বের মতোই চতুর্থ দফাটির কাজ আইডিএল-এর নামেই চলা উচিত। রাজনৈতিক ময়দানে দুটো সংগঠনের যুগপৎ তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন নেই।"

একান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ বিতর্ক সৃষ্টির কোন সুযোগ না দিয়ে আমি ঐ বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বললাম, "জামায়াতের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন বক্তব্য বিবেচ্য হতে পারে না। তাছাড়া এখানে এ বিষয়ে আলোচনার কোন সুযোগই নেই।" সা'দ সাহেব মন্তব্য করলেন, "সম্মেলনে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলে আমি সম্মেলনকে কনভিন্‌স্ করতে পারতাম।"

তাঁর মন্তব্যকে উপেক্ষা করে আমি বৈঠক অব্যাহত রাখলাম ও যথাসময়ে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। বৈঠক শেষে আমি মাওলানা আবদুর রহীমকে একান্তে বললাম, "আপনার ভাইস-চেয়ারম্যানকে এভাবে কথা বলতে নিষেধ করা দরকার। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজন রুকন হিসেবে তিনি কেমন করে এমন কথা বলতে পারেন?" মাওলানা বললেন, "আপনি প্রকাশ্যে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না বলেই এ কথা উঠেছে।"

আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, তিনি সা'দ সাহেবের অভিমতকে সমর্থন করছেন। আমি অবিলম্বে কর্মপরিষদের বৈঠক ডাকলাম। তখন কর্মপরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ১২ জন। বৈঠকে দেখা গেল, মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান সা'দ আহমদ সাহেবের মতের পক্ষেই রয়েছেন। আর বাকি ১০ জন ঐ মতের চরম বিরোধী।

মাওলানা আবদুর রহীম পাকিস্তান আমলে ১৩ বছর পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতের আমীর ছিলেন এবং বাংলাদেশ আমলেও আমার দেশে ফিরে আসার পূর্বে প্রায় দু'বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। জামায়াতের রুকন সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত তাঁর উপস্থিতিতেই গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ এখন তিনি ঐ সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করছেন না। আমি এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সমস্যা মনে করতে বাধ্য হলাম। সাদ আহমদ সাহেবের ভিন্ন মতকে আমি সামান্য গুরুত্বও দিতাম না। কিন্তু মাওলানার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কারণেই এ সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করা জরুরি মনে করলাম। বিষয়টির মীমাংসা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন বলে রমযান মাস সত্ত্বেও মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকা হলো। তখন সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন জনাব শামসুর রহমান। তাঁকে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিলাম। আগস্টের মাঝামাঝি শূরার বৈঠক বসে।

মজলিসে শূরার বৈঠক

মাত্র দু'মাস পূর্বে জামায়াতের রুকন সম্মেলন হয়ে গেল। রমযান মাসের অর্ধেক চলে গেল। রমযানের শেষদিকে শূরার সদস্যগণকে ঢাকা আসতে হল। হঠাৎ এমন কী কারণ ঘটল যে, এমন অসময়েই শূরার অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন হলো? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই অনেক সদস্যের পক্ষ থেকেই তোলা হলো। অবশ্য পরে তারা গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

আগে থেকেই ই'তিকাফের নিয়ত থাকায় আমি মজলিসে শূরায় অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলাম। ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে তিন দিনব্যাপী অধিবেশন বসল। সা'দ আহমদ সাহেব মজলিসে শূরার সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ঐ অধিবেশনে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানানোর জন্য সেক্রেটারি জেনারেলকে নির্দেশ দিলাম। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন, তাঁকে বক্তব্য রাখার সুযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে? আমি বললাম, যে ইস্যুকে ভিত্তি করে শূরার অধিবেশনে ডাকা হয়েছে, সে ইস্যুটি সা'দ সাহেবই তুলেছেন। এ বিষয়ে মাওলানা আবদুর রহীম তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। যদি তাঁকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া না হয়, তাহলে তিনি আবার বলার সুযোগ পাবেন যে, আমাকে বলতে দিলে মজলিসে শূরাকে কনভিন্স্ করতে পারতাম। আমার নির্দেশে সেক্রেটারি জেনারেল সা'দ আহমদ সাহেবকে অধিবেশনে যোগদানের জন্য দাওয়াত দিলেন।

তখন মজলিসে শূরার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪২ জন। মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ্ এমপি অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অধিবেশনে জনাব সা'দ আহমদ দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। মজলিসে শূরার সদস্যগণও অনেকেই দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করলেন। মতপার্থক্য থাকলে বক্তব্য দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক।

তৃতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত প্রদত্ত বক্তব্যে দেখা গেল, মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা আবুদস্ সুব্হান ছাড়া অন্য সবার অভিমত একই রকম। ঘোষণা করা হলো, সন্ধ্যার সময় উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। দেখা গেল, তারা দু'জন সন্ধ্যার বৈঠকে অনুপস্থিত।

সন্ধ্যার বৈঠকে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে সেক্রেটারি জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে মাস্টার শফীকুল্লাহর মতামত সংগ্রহ করলেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, চার দফা কর্মসূচি সম্পর্কে রুকন সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা-ই সঠিক।

মজলিসে শূরার অভিমতের যৌক্তিক ভিত্তি

আইডিএল যদিও কয়েকটি দলের নেতৃবৃন্দ একজোট হয়েই গঠন করেছিলেন, এক বছর পরই দলীয় কাউন্সিলের রিক্যুইজিশনে আহূত সভায় জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান ও মাওলানা আবদুস সুবহানকে সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। ফলে আইডিএল জামায়াতেরই একক সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জামায়াত নিজ নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারায় আইডিএল নামেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কারণ, তখন জামায়াত প্রকাশ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেনি।

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াত প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পর আইডিএল নামে কোন দলের প্রয়োজন অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু নির্বাচনে জামায়াতের ছয়জন লোক আইডিএল-এর নামে এমপি নির্বাচিত হওয়ার কারণে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আইডিএল নামটার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী নির্বাচন জামায়াতের নামেই করা হবে। তখন আইডিএল বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাজনৈতিক কর্মসূচি আইডিএল নামে পালন করেছে। জামায়াত প্রকাশ্যে কাজ শুরু করার পর চতুর্থ দফা বাদ দিলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে। এদেশে জামায়াতে ইসলামীই প্রথম ইসলামী রাজনীতি শুরু করেছে। রাজনীতি করা যে ইসলামের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য, সে কথা জামায়াতই প্রমাণ করেছে। রাজনৈতিক তৎপরতা ইসলামের জন্য জরুরি বলে মনে করা হতো না। পঞ্চাশের দশক থেকে ইসলামী রাজনীতি এদেশে চালু হয়েছে। ১৯৫৩ সালে নেযামে ইসলাম পার্টি ইসলামী রাজনীতি চর্চা শুরু করেছে।

এ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী নামে ময়দানে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে গিয়ে যদি রাজনৈতিক কর্মসূচি বাদ দেওয়া হয় তাহলে জামায়াতের কর্মীদের নিকটই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি রাজনৈতিক কর্মসূচি ত্যাগ করা হয় তাহলে জামায়াতে ইসলামী নামও পরিত্যাগ করতে হবে। তা না হলে এ নামে কাজ করতে গিয়ে জামায়াত এ প্রশ্নের জবাব দিতেই ব্যর্থ হবে যে, রাজনৈতিক দফা বাদ দেওয়া হলো কেন?

এসব কথা বিবেচনা করেই জামায়াতে ইসলামী বিগত সম্মেলনে ('৭৯-এর মে মাসে) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পাকিস্তান আমলে যে স্থায়ী চার দফা কর্মসূচি নিয়ে জামায়াত কাজ করেছে, সেসব কর্মসূচি পূর্ণরূপেই পালন করতে হবে।

মাওলানা আবদুর রহীমকে চিঠি দিলাম

মাওলানা আবদুর রহীম মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অনুপস্থিত ছিলেন বলে

জানার পর আমি তাঁকে চিঠি লিখলাম যে, ই'তিকাফে থাকার কারণে আপনার সাথে দেখা করতে যেতে পারলাম না। দেখা হওয়া খুবই জরুরি। মেহেরবানী করে আপনি এলে ভালো হয়। তিনি অনুরোধ রক্ষা করে মসজিদে এলেন।

তাঁকে বললাম, সা'দ আহমদ সাহেবের অযৌক্তিক দাবিতে আপনি একমত হওয়ার কারণে আপনার ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টির মীমাংসার উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হই। মজলিসে শূরার ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন জামায়াতের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছেন। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী মজলিসে শূরার রায়কে আশা করি আপনি মেনে নেবেন। তিনি মেনে নিতে রাজি হলেন না।

কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলে বিতর্কের পর অধিকাংশের রায়ই শূরার রায় হিসেবে গণ্য বলে জামায়াতের গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত। ভিন্ন মত পোষণকারীগণকেও ঐ রায়কে জামায়াতের রায় হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। এ নিয়ম মেনে না চললে সংগঠন চলতে পারে না। ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জনের রায় যদি বাকি দু'জন মেনে না নেন, তাহলে তাদের পক্ষে জামায়াতে শামিল থাকা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

মাওলানা সাহেব যখন মজলিসে শূরার রায় মেনে নিতে সম্মত হলেন না তখন আমি আফসোস করে বললাম, 'মাওলানা! আপনি আত্মহত্যা করলেন'।

আমি সেক্রেটারি জেনারেলকে নির্দেশ দিলাম, আপনি আরও একজন মজলিসে শূরার সদস্যকে সাথে নিয়ে মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা আবদুস সুবহানের সাথে সাক্ষাৎ করে শূরার রায় মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। যদি তারা তাতে সম্মত না হন তাহলে তাদেরকে শূরা থেকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিন।

জামায়াত তাদেরকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়

সেক্রেটারি জেনারেল জনাব শামসুর রাহমান জনাব মকবুল আহমদকে সাথে নিয়ে মাওলানা আবদুর রহীমের নাখালপাড়াস্থ বাড়িতে গেলেন। মাওলানা পদত্যাগ করতে সম্মত হলেন। ঠিক তখনই মাওলানা আবদুস সুবহান সেখানে পৌঁছলেন। তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে মাওলানা আবদুর রহীমও পদত্যাগ করলেন না।

জামায়াতের কর্মপরিষদ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিধান যারা মেনে চলতে অস্বীকার করেন, তাদের সংগঠনে থাকার অধিকার রহিত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জামায়াত তাদেরকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান শাখার আমীর থাকাকালে দীর্ঘ ১৩ বছর আমি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি। তাঁকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়ে আমি অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। মাওলানা আবদুস সুবহানও ইসলামী আন্দোলনে আমার ঘনিষ্ঠ পুরনো সাথী। তাঁর জন্যও মনে অনেক দুঃখবোধ করেছি।

মাওলানা আবদুস্ সুব্হানের প্রত্যাবর্তন

মাওলানা আবদুস সুবহান বহু বছর পাবনা জেলার আমীর ছিলেন। পাবনা জেলায় তিনিই জামায়াতের প্রাণ ছিলেন। জেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তার হাতেই তৈরি। তিনিই তাদের প্রিয় নেতা ছিলেন। তখন পাবনার জেলা আমীর ছিলেন মাস্টার আবদুস সাত্তার। জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরও তিনি মাওলানার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। জামায়াতের লোকেরা যেমন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তিনিও তাদের সাথে আগের মতোই আচরণ করতেন। আমি জেলা আমীরের মাধ্যমে তাঁর খোঁজ-খবর নিতাম ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার পরামর্শ দিতাম।

কয়েক বছর পর হঠাৎ একদিন মাওলানা আবদুস সুবহান আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে পুরনো বন্ধুর সাথে বুক মিলালাম। তিনি বললেন, আপনার সাথে স্বপ্নে দেখা হওয়ার পর না এসে পারলাম না। আমি তাঁকে জামায়াতে ফিরে আসার আহ্বান জানালাম। তিনিও অনুরূপ চিন্তা করছেন বলে জানালেন।

কিছুদিন পর মাওলানা আবার এসে হাজির। এবার মনস্থির করেই তিনি এসেছেন। বললেন, কয়েক দিন থেকে বার বার আপনার সাথে স্বপ্নে দেখা হচ্ছে বলে আর বিলম্ব করা গেল না। আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানা অল্প সময়ের মধ্যেই আবার রুকন হয়ে গেলেন। রুকন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তিনি অব্যাহতভাবে মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আসছেন।

আবদুল খালেক সাহেবের ইন্তিকাল

১৯৭৯ সালের আগস্টের প্রথম দিকে আবদুল খালেক সাহেব হঠাৎ করেই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। তিনি ডায়াবেটিস ও হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগেছিলেন। এ দুটো অসুখের জন্য তো অনেক দিন থেকেই তিনি ওষুধ খাচ্ছিলেন। এ দুটো অসুখ শুরু হলে আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না বলে ওষুধ ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এভাবেই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর উচ্চ রক্তচাপ নিম্নচাপে পরিণত হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এ কথা জানতে পেরে বিকেলে হাসপাতালে দেখতে যাব বলে স্থির করলাম। কিছুক্ষণ পরই পাশের বাসায় কে যেন ফোন করে আমাকে জানাতে বলল, হাসপাতালে আমার আপন এক লোকের মৃত্যু হয়েছে। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। পাশের বাসার লোকটা নাম বলতে পারলেন না।

কিছু সময় পরই কে যেন এসে কলিং বেল টিপলেন। বের হয়ে গেট খুলেই দেখলাম, মকবুল আহমদ সাহেব কাঁদছেন, কথা বলতে পারছেন না।

আমি জানতে চাইলাম, খালেক সাহেবের অবস্থা কী? তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, ওয়ার্ডের বাইরে বারান্দায় একটা চৌকিতে তিনি পড়ে আছেন, আর তাঁর ছেলে মাহফুয মেঝেতে বসে চৌকির কোণে তার আব্বার মাথার কাছে আকুল হয়ে কাঁদছে। আমি প্রিয় ভাই আবদুল খালেকের কপালে চুমু দিলাম। এরপর চোখ দিয়ে অবিরাম পানি পড়তে থাকল।

বেদনায়, শোকে ও দুঃখে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। এ কেমন মৃত্যু? অসুখের খবর পেলাম। আর দেখতে আসার আগেই চলে গেলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এমন মৃত্যুর জন্য তো সামান্য মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের অবস্থা তখন কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

জানতে পারলাম, তাঁকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। কী কারণে যেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতালে কোন খালি বেড ছিল না বলে রোগীর ভিড়ের কারণে তাঁকে বারান্দায়ই চৌকিতে রাখা হয়। নার্স হয়তো যথাসময়ে উপস্থিত ছিল না। অক্সিজেনের সাপ্লাই বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক হতে পারে না। তখন ইবনে সিনা হাসপাতালের মতো কোন ব্যবস্থা থাকলে তাঁকে সরকারি হাসপাতালের বারান্দায় এভাবে বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হতো না। এ কথা মনে হলে এখনো বেদনাবোধ করি।

আবদুল খালেক সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক

ইতঃপূর্বে আবদুল খালেক সাহেবের কথা যথেষ্ট লিখেছি, তবু আবার কিছু না লিখে পারছি না। তিনি আমার সমবয়সী ছিলেন। মাত্র ৫৭ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি চলে গেলেন।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত বহু দীনি ভাইয়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ মহব্বত রয়েছে। আমার মনে হয় তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। এর কারণ হলো :

১. জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি তাঁর কাছ থেকেই জানার সুযোগ পাই। ঘটনাক্রমেই হঠাৎ তার সাথে আমার দেখা। সে থেকেই আমার যোগদান। আমার জামায়াতে যোগদানের ঘটনা 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় খণ্ডে পরিবেশন করা হয়েছে।
২. কুরআন বোঝার টেকনিক বা কৌশলের সন্ধান সর্বপ্রথম তাঁর কাছেই পেয়েছি। এরপরই তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ হই।
৩. জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক পদ্ধতির যাবতীয় শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই বাস্তব ময়দানে হাতে-কলমে পেয়েছি। শুধু বই পড়ে এসব শেখা সম্ভব নয়।

বহু দিক দিয়েই তাঁর সাথে আমার মিল ছিল। যেমন–

১. আমার মতো তিনিও পিতার প্রথম সন্তান।
২. তাঁর কোন কন্যাসন্তান ছিল না, যেমন আমারও নেই।
৩. তাঁর বড় ছেলে ও আমার বড় ছেলে একই সালে ম্যাট্রিক পাস করে। (তাঁর বড় ছেলে আবদুল আওয়াল '৭১-এর ১৬ আগস্ট নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁর বৃদ্ধ পিতা বড় নাতির শোকে কাতর হয়ে যান)

আমার প্রিয়তম এ দীনি ভাইটিকে আল্লাহ তাআলা এত বেশি গুণের অধিকারী করেছিলেন, যা এক ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত বিরল। একটি বিষয়ে আমার বড়ই দুঃখ হয়

যে, তাঁর অনুপস্থিতির কারণে তাঁর ছেলেরা ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হলো না। তিনি বেঁচে থাকলে এমনটা হতো না বলে আমার ধারণা। তার মতো ইসলামী ব্যক্তিত্বের সন্তান তাঁর পথে এলো না বলে আমি বড়ই বেদনাবোধ করি।

আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু

ইসলামী আন্দোলনে বা যেকোনো আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঐ আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের নিকট চরম বেদনাদায়ক মনে হয়। মৃত্যু যেকোনো বয়সেই হয়। পরিণত বয়সের আগে নেতৃস্থানীয় কারো মৃত্যু হলে আন্দোলনের যে বিরাট ক্ষতি হয়, সে দিক বিবেচনা করেই এত বেদনাবোধ হয়।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে একজন নেতা তৈরি হতে বহু বছর লেগে যায়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে নেতার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে এবং তার মধ্যে বিভিন্ন গুণের বিকাশ হয়। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করার জন্য সমমানের আর একজন সহজে জোগাড় করা যায় না। আমার এ করুণ অভিজ্ঞতা বারবার হয়েছে।

মরহুম আবদুল খালেকের মতো বহুমুখী গুণের সমমানের লোক আর দেখিনি। ১৯৯২ সালে আমি জেলে থাকাকালে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী অল্প ক'দিনের অসুখেই ইন্তিকাল করেন। তার শূন্যস্থান এখনও পূরণ হয়নি। সিরাজগঞ্জের জেলা আমীর অধ্যাপক আবদুল খালেক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর নেতৃত্বে ঐ জেলায় যে গতিতে সংগঠন এগোচ্ছিল তা ব্যাহত হয়ে গেল। আধুনিক প্রকাশনীর দায়িত্বশীল জনাব আবদুল গাফ্ফারও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে অভাবও অপূর্ণ রয়ে গেল।

২০০.

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান হ্যাঁ-সূচক রায় পেলেও তাতে জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদা হাসিল হয়নি। দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার পূর্বে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট জরুরি। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

এ নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তখনও বিএনপি নামে দল সংগঠিত হয়নি। 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) নামে একটি দল গঠন করা হয়েছিল। এ দলটির নেতৃত্বে ছয়টি দলের একটি জোট 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' নামে গঠিত হয়। জেনারেল জিয়া এ ফ্রন্টের নমিনী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট'-এর নমিনী হিসেবে জেনারেল ওসমানী নির্বাচন করেন।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এক কোটিরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জেনারেল জিয়া বিজয়ী হন। ১২ জুন তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

উক্ত নির্বাচনে জনগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮০ সালে আমি সিলেটের সোলায়মান হলে (সাবেক জিন্নাহ হল) এক সুধী সমাবেশে আমার বক্তৃতার পর শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় একপর্যায়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী সিলেটের গৌরব হওয়া সত্ত্বেও সিলেটেও তিনি এত কম ভোট পেলেন কেন?' একজন প্রবীণ সুধী দাঁড়িয়ে বললেন, 'তিনি যদি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে না দাঁড়াতেন তাহলে সারা দেশের কথা বলতে পারি না, অন্তত সিলেটে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোট পেতেন।'

বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা

নির্বাচনে জেনারেল জিয়া তাঁর পক্ষে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক সমর্থন পেয়ে দারুণভাবে অভিভূত হন। জনগণ তাঁর প্রতি যে আস্থা জ্ঞাপন করেছে তাতে তিনি পরম আত্মপ্রত্যয়বোধ করেন এবং দেশকে গড়ে তোলার জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন। খাল কাটার কর্মসূচি উপলক্ষে তিনি গ্রামাঞ্চলে একটানা মাইলের পর মাইল হেঁটে জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সরকারি কর্মকর্তারা তাঁর সাথে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে অপারগ হয়ে গেলেও তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও দরদের বাস্তব পরিচয় পেয়ে জনগণ আরও উদ্বুদ্ধ হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার কর্মপ্রেরণা আরও বৃদ্ধি পায়।

বিএনপি গঠন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের পূর্বেই একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। রাজনৈতিক ময়দানে হঠাৎ নতুন কোন ব্যক্তিকে নেতার মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই জিয়াউর রহমানকে ময়দানে সক্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়েই নতুন দল গঠন করতে হয়।

যে ছয়টি দলকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল, সে ক'টি দলের নেতা ও কর্মীদের সমন্বয়েই বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (Bangladesh Nationalist Party—BNP) নামে একটি ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। এ নতুন দলের সভাপতির পদ জিয়াউর রহমানই দখল করেন। তিনি এ দলের সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করেন একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে; তিনি হচ্ছেন খ্যাতিমান চিকিৎসক ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

নবগঠিত বিএনপি'র অন্যতম নেতা ও প্রধানমন্ত্রী আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের বন্ধু শাহ আজিজুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম, ডা. বদরুদ্দোজা রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে দলের মহাসচিব নিয়োগ করা হলো কেন? তিনি বললেন, আমাদের সবার নিকট এটা একটা প্রশ্ন হলেও সবাই জিয়ার ইচ্ছাকেই মেনে নিলেন।

যে ছয়টি দলের সমন্বয়ে বিএনপি গঠিত হলো তাদের নাম ও দলীয় প্রধানের তালিকা নিম্নরূপ :

১. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল), যার নেতা ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার।
২. মওলানা ভাসানীর গঠিত ন্যাপ, যার নেতা ছিলেন জনাব মশিউর রাহমান যাদু মিঞা।
৩. মুসলিম লীগ, যার নেতা ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান।
৪. লেবার পার্টি, যার নেতা ছিলেন মাওলানা আবদুল মতীন।
৫. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), যার নেতা ছিলেন কাজী জাফর আহমদ।
৬. তফসিলি জাতি ফেডারেশন, যার নেতা ছিলেন রমরাজ মণ্ডল।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দল গঠনের পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাজনীতিতে দল গঠন অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাভাবিক পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. এক বা একাধিক ব্যক্তি দেশের উন্নয়ন ও জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কোনো পরিকল্পনা বা কর্মসূচি জনগণের বিবেচনার জন্য পেশ করে।

   অথবা, কেউ কোন রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শে বিশ্বাসী হলে এর ভিত্তিতে দল গঠনের উদ্যোগ নেয়।

২. উদ্যোগীদের প্রথম কাজ হলো, তাদের চিন্তাধারা জনগণের নিকট প্রকাশের পর এর সমর্থক সংগ্রহ করার চেষ্টা করা।
৩. একপর্যায়ে একটি এড্‌হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা দলের আহ্বায়কের ভূমিকা পালন করে এবং সমমনা ও সমচিন্তার লোকদের সম্মেলনে সমবেত করে।
৪. সম্মেলনে যারা উপস্থিত হন তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের নাম, পদাধিকারীদের তালিকা ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।
৫. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের সাংগঠনিক তৎপরতা চলতে থাকে।
৬. জাতীয় নির্বাচনের সুযোগ আসলে দলটি তাতে অংশগ্রহণ করে এবং এ দলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে সংসদে দলের পার্লামেন্টারি পার্টি গঠিত হয়।
৭. এভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক দল আইনগত স্বীকৃতি পায়। দলটি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলে ক্ষমতাসীন হয়।

বিএনপি গঠনের পদ্ধতি

দল গঠনের উপরিউক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিএনপি গঠিত হয়নি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দল গঠনের পর একপর্যায়ে দলটি ক্ষমতা লাভ করতে পারে। জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথমে ক্ষমতাসীন হন। তারপর সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক

শাসনে উত্তরণের প্রয়োজনে এ রাজনৈতিক দলটি গঠন করেন। অর্থাৎ দলের প্রধান ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দলটি গঠন করা হলো। এটা রাজনৈতিক দল গঠনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়।

সামরিক শাসনকর্তারা ক্ষমতায় গিয়ে বেসামরিক সরকারে উত্তরণের প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল গঠন করেন; কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সাধারণত ঐ দলের অস্তিত্ব থাকে না। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুসলিম লীগ নামটা দখল করেন এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ হিসেবে ঐ দলটিই তার ক্ষমতায় থাকাকালে সরকারি দলের মর্যাদায় ছিল। তাঁর পদত্যাগের পর ঐ দলটির স্বাভাবিক অপমৃত্যু ঘটে। শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতার দাপটে বাকশাল কায়েম করেন, তিনি নিহত হওয়ার পর এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাসীন হয়ে যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও তিনি রাজনীতিতে সংগ্রামের মাধ্যমে টিকে থাকার কারণে ঐ দলটি বিলুপ্ত হয়নি।

কিন্তু জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরও বিএনপি টিকে থাকা এবং আরও মজবুত হওয়ার আসল কারণ হলো, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে অবতরণ। এরশাদের স্বৈরশাসনের আমলে বেগম জিয়া রাজনৈতিক নির্যাতন সহ্য করে দলটিকে টিকিয়ে না রাখলে আর কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে দলটি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারত না। বেগম জিয়ার নেতৃত্বই দলটিকে সংহত রেখেছে। তা না হলে যেসব দলের সমন্বয়ে বিএনপি গঠিত হয়েছিল, সেসব দলের নেতাদের কোন একজনকে অন্য দলের নেতারা মেনে নিতে রাজি হতেন না। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর স্ত্রীকে রাজনৈতিক অঙ্গনে না নিয়ে আসা সত্ত্বেও বেগম জিয়া অদ্ভুত সাহসিকতা ও অদম্য হিম্মত প্রদর্শন করে রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্বের আসনে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হন। এটা সত্যি বিরল কৃতিত্ব। প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতায় বসে দল গঠন করেন। আর বেগম জিয়া ক্ষমতার বাইরে থেকে দলকে সংহত ও অগ্রসর করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেন।

এ কথা ঠিক যে, বেগম জিয়ার আসল পুঁজি ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিপুল জনপ্রিয়তা; কিন্তু রাজনীতিতে হঠাৎ অবতরণ করেও তিনি সংগ্রামী নেতার যোগ্য ভূমিকা পালন করে জিয়ার আমলের সরকারি দলটিকে জনগণের দলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এভাবেই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট একটি দল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করল।

বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় পরিচয়

পরিচয়ের প্রয়োজনেই মানুষ যে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে, সে রাষ্ট্রের নামেই তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় হয়। এ পরিচয়কে ইংরেজিতে Nationality বলা হয়। বাংলায় আমরা জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব বলে থাকি।

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তখন এ দেশবাসী ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকায় তারা ভারতীয় নাগরিক ছিল। পাসপোর্টে Nationality বা জাতীয়তা 'Indian'

লেখা হতো। এটা একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিচয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে এ এলাকাটি পৃথক হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে পাসপোর্টে জাতিগত পরিচয় হিসেবে 'Pakistani' লেখা হতো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে এ দেশ যখন 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো তখন দেশের নামের সাথে মিল রেখে পাসপোর্টে 'Bangladeshi' লেখাই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী বলে তারা দেশের নামের বদলে ভাষার ভিত্তিতে এ দেশবাসীকে বাঙালি জাতি গণ্য করে পাসপোর্টে 'Bengali' লেখার ব্যবস্থা করলেন। অথচ দুনিয়ার কোন দেশেই ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেওয়া হয় না। বহু দেশের ভাষা আরবী; কিন্তু নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ভাষার ভিত্তিতে নয়, রাষ্ট্রের নামের ভিত্তিতেই লেখা হয়। বহু জনগণের ভাষা ইংরেজি; কিন্তু নাগরিকদের পরিচয়ে ভাষার কোনো স্বীকৃতি নেই, রাষ্ট্রের নামেই নাগরিকগণ পরিচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা নিজেদের কখনো বাঙালি মনে করে না। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল না বলে তারা ৭০-এর নির্বাচনে রাজা ত্রিদিব রায়কে নির্বাচিত করে। ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিলেন বলে বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব উপজাতিদের বাঙালি হওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার ফলেই তাদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়; কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না।

এ দেশের নাম বাংলাদেশ। তাই স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বজনীন নিয়মে এ দেশের সকল ধর্ম ও ভাষার মানুষ এবং সকল উপজাতির লোক বাংলাদেশী নাগরিক। আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা ভাষাগত পরিচয়ে অবশ্যই বাঙালি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। আবার এ দেশের মুসলমানরা আদর্শিক পরিচয়ে মুসলিম।

'জাতি' শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়। মুসলিম জাতি, বাঙালি জাতি, পুরুষ জাতি, নারী জাতি, ইংরেজ জাতি, হিন্দু জাতি ইত্যাদি। একশ্রেণীর মানুষকে অন্য শ্রেণী থেকে পৃথকভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে 'জাতি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যখন মানবজাতি বলা হয়, তখন অন্য সকল জীব থেকে মানুষকে আলাদাভাবে বোঝায়। তাই বিশ্বের সকল বাংলাভাষীকে বাঙালি জাতি বলায় কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসরত সবাই বাংলাদেশী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বাংলাভাষীদের পৃথকভাবে বাঙালি জাতি বলা অর্থহীন।

জাতীয়তা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশীদের পাসপোর্টে জাতীয়তার কলামে বাঙালির বদলে বাংলাদেশী লেখা হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সূচনা কীভাবে হলো, এতে কাদের অবদান রয়েছে— এ বিষয়ে আমার জানার আগ্রহের কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করি। বিষয়টি আমার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি জানার প্রয়োজনবোধ করেছি।

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ ব্যাপক যোগাযোগ করে আমাকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হওয়ায় তাঁর প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। তাঁর পরিবেশিত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারি, ভাষাসৈনিক ও দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার এডিটর অধ্যাপক আবদুল গফুর থেকে জানা গেল, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে একদল বুদ্ধিজীবী ও লেখককে সমবেত করেন। সেখানে অধ্যাপক আবদুল গফুর উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তার পরিচয় কী, সে বিষয়ে সেখানে মতবিনিময় হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকের উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব আখতারুল আলম থেকে জানা গেল, প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর বাসভবনে সিনিয়র সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সেখানে জনাব আখতারুল আলম উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্টের পাশে প্রখ্যাত কলামিস্ট খন্দকার আবদুল হামীদ বসা ছিলেন। আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার সাহেবকে এ বিষয়ে একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেন। খন্দকার সাহেব প্রবন্ধ রচনার জন্য বই-পুস্তক সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন্য জনাব আখতারুল আলমকে অনুরোধ করলে তিনি ৮/১০টি পুস্তক সংগ্রহ করে তাঁকে দেন। এর মধ্যে জনাব আবুল মনসূর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রাহমান খাঁ প্রমুখ চিন্তাবিদগণের লিখিত পুস্তক ছিল।

খন্দকার সাহেব প্রবন্ধটি রচনা করে আখতারুল আলম সাহেবকে দেখতে দেন। ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে এক সুধী সমাবেশে খন্দকার সাহেব তাঁর রচনাটি পড়ে শোনান। সেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রখ্যাত কলাম লেখক জনাব হারুনুর রশীদ থেকে জানা গেল, ১৯৭৭ সালের ১০ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রচলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

খন্দকার আবদুল হামীদ

খন্দকার আবদুল হামীদের সাথে আমার পরিচয় হয় ১৯৭৬ সালের মে মাসে লন্ডনে। তিনি আমার লন্ডনস্থ ঠিকানা কেমন করে জোগাড় করলেন জানি না। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি আমার বাসায় পৌঁছলেন। তাঁর আবেগপূর্ণ আন্তরিকতায় অভিভূত হলাম। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। বাংলাদেশের রাজনীতি, স্বাধীনতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খোলামেলা মতবিনিময়ের মাধ্যমে তার সাথে বহু বিষয়েই আমার অভিন্ন চিন্তার কথা জানতে পেরে তাঁকে রীতিমতো ভালোবেসে ফেললাম।

তিনি বিনা খবরেই হাজির হন এবং একটানা কয়েক ঘণ্টা আলোচনায় অতিবাহিত করেন। তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। মেহমান হিসেবে তাঁর জন্য নতুন করে খাবার রান্না করার প্রয়োজন হয়নি। সৌভাগ্যবশত মাত্র দু'দিন আগে আমার স্ত্রী ছোট

দু'ছেলেসহ লন্ডন পৌঁছার কারণে ঢাকা থেকে রান্না করা কয়েক পদের ছোট ও বড় মাছ এবং কয়েক রকম গোশত প্রচুর পরিমাণে সাথে নিয়ে এসেছিলেন, যা দু'দিনেও ফুরিয়ে যায়নি।

আমি খাদ্যবিলাসী তো নই-ই বরং খুব কম পরিমাণই খেতে পারি। খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম, খন্দকার সাহেব খাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট এক্সপার্ট। তিনি খেতে থাকলেন এবং দেশের এত মজার খাবার লন্ডনে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে পরম তৃপ্তি প্রকাশ করলেন। আমার স্ত্রী একজন যোগ্য খানেওয়ালা পেয়ে খুব খুশি হলেন। আমার মতো অযোগ্যকে খাইয়ে তিনি মোটেই খুশি হন না। গিন্নিরা তাদের রান্নার প্রশংসা করার মতো খাওয়ার যোগ্য লোক পেলেই খুশি হয়।

১৯৭৮-এর জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি দৈনিক আজাদে 'মর্দে মুমিন' ছদ্মনামে কলাম লিখতেন। তাঁর লেখা মুমিনদের নিকট বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর 'মর্দে মুমিন' নামকরণ সার্থক। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিরাট অবদান রেখেছে।

লন্ডনে তাঁকে আমার ১৯৭৩ সালে লেখা 'বাঙ্গালী মুসলমান কোন পথে' নামে একটি চটিবই দিয়েছিলাম। আমি দেশে আসার পর দৈনিক আজাদে তাঁর এক লেখায় আমার ঐ বইটির উল্লেখ করে তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে তিনি যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন তাঁরই জেলার (শেরপুর) জনাব কামারুজ্জামান। ইনটেনসিভ কেয়ারে শায়িত ছিলেন তিনি। যন্ত্রের মধ্যে তাঁর হার্টের অবস্থা দেখা যাচ্ছিল। আমাকে দেখে হেসে বললেন, আমার হার্টের তামাশা উপভোগ করছি। মন্তব্য করলাম, এ অবস্থায়ও রসিকতা? পাশে তাঁর কন্যাও মুচকি হাসলেন। এ 'মর্দে মুমিনের' মৃত্যুতে সত্যিই বেদনাবোধ করেছি।

বাংলাদেশের মানুষ কোন্ জাতি?

সব মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি। কুরআনের মতে, আদম (আ) ও হাওয়া (আ) মানব জাতির আদি পিতা-মাতা। সাদা, কালো, পীতসহ সকল বর্ণের মানুষ ঐ দু'জনেরই বংশধর। দৈহিক আকৃতি ও চেহারার কাঠামোতে এত পার্থক্য একই পিতা-মাতার বংশধরদের মধ্যে কেমন করে ঘটল— এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গবেষণা করেও কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেননি।

আদম সন্তানদের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশে রক্তের চারটি গ্রুপ কেমন করে সৃষ্টি হলো এ রহস্যের উদ্ঘাটন কোনোদিন করা সম্ভব হবে কি-না কে জানে।

আল্লাহ তাআলার নিকট মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত- ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করেন। ঐসব গুণ তাঁরই সৃষ্টি। তিনি নবীগণের মাধ্যমে এসব গুণের ব্যাখ্যাদান করেছেন। যারা মনুষ্যত্ব তথা মানবোচিত

গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা করে তারা এক জাতি। যারা চেষ্টা করে না তারা ভিন্ন জাতি। আখিরাতে যথাক্রমে তারা বেহেশতবাসী ও দোযখবাসী হিসেবে গণ্য হবে।

এছাড়া আর কোন পার্থক্যের কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষে মানুষে কোন পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। দেহের বর্ণ, মুখের ভাষা, বংশ-গোত্র ইত্যাদির পার্থক্য শুধু পরিচয়ের জন্য। এগুলো মনুষ্যত্বগত কোন পার্থক্য নয়। আল্লাহ তাআলার নিকট এ পার্থক্য গণ্য নয়।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে নৃ-তাত্ত্বিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ছোট-বড় জনগোষ্ঠী এ দেশে বসবাস করে। ধর্মের দিক দিয়েও বিভিন্ন ধর্মে এ দেশের মানুষ বিভক্ত। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন হলেও অন্যান্য ধর্মের মানুষ কমপক্ষে ১ কোটি। এ অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ কোন্ জাতি? তাহলে বাংলাদেশের মানুষ কি বাঙালি না বাংলাদেশী? যুক্তির দাবি কী?

২০১.

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে প্রথম সংসদ নির্বাচন

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার বিপ্লবের ফলে হঠাৎ করেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে যান। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, অদম্য সাহস, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিষ্ঠাবান সৈনিকসুলভ জীবনাচার তাঁকে রাজনৈতিক শূন্য ময়দানে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

পাকিস্তানের জেনারেল আইয়ূব খান ও জেনারেল জিয়াউল হকের মতো বেশ কয়েক বছর তিনি সামরিক শাসন চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ দু'জন যেমন বেসামরিক সরকারকে অপসারণ করে সামরিক শাসন জারি করেন, জেনারেল জিয়া সামরিক স্বৈরশাসক হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সেভাবে ক্ষমতা দখল করেননি। ক্ষমতার শূন্য ময়দান তাকে টেনে এনে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ১৯৭৫-এর ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কোন সরকার ছিল বলে বোঝা যায়নি। সিপাহি-জনতার সুসংহত শক্তি তাঁকে দিয়ে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং শাসনতন্ত্র মুলতবি করে সামরিক শাসন জারি করেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বছর অতীত হওয়ার আগেই জেনারেল জিয়া রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দান করলেন, যাতে কম সময়ের মধ্যেই দেশে বেসামরিক সরকার কায়েম করা সম্ভব হয়।

১৯৭৭ সালের এপ্রিলে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ঘোষণা করে এর পক্ষে গণভোটের মাধ্যমে তিনি জনগণের সম্মতি লাভ করেন। এর এক বছর পরই ১৯৭৮ সালের জুন মাসে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা সুসংহত করেন। এরপর মাত্র আট মাসের মধ্যেই ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ

শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি আসনে মেহেরবানী করে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দান করা হয়।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দল বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন দখল করে নেয়; শেখ মুজিবের মতো প্রায় সব আসন দখল করেনি। 'দখল করে নেয়' বললাম এ কারণে যে, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বিজয়ী হতে পারেনি।

ঐ সংসদে আওয়ামী লীগের ৩৯, মুসলিম লীগের ১২ ও আইডিএল-এর ৬ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন। ছোট দলগুলোর সভাপতিগণ নির্বাচিত হয়ে আসেন। বিএনপি পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার শাহ আজিজুর রহমান থেকে জানলাম, ময়দানে রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ছোট দলগুলোর যেসব নেতা হৈচৈ করে তাদের নির্বাচিত করে সংসদে ঢুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এক নির্বাচনী কৌশল ছিল। তিনি তাদের ময়দানে লাফালাফি করতে না দিয়ে পার্লামেন্টে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। এটা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

এ পলিসির কারণেই ন্যাপ-এর অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, কৃষক-শ্রমিক পার্টির জনাব এ এস এম সুলায়মান, সর্বহারা পার্টির মুহাম্মদ তোয়াহা, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তোয়াহার আসনের নির্বাচনী ফলাফলে তিনি পরাজিত বলে রেডিওতে ঘোষণা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুনর্বার ভোট গণনার ব্যবস্থা করা হলে তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় সংসদের স্পিকার হন মির্জা গোলাম হাফিজ এডভোকেট এবং ডেপুটি স্পিকার হন ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ। লিডার অব দ্য হাউস ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টারি পার্টির অধিকাংশের সমর্থনে শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যাদু মিয়াকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে সিনিয়র মন্ত্রীর পদবি দান করেন।

এ সংসদে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ও সামরিক শাসনামলের যাবতীয় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুমোদন লাভ করে।

এ সংসদ একদিক দিয়ে বড়ই প্রাণবন্ত ছিল যে, সব দলের নেতারা এমপি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তাদের বক্তব্যের মান বেশ উন্নত ছিল। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা জনাব আসাদুয্যামান খান লিডার অব দ্যা অপজিশন হিসেবে শালীন পার্লামেন্টারিয়ানের পরিচয় দিতে সক্ষম হন।

ঐ সংসদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার খান আবদুস সবুর খানের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বিবেচিত হতো। তিনি নির্বাচনে তিনটি আসনে বিজয়ী হওয়ার কারণে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জনাব আতাউর রহমান খানের বক্তৃতাও সবাই শ্রদ্ধার সাথে শুনতেন। সব দলের নেতৃবৃন্দই যোগ্য বক্তা হিসেবে সংসদের মান উন্নত

করায় সহায়ক হন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান (২০০৫) সংসদে বিরোধী দলের ঐ মান আর বহাল নেই।

সংসদে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্নোত্তর

১৯৮০ সালে ন্যাপ-নেতা অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানকে প্রশ্ন করেন, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন। তিনি ভিসা নিয়ে এসেছিলেন। ভিসার মেয়াদ কি এখনও শেষ হয়নি? জবাবে মন্ত্রী বললেন, "তাঁর ভিসার মেয়াদ তো '৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে গেছে।"

আরও জোরে প্রশ্ন করা হলো, বিনা ভিসায় তিনি কেমন করে দেশে আছেন? মন্ত্রী বললেন, "তিনি নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য দরখাস্ত করেছেন। তা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।"

আইনানুযায়ী বিনা ভিসায় কোন বিদেশী নাগরিকেরই থাকার অধিকার নেই। নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ সরকারকে বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রশ্নকর্তা সে সম্পর্কে আর প্রশ্ন না করায় বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হয়।

মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এমপি প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে সাক্ষাতের এক সুযোগে আমার নাগরিকত্ব সমস্যা নিয়ে কথা বললে তিনি শান্তভাবে বললেন, আমাকে কিছু সময় দিন।

জনাব শেখ আলী আশরাফ লেবার পার্টির নেতা হিসেবে বিএনপিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সে হিসেবে তিনি বিএনপি সভাপতি জিয়াউর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগের সুযোগ পেতেন। তিনি একসময় আমার নাগরিকত্ব বহালের কথা তুললে প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন, 'এত বিরাট বিষয় নিয়ে এখন আলাপ করবেন না।'

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল

জেনারেল জিয়াউর রহমান একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় সরকারের প্রধান হয়ে থাকেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রীর পদ থাকা জরুরি নয়। কাউকে প্রধানমন্ত্রীর পদবি দিলেও তা সরকারপ্রধানের মর্যাদা হতে পারে না। তাই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

যে রাজনৈতিক দল সরকারি দলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, এর সভাপতিও জেনারেল জিয়াই ছিলেন। সর্বোপরি তিনি সশস্ত্র বাহিনীপ্রধানও ছিলেন। আমাদের শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট বেসামরিক ব্যক্তি হলেও তিনিই সশস্ত্র বাহিনীপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান ছিলেন বলে এ দিক দিয়ে বেসামরিক প্রেসিডেন্টের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিধর ছিলেন।

এভাবেই তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, সরকারি দলের প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান হিসেবে দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এক ব্যক্তির হাতে এত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে স্বৈরশাসক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিচক্ষণ ও ভারসাম্যপূর্ণ

মেজাজের অধিকারী ছিলেন বলে খামখেয়ালের বশে তিনি বিনা পরামর্শে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকৌশল সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সশস্ত্র বাহিনীকে অবহিত না করে তিনি বড় কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত নিতেন না। পরামর্শের জন্য তাঁর তিনটা ফোরাম ছিল। দলের উপদেষ্টাগণ, মন্ত্রিসভা ও তিন বাহিনী প্রধানসহ জেনারেলগণ।

যেসব বিষয়ে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা আছে, সেসব সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীকে অবহিত না করে তা বাস্তবায়িত হতে দিতেন না। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংশোধন বা পরিবর্তন করতেন। এর ফলে তাঁর সরকার সশস্ত্র বাহিনী, মন্ত্রিসভা ও সরকারি দলের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই কোনো মহলের সরকারি সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ঘটত না। তাঁর এ শাসনকৌশল তাঁকে স্বৈরশাসক হতে দেয়নি।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্র

শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি খতম করে একদলীয় স্বৈরশাসন চালু করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে রাজনৈতিক দলসমূহকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ দান করেন। এরপর দু'বছরের মধ্যে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর সাড়ে সাত মাস পর জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেন।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিধানই রাখা হয়। সে হিসেবে শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের পদে অন্য আর একজন থাকেন। এতে একনায়কত্বের পথে অন্তরায় থেকে যায় বলে শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা চালু করে নিজে প্রেসিডেন্ট হয়ে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করলেও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিই বহাল রাখেন।

নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সন্ধান

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের পরিচালনায় ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন শেখ মুজিব সরকারের পরিচালনায় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চেয়ে অবশ্যই অনেক উন্নতমানের ছিল। কিন্তু আমার পর্যালোচনায় ঐ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে ধারণা হয়নি। সরকারি দলের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হওয়ার ব্যবস্থা করা এ কথাই প্রমাণ করে।

নির্বাচনের পূর্বে শাহ আজিজুর রহমান আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্ট জানতে চান যে, আপনাদের কোন্ কোন্ প্রার্থীকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আপনারা বেশি আগ্রহী।

আপনাদের আগ্রহ অনুযায়ী সেসব আসনে বিএনপিপ্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য তিনি সিরিয়াস হবেন না। তিনি চান যে, সব দলের যোগ্য লোকেরা সংসদে আসুক।

আমি অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে তার হাতেই যোগ্য প্রার্থীদের একটা তালিকা দিলাম। সঠিক সংখ্যা মনে নেই। তবে সংখ্যা খুব বড় ছিল না। নির্বাচনের পর্যালোচনায় লক্ষ্য করলাম, দলীয় প্রধান হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীমের আসনে প্রেসিডেন্ট জিয়া বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে অভিযান চালাননি। কারণ সকল দলের প্রধানকেই তিনি সংসদে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার দেওয়া তালিকার প্রায় সকল আসনেই তিনি স্বয়ং বিএনপিপ্রার্থীর পক্ষে অভিযান চালিয়েছেন। নির্বাচনের পর বুঝতে পারলাম, তালিকা দেওয়াটা মস্তবড় ভুল হয়েছে। আমাদের সাথে রীতিমতো প্রতারণা করা হয়েছে। আমাদের যোগ্য লোকদের বিজয়ী না হওয়ার ব্যবস্থা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। আমার এ ধারণাও জন্মেছে যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেনি।

আমি তখন সিরিয়াসলি ভাবতে লাগলাম, নির্বাচনকে সরকারদলীয় পক্ষপাতিত্ব থেকে কেমন করে মুক্ত রাখা যায়। ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন এ দেশে নিরপেক্ষ হতে পারে না বলে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মে।

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নিরপেক্ষ শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন অবাধ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে। সেখানে দলীয় সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গতানুগতিক সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। দলীয় মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয় বলে প্রধানমন্ত্রী দলীয় সরকারের মতো ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারেন না। নির্বাচন কমিশনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় না বলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়।

আমাদের দেশে ঐ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র নতুন করে শুরু হচ্ছে মাত্র। ক্ষমতাসীন দলের পরিচালনায় অদূর ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না। এ পরিস্থিতিতে ঐ ঐতিহ্য গড়ে তোলার প্রয়োজনে বিকল্প চিন্তা করা ছাড়া উপায় নেই।

অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি

আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'কেয়ারটেকার সরকার' কথাটি চালু আছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের পূর্বে যখন পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়, তখন মন্ত্রিসভাও বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচনের পরবর্তী সরকার কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের গতানুগতিক দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট পূর্ববর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকেই দায়িত্ব অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। নির্বাচন চলাকালীন এ সরকারকে অন্তর্বর্তী (Interim) সরকার বা কেয়ারটেকার সরকার বলা হয়।

আমি হিসাব করে দেখলাম, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের পরিচালনায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বিগত নির্বাচনের মতোই হবে। পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমি ভাবলাম যে, যদি জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষে শুধু নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে

নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা একটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করা হয় তাহলে নির্বাচনকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ করা সম্ভব।

এ চিন্তার ভিত্তিতে আমি প্রস্তাবনা আকারে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের নিম্নবর্ণিত রূপরেখা প্রণয়ন করি ঃ

১. সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। বিচারপতি হিসেবে বহু বছর কর্মরত থাকার পরই যথেষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিই প্রধান বিচারপতি হন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে উচ্চমানের জুডিশিয়াল মাইন্ড গড়ে ওঠে। বিচারপতি হওয়ার পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক থেকে থাকলেও এর প্রভাব তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। দীর্ঘকাল বিচারের এজলাসে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার প্রভাবই প্রাধান্য পায়।

   নির্বাচনপরবর্তী সরকারের নিকট সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কর্মরত প্রধান বিচারপতির মতো নিরপেক্ষ না-ও হতে পারেন। কিন্তু কর্মরত প্রধান বিচারপতি পরবর্তী সরকার গঠনের পর পূর্বের দায়িত্বে ফিরে যাবেন বলে তার মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সৃষ্টির কোন আশঙ্কা থাকে না। এ বিবেচনায় কর্মরত প্রধান বিচারপতিই নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। তাই প্রেসিডেন্ট কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান নিয়োগ করবেন।

২. প্রধান বিচারপতি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের (পদবি যা-ই হোক) দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রিসভার আদলে অরাজনৈতিক ও টেকনোক্র্যাট দল-নিরপেক্ষ লোকদের সমন্বয়ে তার সরকার পরিচালনার জন্য একটি যোগ্য টিম মনোনীত করবেন। তার সুপারিশে প্রেসিডেন্ট তাদের নিয়োগ করবেন। এ টিমের কোন ব্যক্তি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৩. সরকারপ্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

৪. নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ সরকারের সকল নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

৫. কেয়ারটেকার সরকারকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফলতা অর্জন করার জন্য প্রেসিডেন্ট সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

জামায়াতের কর্মপরিষদে কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি কর্মপরিষদের বৈঠকে আমি কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলাটি বিবেচনার জন্য পেশ করি। কর্মপরিষদ সদস্যগণ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনায় অংশ নেন। বিস্তারিত আলোচনার পর পেশকৃত ফর্মুলাটি সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করা হয়।

নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে বিধায় জামায়াত কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনাকে রাজনৈতিক মহলে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর ফর্মুলাটি প্রকাশ করেন। নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ প্রস্তাবনায় কর্মীগণ অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেন।

নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটি গঠন

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর হওয়া সত্ত্বেও সরকার আমার নাগরিকত্ব স্বীকার না করা পর্যন্ত প্রকাশ্য ময়দানে আমীরের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। জামায়াতের জন্য এটা বিরাট সমস্যা ছিল। আমার নাম আমীর হিসেবে প্রকাশ করা যাচ্ছিল না। আমি জামায়াতের জনসভায় বক্তব্য রাখতে পারছিলাম না। জামায়াত আমাকে বাদ দিয়ে আর কোন ব্যক্তিকে আমীর নির্বাচিত করতেও প্রস্তুত ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী আমার নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। জামায়াত উপলব্ধি করল, জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই সরকার আমার নাগরিকত্ব বহাল করছে না। তাই জামায়াত ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্মপরিষদে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল কমিটি গঠন করে। জুলাই মাসে কর্মপরিষদে সিদ্ধান্ত হয়, কমিটির নাম হবে 'নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটি'। মাওলানা আবদুল জব্বারকে কমিটির সভাপতি ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সেক্রেটারি করা হয়।

জামায়াত এ নিয়ে আন্দোলন করার সাথে সাথে ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি নিয়ে ময়দানে তৎপর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা তখন সমীচীন মনে করা হয়নি। এ বিষয়ে আন্দোলনের পূর্বে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে লবি করাই তো প্রথম কাজ।

২০২.

জামায়াতে ইসলামীর ৭ দফা গণদাবি

১৯৭৯ সালের মে মাসে এক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে এবং ঐ বছরই সারা দেশে সংগঠন সক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। সাত বছর প্রকাশ্যে সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন না করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর রহমতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জামায়াতের সর্বস্তরের কর্মীগণ ইসলামী দাওয়াত প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সংগঠন সম্প্রসারণে তৎপর হন।

১৯৮০ সালের শুরু থেকে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে পার্শ্ব-সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চালু হয়।

জামায়াত যে সামগ্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যে গঠিত, তাতে পেশাভিত্তিক সংগঠন অপরিহার্য। প্রায় ছয় মাস এসব সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চলার পর ইসলামী বিপ্লবের একটা সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৮০ সালের নভেম্বরে জামায়াতের কর্মপরিষদে 'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি' নামে একটি সার্থক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দফা ৭টি নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে,

২. ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে,

৩. বাংলাদেশের আযাদীর হেফাযত করতে হবে,

৪. আইন-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবে,

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে,

৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে,

৭. কুরআন-হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে।

বাংলাদেশের উপযোগী রাজনৈতিক পদ্ধতি

১৯৮০ সালেই জামায়াত দুটো ইস্যুকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। একটা হলো আমার নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার ও দ্বিতীয়টা হলো বাংলাদেশের উপযোগী একটি পলিটিক্যাল সিস্টেম।

ঐ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবের স্বৈরতন্ত্র ও একদলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করলেও আসলে একনায়কত্বই কায়েম ছিল। একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, সরকারদলীয় প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান হওয়ার ফলে তিনি সংসদ ও মন্ত্রিসভাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এমন পরিবেশে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারে না। প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও তিনি সংসদের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের সংসদ এক ব্যক্তির মর্জিতে পরিচালিত হলে তা গণতন্ত্রের দাবি পূরণ করে না।

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে থিওরি হিসেবে প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারি সিস্টেম উভয়টিকেই গণতান্ত্রিক বলে স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ঐ ধরনের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু নেই। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক বলে স্বীকৃতির সুযোগে তৃতীয় বিশ্বের ডিক্টেটররা নিজেদেরকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্রের অনুসারী বলে দাবি করছে এবং গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একক বৈশিষ্ট্য। এ পদ্ধতি সে দেশের ইতিহাসের সৃষ্টি। ১৩টি পৃথক রাষ্ট্র মিলে এ রাষ্ট্রের জন্ম। ১৩টি রাষ্ট্র এক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ১৩টির পৃথক সত্তা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সেগুলোর নাম 'State' (রাষ্ট্র)

রাখা হয়েছে; 'Province' (প্রদেশ) নামকরণ করা হয়নি। ফেডারেল সিস্টেম অব গভর্নমেন্টও ঐ ইতিহাসেরই সৃষ্টি। পরবর্তীকালে দুনিয়ার বহু বৃহৎ রাষ্ট্র দেশকে প্রশাসনিক খণ্ডে বিভক্ত করে ফেডারেল শাসন পদ্ধতি চালু করেছে। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি হুবহু নকল করতে পারেনি।

আমেরিকান পদ্ধতিতে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের ডিক্টেটর হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ আমেরিকার সিনেট অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে সিনেটের অনুমোদন নিতে হয়। আমেরিকান কংগ্রেসের কমিটি সিস্টেমও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। সে দেশের জন্ম যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে, তারই প্রভাবে এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে; যা অন্য কোনো দেশে প্রযোজ্য হয়নি।

তাই অবাধ গণতান্ত্রিক শাসন সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সহজ ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপ্রধান শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে সরকারি ক্ষমতার ভারসাম্য বহাল রাখার দায়িত্ব পালন করেন। আর সরকারপ্রধান তার মন্ত্রিসভাসহ জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্টের আস্থা ও সমর্থন নিয়ে দেশ শাসন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট এর মীমাংসা করে। এভাবে সংসদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of Power) রক্ষা হয়ে থাকে। স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের কোন সুযোগ থাকে না। প্রতি চার বা পাঁচ বছর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা তো আছেই।

বাংলাদেশের তখনকার পলিটিক্যাল সিস্টেম সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর অভিমত

১৯৮০ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশের তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। জামায়াত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের আস্থা অর্জন করে দেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে উন্নীত করতে চায়। তাই দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম না হলে জামায়াতের ঐ লক্ষ্য হাসিল হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তখন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারক। মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় ছিল না। সরকারি দলে তার নেতৃত্ব স্থায়ী। আর কোন নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে না। এ অবস্থায় পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল যে ১৯৭৯ সালের অনুরূপই হবে, তা নিশ্চিতই বলা যায়। এ ব্যবস্থা শেখ মুজিবের বাকশালের মতো না হলেও তাকে কিছুতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে না।

তাই জামায়াত দেশবাসীর সামনে বাংলাদেশের উপযোগী একটি পলিটিক্যাল সিস্টেম পেশ করার প্রয়োজনবোধ করে। ঐ সিস্টেম কেমন হওয়া উচিত, তাও আমি কর্মপরিষদে পেশ করি। কর্মপরিষদে গোটা সিস্টেম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হলেও

কেয়ারটেকার সিস্টেম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যা জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রিনে পেশ করেন।

পলিটিক্যাল সিস্টেমের প্রস্তাবনা

কর্মপরিষদে আমি প্রস্তাবনা আকারে বাংলাদেশের উপযোগী পলিটিক্যাল সিস্টেমের নিম্নরূপ রূপরেখা পেশ করি; যা বিস্তারিত আলোচনার পর গৃহীত হয়।

১. এ দেশের জন্য সংসদীয় পদ্ধতিই উপযোগী প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়।

২. প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। দেশ শাসনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে না। তিনি সরকারকে উপদেশ দিতে পারবেন।

৩. জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ দেশ শাসন করবে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

৪. বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের মধ্যে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বা কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এর মীমাংসা করবে।

৫. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করবেন।

৬. নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচন পরিচালনা করবে।

৭. প্রেসিডেন্ট জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

ব্রিটেনে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির মডেল যেমন আমেরিকা, তেমনি সংসদীয় পদ্ধতির মডেল হলো ব্রিটেন। ব্রিটেনে এককালে রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। রাজা বা রানীই রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান ছিলেন। দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর যখন সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্রিটিশ ক্রাউন (রাজা বা রানী)-কেই যথার্থ মনে করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত, ব্রিটিশ কেবিনেট সরকার পরিচালক এবং প্রাইম মিনিস্টার সরকারপ্রধান।

রাষ্ট্রপ্রধান কোন দলের নয় বলে নিশ্চিতভাবে নিরপেক্ষ। রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী একজন রাজা বা রানী ব্রিটিশ ক্রাউনের দায়িত্ব পালন করেন। আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত ব্রিটেনে মাঝে মাঝে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেউ কেউ আপত্তি তুললেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রাজপরিবারের সদস্যকে

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্থায়ীভাবেই মেনে চলছে। এ রাজপরিবার জনগণের মধ্যেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে স্বীকৃত। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতি কোন সময়ই সে দেশে বিবেচনাযোগ্য মনে করা হয়নি।

ব্রিটিশ ক্রাউন ইউ.কে. (ইউনাইটেড কিংডম) রাষ্ট্রটির ঐতিহাসিক গৌরবের সম্পদ হিসেবে গণ্য। বিশ্বের ৩৪টি রাষ্ট্র ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। এ কমনওয়েলথের ঐক্যের প্রতীকই ব্রিটিশ ক্রাউন। কমনওয়েলথের বেশ ক'টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে ব্রিটিশ ক্রাউনই নিয়োগ করেন ঐসব দেশের সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী। এভাবে বিশ্বে ব্রিটিশ ক্রাউন বিরাট মর্যাদার অধিকারী। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পাউন্ডের নোটে ও ডাকটিকিটে রাজা বা রানীর ছবি জনগণের নিকট অতি প্রিয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য এবং ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ীই এ দেশে সংসদ নির্বাচন হয় ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের জুন মাসে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হয়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় সংসদীয় পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেখ মুজিব একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের উভয় পদ দখলের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনের পর সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল সকল রাজনৈতিক দল সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে একমত হওয়ায় শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়।

বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। সংসদে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সে দলের মনোনীত ব্যক্তিই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। তাই তিনি কোন একটি দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হলেও সকল দলের নিকট আস্থাভাজন না-ও হতে পারেন।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্টের এমন মর্যাদা থাকা উচিত, যাতে তিনি শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারেন, সরকারের ভুল-ভ্রান্তি হলে উপদেশ দিতে পারেন এবং সরকার তাকে সমীহ করা প্রয়োজনবোধ করে।

বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাতে প্রেসিডেন্ট সরকারি দলের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতির চেয়েও তার মর্যাদা কম। কারণ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এ দু'জনকে অপসারণ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। কিন্তু সরকারি দল প্রেসিডেন্টের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে; যেমন ২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বেলায় হয়েছে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেন। এ ভাষণ মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। এটা বিস্ময়কর ও অপমানজনক। সরকার অপছন্দ করতে পারে এমন কোন বক্তব্য দেওয়ার

ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টের নেই। সংসদে প্রধানমন্ত্রীই তো সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন। সরকারের পক্ষে যা বলা প্রয়োজন এর জন্য প্রধানমন্ত্রীই যথেষ্ট। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সরকারের পক্ষে ওকালতি করানো একেবারেই বেমানান। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের মুরব্বী হিসেবে বক্তব্য দিলে তা সরকারি দল ও বিরোধী দলের জন্য, এমনকি জনগণের নিকটও মূল্যবান পরামর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রানী এলিজাবেথ কেবিনেটের অনুমোদন নিয়ে ভাষণ দেন না। ভারতের প্রেসিডেন্টকেও বাংলাদেশের মতো অনুমোদন নিতে হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্য মর্যাদা ভোগ করেন না।

প্রেসিডেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি কী হওয়া উচিত?

সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেল যুক্তরাজ্য হলেও তাদের মতো ক্রাউন আমরা কোথায় পাব? অস্ট্রেলিয়ার মতো রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিটিশ ক্রাউন কর্তৃক নিযুক্ত হওয়াও আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র হওয়ায় সে দেশের প্রেসিডেন্ট সকল প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত বিধায় সরকারি দলের কৃপার পাত্র নন। বাংলাদেশের সরকারি দলের মতো প্রেসিডেন্টকে এত সহজে সেখানে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ফেডারেল রাষ্ট্র নয় বলে ঐ পদ্ধতিতেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের জন্য এমন মর্যাদাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে হলে তাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত করা প্রয়োজন। তাহলে প্রেসিডেন্টকে সরকারি দলের কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না। ১৯৭৮ সালে জনগণ অতি উৎসাহের সাথে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলে ব্রিটিশ ক্রাউনের মতো মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের জন্য পৃথক নির্বাচনে অনেক ব্যয় হওয়ার অজুহাতে এ নির্বাচনে আপত্তি করা অযৌক্তিক। যদি এ ব্যয়কে বিরাট বোঝা মনে করা হয়, তাহলে সংসদ নির্বাচনের সাথেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা সম্ভব। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচনে একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন হয়ে থাকে। তবে জাতীয় সংসদের মেয়াদ ও প্রেসিডেন্টের মেয়াদ একই সময় শেষ না হলেই ভালো হয়। সে হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পৃথকভাবেই হওয়া উচিত।

নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলন

আগেই উল্লেখ করেছি, সরকার আমার নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারটা রাজনৈতিক কারণেই ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি এ দেশের নাগরিক না হলে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? আইনগতভাবে আমার অবস্থান অত্যন্ত মযবুত। কারণ আমি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দেশ থেকে বের করার কোনো ক্ষমতা সরকারের নেই।

তাহলে নাগরিকত্ব কেন বহাল করা হচ্ছে না? জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া এর আর কী কারণ থাকতে পারে? জামায়াতের নির্বাচিত আমীর হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পথে এ মহাপ্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পত্রিকায় 'নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করা হয়।

নাগরিকত্ব বহালের দাবির প্রতিক্রিয়া

১৯৭৮-এর জুলাই-এ দেশে ফিরে আসার পর থেকে ১৯৮০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত আমি বিনা বাধায় জামায়াতের দায়িত্ব পালন করছিলাম। প্রথম দিকে সদরঘাট, বঙ্গবাজার, বায়তুল মুকাররম ইত্যাদি বাজারে আমার পূর্বপরিচিত দোকানে কেনাকাটা করতে গিয়ে কোন সমস্যাবোধ করিনি। নিরাপত্তার জন্য সাথে লোকজন নেওয়ারও প্রয়োজনবোধ করা হয়নি।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে ফজলুল হক হলে এক উৎসবমুখর প্রোগ্রামে দাওয়াত পেয়ে আমি যোগদান করি। ১৯৪০ সালে এ হলের জন্ম। '৮০ সালে ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কমিটির সেক্রেটারি জনাব মেসবাহুদ্দীন আমার নিকট দাওয়াতনামা পাঠালেন। হলে তিনি আমার সিনিয়র হলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি হলের ভিপিও ছিলেন। তার দাওয়াতে হলে গেলাম। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জিল্লুর রহমান আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি তো একজন বিতর্কিত ব্যক্তি।' আমি বললাম, সবাই কি বিতর্কিত হয়? গুরুত্বপূর্ণরাই তো বিতর্কিত হয়ে থাকে। হলের প্রভোস্ট অত্যন্ত সৌজন্য প্রদর্শন করলেন। অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হলো। খুব ভালো লাগল।

কিন্তু আমার নাগরিকত্ব বহালের দাবিতে সংগ্রাম কমিটির বিবৃতি পত্রিকায় বের হওয়ার পরই বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে গেল। তখন জিয়াউর রহমান সরকারের অনুমোদিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানাল। আমার নিরাপদে চলাফেরা করার সুযোগ আর রইল না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি ছিলেন কর্নেল নুরুজ্জামান ও সেক্রেটারি ছিলেন নাঈম জাহাঙ্গীর। আমাকে কেন্দ্র করে জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির সিলসিলা শুরু হয়ে গেল।

২০৩.

রমনা গ্রিনে কর্মী সম্মেলন

১৯৮১ সালের ৩০ জানুয়ারি রমনা গ্রিনে এক কর্মী সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান 'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি' বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহকারে পেশ করেন এবং ঘোষণা করেন, দফাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই ইসলামী আন্দোলন চলবে।

'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি' শিরোনামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে 'সাত দফা দাবি কার কাছে?'— এ প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব দেওয়া হয়েছে :

প্রথমত, এ দাবি সরকারের নিকট। যদি তারা এসব দাবি পূরণের চেষ্টা করেন তাহলে জামায়াত তাদের সাথে সহযোগিতা করা ফরয মনে করবে।

দ্বিতীয়ত, এ দাবি জনগণের নিকট। আপনারা এসব দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে জামায়াতের সাথে আন্দোলনে শরীক হোন।

তৃতীয়ত, যারা বিভিন্নভাবে দীনের খেদমত করেছেন, জামায়াত তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, এসব দাবি আদায়ের আন্দোলন না করলে ভবিষ্যতে দীনের খেদমতের সুযোগও থাকবে না।

চতুর্থত, ছাত্র সমাজকে এ বিপ্লবী দাবির পতাকাবাহী হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

পঞ্চমত, কৃষক সমাজকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, এ ৭ দফা দাবির মাধ্যমেই তাদের সকল অধিকার বহাল হবে।

ষষ্ঠত, শ্রমিক সমাজের সত্যিকার মুক্তির জন্যই ৭ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

সপ্তমত, মহিলা সমাজ জনগণের অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর দেওয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই সঠিক মর্যাদা ফিরে পাবেন।

এভাবে জামায়াত দেশবাসী সকল মহলকে ইসলামী বিপ্লবের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

৭ দফার বিস্তারিত দাবি

৭ দফা দাবির প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা হিসেবে কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে এবং ৭ দফার মোট ২৯টি পয়েন্ট দাবিগুলোর বাস্তবরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। নিম্নে দাবিগুলোকে ঐসব পয়েন্টসহ পরিবেশন করছি; যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ এর ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারেন।

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. কুরআন-সুন্নাহর আইন জারি করতে হবে।

গ. প্রচলিত আইনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

ঘ. মুসলিম-অমুসলিম সকলের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে হবে।

২. ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে

ক. খোদাবিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করতে হবে।

খ. সৎ ও যোগ্য লোকদের শাসনক্ষমতা দিতে হবে।

গ. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের আযাদির হেফাজত করতে হবে

ক. জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে।

খ. রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত বানাতে হবে।

গ. মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে।

ঘ. যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. মুসলিম-জাহানের ঐক্য-প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

৪. আইন ও শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবে

ক. জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে হবে।

খ. সমাজবিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

গ. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে

ক. সরকারকে ভাত-কাপড় ও বাসস্থানসহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।

খ. জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গ. মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।

ঘ. পরিবার-পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্রধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

ঙ. সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, শোষণ, দুর্নীতিসহ যাবতীয় যুলুম খতম করতে হবে।

৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে

ক. সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

খ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে। মফস্বল এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিবাদে এ দাবি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে টঙ্গী এলাকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

গ. মাদরাসা শিক্ষার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।

ঘ. শুক্রবারকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে।

ঙ. অপসংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭. কুরআন-হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে

ক. মহিলাদের ইসলামসম্মত মর্যাদা দিতে হবে।

খ. মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গ. মহিলাদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

রমনা গ্রিনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী সম্মেলন

ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে। ১৯৮১ সালের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি রমনা গ্রিনে তাদের প্রথম দেশভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র ২০ হাজার কর্মী সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এক মিছিল হয়। কর্মীরা দু'সারিতে রাস্তায় দু'পাশ দিয়ে নীরবে রমনা পার্ক থেকে সদরঘাট পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। তাদের হাতে প্ল্যাকার্ডে আন্দোলনের স্লোগান ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী লেখা ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কারণে ওখানকার ছাত্ররা সম্মেলনের প্রথম দিন হাজিরা দিয়েই চলে যেতে বাধ্য হয় বলে তারা মিছিলে শরীক হতে পারেনি।

শিবিরের সুশৃঙ্খল দীর্ঘ মিছিল সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বায়তুল মুকাররম হয়ে নওয়াবপুর রোড দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলে। পরদিন এ মিছিলের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন পত্রিকায় মিছিলে যোগদানকারীদের সংখ্যা ৫০ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবভন পর্যন্ত খবর পৌছে যে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিল গোটা শহর ছেয়ে গেছে। রাজধানীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করায় এ মিছিলের কথা সর্বত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো অনেকের নিকটই শিবিরের জনশক্তির সংখ্যা বিস্ময়কর মনে হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে শিবিরের বিজয়

১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৮১) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদের নির্বাচনে ভিপি ও জিএসসহ মোট ২৬টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ইসলামী ছাত্রশিবির বিজয়ী হয়। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সর্বোচ্চসংখ্যক পাঠকের পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ভিপি জসীমউদ্দীন সরকার (বর্তমানে এডভোকেট ও ঢাকা মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর) এবং সেক্রেটারি আবদুল গাফ্ফারের ছবিসহ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে নির্বাচনের বিস্তারিত ফলাফল প্রকাশিত হয়।

এ নির্বাচনের মাত্র ১০ দিন পূর্বে শিবিরের বিরাট কর্মী সম্মেলন ও বিশাল মিছিলের খবর বিরোধী মহলকে দারুণভাবে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের এ ঐতিহাসিক বিজয় তাদের টনক নড়িয়ে দেয়। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। পত্রিকায় নির্বাচনের ফল দেখেই মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি কর্নেল নুরুজ্জামান ও সেক্রেটারি নাঈম জাহাঙ্গীর ঐ দিন সন্ধ্যায়ই প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করেন এবং এদের যাবতীয় স্থাপনা ও আস্তানা উৎখাত করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামবিরোধীরাই ক্ষমতাসীন হয় এবং এ দেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য তারা অনেক কিছুই করেন। ইসলামকে শুধু অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম হিসেবে তারা বরদাশ্ত করতে রাজি ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরোধীশক্তি হিসেবে ইসলামী আন্দোলন আবার এ দেশে জেগে উঠবে বলে তারা হয়তো ধারণাও করেননি।

তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ঐতিহাসিক বিজয় ঐ মহলে রীতিমতো আতংক সৃষ্টি করে। শিক্ষিত নবপ্রজন্মে যদি ইসলামী আন্দোলন এভাবে অগ্রসর হয় তাহলে এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পক্ষে আধুনিক শিক্ষিতরাও এগিয়ে আসতে পারে— এটা তাদের নিকট অকল্পনীয়। তাই তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

জামায়াত উৎখাতের হুমকি

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৫ মার্চ থেকে এ দিবসটি পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি দৃশ্যমান হতে থাকে।

১৯৮১ সালে এতে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। সরকার সমর্থক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আওয়ামী লীগ সমর্থক মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মধ্য মার্চ থেকেই মাঝে মাঝে মিছিল বের করে। এবার তাদের স্লোগানে জামায়াত-শিবিরের আস্তানা গুঁড়িয়ে দাও, গোলাম আযমকে ফাঁসি দাও, স্বাধীনতার দুশমনরা হুঁশিয়ার ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা যায়।

স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন মগবাজার এলাকায় জামায়াত অফিস ও দৈনিক সংগ্রাম ভবনের সামনে দিয়ে উপরিউক্ত স্লোগান দিয়ে মিছিলের পর মিছিল এলিফ্যান্ট রোড (হাতির সড়ক), ফীলখানা থেকে শুরু হয়ে মগবাজারের মধুবাগে গিয়ে সমাপ্ত হয়। রমনা থানার কাছেই আমার বাড়ির পাশ দিয়ে ঐ সড়কটি গিয়েছে। এ রাস্তা দিয়েও মিছিল গিয়েছে। জামায়াতের পক্ষ থেকে রমনা থানায় জানানো হলো, জামায়াত অফিস ও দৈনিক সংগ্রাম ভবনে যদি হামলা করা হয় তাহলে জামায়াতের কর্মীরা প্রতিরোধ করবে। এতে শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

দেখা গেল, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা থেকে পরদিন রাত পর্যন্ত জামায়াত অফিস ও দৈনিক সংগ্রাম এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমার বাড়িতে পুলিশপ্রহরা চাওয়া হয়নি। আমার বাড়িতে হামলা হলে প্রতিহত করার জন্য জামায়াত সিদ্ধান্ত নেয় যে, ২৬ মার্চ সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শ' দেড়েক জামায়াত ও শিবিরকর্মী মহল্লায় অবস্থান করবে। তারা মহল্লার মসজিদে নামাযের পর স্বাধীনতা দিবস পালন করতে থাকবে। গোটা মহল্লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য তাদের একটি গ্রুপ নিয়োজিত থাকবে।

২৬ মার্চের বিবরণ

জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসের সকাল থেকেই জামায়াত ও শিবিরের কর্মীগণ কিছু কিছু করে সমবেত হতে থাকেন। আমার ছোট বৈঠকখানায় মাত্র কয়েকজনকে রেখে বাকি সবাইকে মসজিদে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকেল পর্যন্ত তাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শ'তে দাঁড়ায়।

এত লোককে তো বাড়িতে কোথাও বসানোর স্থান ছিল না। পাহারা ও তদারকির দায়িত্ব যাদের নেই, তারা মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করেন। দু'নামাযের মাঝের সময়টা তারা

স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। বক্তৃতা, গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা দিবসটিকে সার্থক করে তোলেন।

সন্দেহ ছিল যে, বায়তুল মুকাররম চত্বরে আওয়ামীপন্থি মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সমাবেশ থেকে মিছিল করে আমার বাড়িতে হামলা করতে আসতে পারে। তাদের প্রতিহত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। হাতির সড়ক থেকে আমার বাড়ির দিকে যে রাস্তা এসেছে, এটা শহরের যানবাহন চলাচলের পথ নয়, এটা পাবলিক থরোফেয়ার নয়। এটা একটা বদ্ধ রাস্তা (Blind Road)। কোন যানবাহন এ রাস্তায় ঢুকলে এ পথেই ফিরে যেতে হয়। এটি মহল্লাবাসীর নিজস্ব রাস্তা।

সুতরাং কোন মিছিল যদি এ মহল্লায় প্রবেশ করে তাহলে এ মহল্লা পার হয়ে অন্য মহল্লায় যাওয়ার উপায় নেই। যে পথে ঢুকবে সে পথেই ফিরতে হবে। কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিল, মহল্লার প্রবেশ পথে সামান্য ভেতরে অবস্থান করবে। কোন মিছিল হাতির সড়কে দেখা গেলে তাদের বলা হবে, এটা সর্বসাধারণের পথ নয়। এ পথ দিয়ে মিছিল পার হওয়ার কোন পথ নেই। এটা মহল্লার নিজস্ব পথ। তাই এদিকে ঢোকা যাবে না। এরপরও যদি ঢুকে তাহলে জ্যান্ত ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণও করা হবে। জামায়াতের একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মী বায়তুল মুকাররম গেলেন। মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সভাপতি ব্যারিস্টার শওকত আলীর সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তিনি এ দায়িত্ব নিয়ে গেলেন যে, সমাবেশ থেকে কোন মিছিল মগবাজারের দিকে আসবে কি-না তা জানার ব্যবস্থা করবেন এবং এখানে যথাসময়ে জানাবেন। কয়েকজন কর্মীকে তিনি খবরাখবর পৌছানোর জন্য সাথে নিয়ে গেলেন।

তিনি সমাবেশের মঞ্চে গিয়ে অন্যদের সাথে বসলেন। বক্তারা জামায়াত-শিবির-গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। যিনি খবর নিতে গিয়েছিলেন তার আশঙ্কা হল, সমাবেশ শেষে মিছিল মগবাজারের দিকে যেতে পারে। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টার শওকত আলীর কানে কানে বললেন, "শুধু গরম বক্তৃতায় চলবে না, মগবাজারের দিকে মিছিল নিয়ে চলুন।" ব্যারিস্টার সাহেব সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি জান, ঢাকায় যে গোলাম আযমের ৫০ হাজার ভলানটিয়ার আছে? মিছিল করা এত সহজ নয়।" তিনি খবর দিয়ে পাঠালেন, মিছিলের কোনো আশঙ্কা নেই।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মেলন ও মিছিলের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে কুরআনের ভাষায় 'রোওব' ঢেলে দিলেন; যার ফলে তারা হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এখানে ঐ সংবাদ পৌছার পর সমবেত কর্মীদের কিছুসংখ্যককে রাত ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে অবশিষ্ট সবাইকে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হলো। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে দোআ করার পর সবাই বিদায় হয়ে গেলেন। জামায়াত অফিস ও দৈনিক সংগ্রামে প্রহরারত কর্মীদেরও রাত ১০টার পর বিদায় করে দেওয়া হলো। এভাবেই জামায়াতের সাহসিকতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের বরকতে মহান আল্লাহর সাহায্য পাওয়া গেল।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার অসতর্ক উচ্চারণ

১৯৮১ সালের স্বাধীনতা দিবসের দু'দিন পূর্বে শিল্পকলা ভবনের অডিটরিয়ামে কর্নেল নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হঠাৎ করে (মুক্তিযোদ্ধাদের খুশি করার জন্যই হোক বা যে উদ্দেশ্যেই হোক) বলে ফেললেন, "রাজাকারদেরকে সহ্য করা হবে না; তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে।"

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫-এর নভেম্বরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করেন। স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে জনগণকে বিভক্ত করার পরিবর্তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বক্তব্যে কোন দলের নাম নিয়ে তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করতেন না। যখনই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধী মহলের বিরুদ্ধে বলতেন, তিনি শুধু 'বাকশাল'-এর বিরুদ্ধেই সতর্ক থাকতে বলতেন।

রাজাকার নেতা হিসেবে নিন্দিত শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদে বিএনপি দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বিরাট দুঃসাহসের পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে তিনি কারো আপত্তির পরওয়া করেননি। জনগণের মধ্যে বিভেদের পরিবর্তে ঐক্যের রাজনীতি তিনি চালু করেন।

হঠাৎ প্রেসিডেন্টের মুখে 'রাজাকার' গালি উচ্চারিত হওয়ায় অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁর মুখে ঐ অসতর্ক উচ্চারণ সারা দেশে জামায়াত-শিবিরবিরোধীদের খেপিয়ে তোলে। সর্বত্র জামায়াতের সমাবেশ ও মিছিলে হামলা হতে থাকে। এপ্রিল বা মে মাসে বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে 'নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটি' মিছিলের উদ্যোগ নিতেই বিরোধীরা ধাওয়া করলে সবাই মসজিদে আশ্রয় নেয়।

জিয়া হত্যা পর্যন্ত জামায়াত-শিবির নির্যাতিত

২৪ মার্চ (১৯৮১) মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্যের পর দু' মাসেরও বেশি সময় জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সারা দেশে রীতিমতো অভিযান চলে। জামায়াত ও শিবির অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। জামায়াত-শিবিরের সভা, সমাবেশ, মিছিল ও প্রকাশ্য সব রকম তৎপরতার বিরোধিতা চলতে থাকে।

৩০ মে ('৮১) সকাল ১০টায় আমার বাড়িতে জামায়াতের কর্মপরিষদের বৈঠক চলছিল। হঠাৎ রেডিও অফিস থেকে আমার পরিচিত একজন ফোনে জানালেন, গত শেষ রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সেনাবাহিনীর লোকেরা হত্যা করেছে। এ খবর আমাদের সবাইকে হতবাক করে দিল।

হত্যাকারীদের পরিচয় তো জানা নেই। হয়তো ভারতপন্থিরাই এটা করেছে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, কয়েক দিন অপেক্ষা করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আরও সিদ্ধান্ত হলো, এ সময় আমাকে অন্য কোথাও কয়েক দিনের জন্য চলে যাওয়া প্রয়োজন। জনাব নাযির আহমদের (বগরা) মুহাম্মদপুরস্থ বাড়িতে মেহমান হলাম।

চার-পাঁচ দিন পর পরিস্থিতি অনুকূল মনে হলে বাড়িতে ফিরে আসি। জানা গেল, জিয়া হত্যার আসামি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি ও সেক্রেটারিকে সন্দেহ করায় তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জিয়া হত্যার সাথে সাথে পরিবেশ বিস্ময়করভাবে বদলে গেল। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী একসময় এনএসআই (গোয়েন্দা সংস্থা)-এর এক ডাইরেক্টরের সাথে কোথাও দেখা হলে তিনি বললেন, "প্রেসিডেন্ট জিয়া মুক্তিযোদ্ধা-নেতাদের চাপে জামায়াতের বিরুদ্ধে ঐ কথা বলাটা সঠিক হয়নি বলে স্বীকার করেছিলেন।"

২০৪.

জিয়া হত্যা এক মহারহস্য

১৯৮১ সালের ২৯ মে দিবাগত শেষ রাতে (৩০ মে) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁর মুখমণ্ডল ও মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হয়। তাঁর লাশ ওখানকার এক পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়; কিন্তু একদিন পরই সে লাশ তুলে ঢাকায় আনা হয়। তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের কত প্রিয় ছিলেন, তা তাঁর জানাযায় লাখ লাখ লোকের উপস্থিতি ও তাদের আবেগপূর্ণ আচরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

শেখ মুজিবোত্তর বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা, নিঃস্বার্থকতা ও দেশপ্রেমের কারণে তিনি জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে জিয়ারই জনপ্রিয়তা। বিএনপি'র আসল পুঁজিই হলো জিয়ার প্রতি জনগণের ভালোবাসা।

বিশ্বে কোথাও রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানকে বিনা পরিকল্পনায় হত্যা করা হয় না। যারা হত্যা করে তারা ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে যারা হত্যা করল তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল কি-না, কিছুই বোঝা গেল না। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করতে হলে রাজধানীকেই টার্গেট করতে হয় এবং সেনাপ্রধানের সমর্থন জোগাড় করতে হয়। এসব কিছু না করেই দেশের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় এভাবে হত্যা করাকে চরম বোকামি ছাড়া আর কী বলা যায়?

জিয়া হত্যার বিচার করা হয় সামরিক আদালতে। যে ১৩ জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হয় তারা সত্যিই এ হত্যার সাথে জড়িত কি-না, এ বিষয়ে একটি কারণে আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল মাহফুজুর রহমান মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের অন্যতম। আমার আত্মীয় হওয়ার কারণে তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। তিনি আমার বড় ছেলের শাশুড়ি সাবেক এমপি মুহতারামা হাফিযা আসমা খাতুনের আপন ছোট ভাই। আমার বেহাই হিসেবে তার সাথে একান্ত আলোচনায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি তার অন্ধ ভক্তি ও আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি। তিনি জিয়া হত্যার সাথে জড়িত থাকতে

পারেন বলে আমার পক্ষে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। জিয়া সম্পর্কে আমার সামান্য সমালোচনাও তার সহ্য হয়নি। আমার প্রতিটি আপত্তির বলিষ্ঠ জবাব দিয়ে তিনি জিয়ার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন।

এরশাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে ১৯৮৪ সালে আমার বন্ধু শাহ আজিজুর রহমানকে একান্তে জিজ্ঞেস করলাম। আপনি তো বিএনপি-তে বেগম জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ। জিয়া হত্যার মতো ঘটনাকে তিনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন? সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সাথে সমঝোতা ছাড়া এভাবে চট্টগ্রামে হত্যা করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? এ বিষয়ে বেগম জিয়ার ধারণা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? তিনি বললেন, ম্যাডাম দৃঢ় অভিমত পোষণ করে যে, সেনাপ্রধান এরশাদ এতে জড়িত এবং জেনারেল মঞ্জুরের সাথে তিনি প্রতারণা করেছেন।

জিয়া হত্যা মামুলি ঘটনা নয়

বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিব হত্যাও বিরাট এক ঘটনা। কিন্তু মুজিব হত্যায় জনগণ সন্তুষ্টই হয়েছে। জিয়া হত্যায় গোটা দেশবাসী শোকাহত হয়েছে বলে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। মুজিব হত্যায় দেশের কোন ক্ষতি হয়নি; বরং দেশ একনায়কত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মুজিব হত্যার পর দেশ গড়ার সূচনা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। দেশ গণতন্ত্রমুখী হচ্ছিল। জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠছিল। মুসলিম বিশ্বেও বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

জিয়া-হত্যায় বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। তিনি ভারতের আগ্রাসী নীতির মোকাবিলা করার জন্য চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ওআইসি-তে বাংলাদেশের সবল উপস্থিতির ব্যবস্থা করেন। সার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি এ উদ্দেশ্যেই করেছিলেন। তিনি সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় ছোট দেশগুলোকে সাথে নিয়ে ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। তাঁর মতো বলিষ্ঠ নীতি এ পর্যন্ত আর কেউ গ্রহণ করেননি। আর কয়েক বছর তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো বাংলাদেশ আরও মযবুত অবস্থানে পৌঁছত।

এ পরিস্থিতিতে জিয়া হত্যা দেশকে বিরাট বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। দেশ জিয়ার মতো জনপ্রিয় নেতার অবদান থেকে বঞ্চিত হয় এবং এক অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাই জিয়া হত্যা কোন মামুলি ঘটনা নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম। জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের একনায়কত্ব দীর্ঘ নয় বছর জাতির গর্দানে চেপেছিল। আইয়ূব আমলের মতোই একটানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর এরশাদের স্বৈরশাসন থেকে দেশ মুক্তি পায়।০

এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা যে, রাজধানী দখলের পরিকল্পনা ছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানকে খামখেয়ালিভাবে হত্যা করা কোনক্রমেই স্বাভাবিক নয়। তাহলে এমন সন্দেহ অমূলক নয় যে, সেনাপ্রধান এই হত্যা পরিকল্পনায় অবশ্যই শরীক ছিলেন। কিন্তু হত্যার দায়

অপরের ওপর তুলে দিয়ে হত্যাকারীদের সাথে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। জেনারেল মঞ্জুরকে যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে ঐ সন্দেহ আরও মযবুত হয়। আসল রহস্য আল্লাহই জানেন। এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার উপায় নেই।

কিন্তু যেহেতু এ দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে জিয়া হত্যা এক বিরাট ঘটনা, তাই কারা কী উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতো জনপ্রিয় নেতাকে হত্যা করল সে সম্পর্কে দেশবাসীর অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি তথ্য সংগ্রহ করা কর্তব্য মনে করেছি। আমার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ না করে এমন দু'জন সাবেক সেনা কর্মকর্তার পুস্তক থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যারা জেনারেল জিয়া ও জেনারেল মঞ্জুরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তারা হলেন– লে. কর্ণেল (অব.) এমএ হামিদ ও মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী।

জিয়া হত্যা সম্পর্কে লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ পিএসসি'র বিবরণ

লে. কর্নেল (অব.) আব্দুল হামিদের পরিচয় সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম' চতুর্থ খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁর লেখা 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' নামক পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমার ভাষায় জিয়া হত্যা সম্পর্কে লেখার চেয়ে এ বিষয়ে তাঁর লেখাই হুবহু উদ্ধৃত করছি। এ লেখা দীর্ঘ হলেও পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তা-ই পরিবেশন করা যথার্থ মনে করেছি। অপ্রয়োজনীয় মনে করে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন অংশ বাদ দিয়েছি। যতটুকু পেশ করা হয়েছে এর সবটুকুই কর্নেল সাহেবের পুস্তকের উদ্ধৃতি।

"জিয়া হত্যাকাণ্ড : চট্টগ্রাম সেনা-অভ্যুত্থান

১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সেনা-অভ্যুত্থানে নিহত হলেন জেনারেল জিয়া। আর একটি রহস্যঘেরা অভ্যুত্থান। ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর জিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে বহু ছোট-বড় সেনা-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়া সবগুলোই দক্ষতার সাথে প্রতিহত করেন। বলা যায়, ঐ সময় জিয়া সৈনিকদের অভ্যুত্থান ঠেকাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসব ছিল তার কাছে ছেলেখেলা। কিন্তু ১৯৮১ সালের চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঠেকাতে পারলেন না। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে সেনা-অভ্যুত্থান ছিল না। ৩ নভেম্বরের মতো এটা অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি 'অফিসার্স অভ্যুত্থান' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; যেখানে সৈনিকদের স্বার্থ সামান্যই জড়িত ছিল। সব অভ্যুত্থানেই ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার লড়াই। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানও ছিল তাই; কিন্তু পর্দার আড়ালে নেপথ্যে থেকে কোন্ ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি কলকাঠি নেড়েছেন, তা সবার কাছে আজও অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রিয় সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মঞ্জুর, যেমনভাবে এরশাদ ছিলেন তার বড়ই বিশ্বস্ত ফরমাবরদার। বাংলাদেশ আর্মির একজন দক্ষ, প্রতিভাবান, সৎ অফিসার মঞ্জুর; অবশ্য তিনিও ছিলেন জিয়া, এরশাদ, তাহের, খালেদ, শাফায়াতের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

কেন হঠাৎ বিগড়ে গেলেন জেনারেল মঞ্জুর? রাজধানী ঢাকার মসনদ ছেড়ে চট্টগ্রামে করলেন অভ্যুত্থান প্ল্যান? আজ এটা জলবৎ পরিষ্কার। জিয়া-মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ৭ নভেম্বরের সেই প্রভাবশালী চক্রের চক্রান্তেরই ফসল।

১৯৭৬ সালের ডবল প্রমোশন নিয়ে জেনারেল এরশাদের ঢাকা আগমন। আগমনের পরপরই ক্যান্টনমেন্টে সেপাইদের কাছে তার মতো এক অখ্যাত অফিসারের এক বছরের ডবল প্রমোশনের বিষয়টি তখনই যথেষ্ট উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান না করায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তার উপর খেপা। এসব নিয়ে জিয়ার কাছে বিভিন্নভাবে সৈনিকরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানায়।

জিয়া তাকে চিনতে পারেননি। তাকে দুর্বল ভেবে কাছে টেনে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবেছিলেন। সেটাই হলো তার কাল।

এরশাদ জিয়ার কান ভারী করে আমাকেও সরিয়ে দিয়েছিল। তারপর সেই যে এরশাদরূপী মামদো ভূত জিয়ার ঘাড়ে চাপল, অন্যরা শত চেষ্টা করেও তাকে নামাতে পারেনি।

ছিটকে পড়ল মঞ্জুর, ছিটকে পড়ল শওকত। একাই তখন এরশাদ জিয়ার ঘাড়ে সওয়ার। ধূর্ত এরশাদ চাণক্যের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে জিয়ার সাথে মঞ্জুর-শওকতের সম্পর্কের ফাটল ধরাল। সময় দ্রুত গড়িয়ে চলল।

মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম ডিভিশন কমান্ডার থেকে অপসারণ করে স্টাফ কলেজে বদলি করা হলো। কম গুরুত্বপূর্ণ এই পোস্টিং মঞ্জুরের মনঃপূত হয়নি। এসব ব্যাপার নিয়ে সেনাপ্রধান এরশাদের চক্রান্তে জিয়া এবং মঞ্জুরের মধ্যে হঠাৎ করে সম্পর্কের তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। মঞ্জুর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি জিয়াকে হত্যা করার প্ল্যান করেছিলেন কি-না, এ নিয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যতদূর জানা যায়, জিয়াকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে এনে এরশাদের পদচ্যুতিসহ কিছু দাবি-দাওয়া আদায়ই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

২৯ মে ১৯৮১ সাল। প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম পৌঁছেন। জেনারেল এরশাদের প্রেসিডেন্টের সাথে যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ তার প্ল্যান পরিবর্তন করেন। প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অবস্থান নেন। তিনি রাজনৈতিক মিটিং নিয়ে মহাব্যস্ত থাকেন। রাত এগারোটায় ঘুমোতে যান।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ গভীর রাত। তিন ঘটিকায় বিদ্রোহী অফিসারগণ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সার্কিট হাউসে আকস্মিক কমান্ডো আক্রমণ চালায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণের প্ল্যান-প্রোগ্রাম ও উদ্দেশ্য নিয়ে অফিসারদের মধ্যে ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি।

প্রথমে রকেট লাঞ্চার থেকে সার্কিট হাউসের উপর রকেট বর্ষণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণে পুলিশ গার্ডরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বিনা বাধায় বিদ্রোহী অফিসাররা সার্কিট হাউসের দোতলায় ছুটে যায়। তারা বারান্দায় ছোটাছুটি করে প্রেসিডেন্টকে চিৎকার করে খুঁজতে থাকে। এই সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজেই ৪নং কক্ষ

থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি চাও? কাছে দণ্ডায়মান তরুণ লে. মোসলেহ উদ্দিন রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। এমন সময় হঠাৎ করে লে. কর্নেল মতি ছুটে এসে তার স্টেনগান দিয়ে অতি কাছে থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে। ক্ষিপ্তপ্রায় মতি তার স্টেনগান থেকে মেঝেতে পড়ে যাওয়া জিয়ার মুখমণ্ডলে আর এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। আনুমানিক ৪-৩০ মিনিটে জিয়া মৃত্যুবরণ করেন। জিয়াকে হত্যা করার কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান-প্রোগ্রাম বা নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও কেন কর্নেল মতি ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করল, তার এই মোটিভ আজও রহস্যাবৃত। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে যেভাবে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে রকম নির্দেশ জেনারেল মঞ্জুর কোনও পর্যায়ে কাউকে দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নেপথ্যে থেকে তাহলে নাটাইর সুতাটি টেনেছিল কে? কর্নেল মতি ছুটে গিয়ে কার নির্দেশে জিয়ার বুকে স্টেনগান চেপে ধরল? মঞ্জুর তো জিয়াকে হত্যা করার নির্দেশ কাউকে দেননি। তাহলে মতি এককভাবে এ কাজটি কেন করল? ঘটনা প্রবাহ থেকে জানা যায়, হত্যাকাণ্ডের চারদিন আগে চট্টগ্রামে মতির সাথে হিলটপ মেসে এরশাদের সাথে দু'ঘণ্টা অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনা হয়েছিল। সকল প্রটোকলের বাইরে একজন জুনিয়র অফিসার মতির সাথে সেনাপ্রধানের এমন কী ব্যক্তিগত গোপন আলাপ হতে পারে ঐ সন্ধিক্ষণে? ক'দিন আগে ঢাকায় গিয়েও মতি সেনাপ্রধান এরশাদের সাথে দেখা করে। ঐদিন এরশাদ মিলিটারি একাডেমির নির্ধারিত ভিজিট ক্যানসেল করে প্রায় সারা দিন মঞ্জুরের সাথে গভীর আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে কী গোপন আলোচনা হয়েছিল? এসবই আজ রহস্য।

মেজর জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ঘটনা অবহিত হওয়ার পর লে. কর্নেল মতিকে ডেকে বকাবকি করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সিনিয়র অফিসার হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে দুই কোম্পানি সৈন্য শুভপুর ব্রিজের দিকে পাঠাতে নির্দেশ দেন। মঞ্জুর একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন এবং চট্টগ্রাম রেডিও মারফত বিভিন্ন ঘোষণা দিতে থাকেন। জিয়ার আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সবাই হতভম্ব হলেও ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ ছিলেন প্রস্তুত। তিনি ত্বরিত গতিতে অতি ভোরেই সবার আগে আর্মি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যান এবং সকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি তার স্টাফ প্রধানদের তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান। জে. নুর উদ্দিন, জে. ওয়াহেদ, হারুন, মইন প্রমুখ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান। সেনাসদরে স্থাপন করা হয় 'অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' জেনারেল এরশাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। অতঃপর সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড। তিনি রেডিও বাংলাদেশ মারফত চট্টগ্রামে অবস্থিত সৈনিকদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। বস্তুত তখন রেডিও-টেলিভিশন মারফতই দিবারাত্রি ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' চলতে থাকে। কোনো পক্ষের সৈন্যরাই তখন অস্ত্র নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে মোটেই আগ্রহী ছিল না। মঞ্জুর রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে ব্যর্থ হন। রাজধানী ঢাকায় তার সপক্ষে কারা কাজ করেছিল, তা এখন তদন্তসাপেক্ষ। তবে রেডিও-টেলিভিশন

মারফত সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের দিবারাত্রি প্রোপাগান্ডা ও নির্দেশ চট্টগ্রামে অবস্থিত মঞ্জুরের অনুগত অফিসার ও সৈনিকদের মনোবল দ্রুত ভেঙে দেয়। তারা রেডিওর ঘোষণা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়। তারা অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলে নিজেদের জড়াতে আগ্রহী ছিল না।

ওদিকে এরশাদের নির্দেশে কুমিল্লা থেকে বিপুল সৈন্য নিয়ে ব্রিগেডিয়ার (পরে জেনারেল) মাহমুদ চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন। হতাশ এবং ভগ্নহৃদয় মঞ্জুর বেগতিক দেখে কয়েকজন সহকর্মী অফিসার ও ফেমিলিসহ হাটহাজারীর দিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। ওদিকে এরশাদের নির্দেশে রেডিও বাংলাদেশ জেনারেল মঞ্জুরকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেপ্তার করার জন্য ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

অবশেষে একটি চা বাগানে একজন কুলির জীর্ণ কুটিরে ধরা পড়লেন সপরিবারে জেনারেল মঞ্জুর। পুলিশ ইন্সপেক্টর গোলাম কুদ্দুস তাকে গ্রেপ্তার করে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসেন।

সংবাদ পেয়ে এরশাদের বিশেষ ব্রিফিং নিয়ে মে. জেনারেল লতিফ চট্টগ্রাম গিয়ে উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনটি পিকআপ ও জিপ নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদকে পাঠানো হয় হাটহাজারী থানায়। সেখানে পৌঁছে এমদাদ প্রায় জোর করেই পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে জেনারেল মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেয়। মঞ্জুর বারবার আকুল আবেদন করেন তাকে পুলিশের হেফাজতে দেওয়ার জন্য। এর জবাবে ক্যাপ্টেন এমদাদ হতভাগ্য জেনারেলকে হাত-পা-চোখ বেঁধে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে চট্টগ্রাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে। পুলিশের গাড়িও পেছন পেছন ছুটে চলে। মঞ্জুরের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে থাকে। মিসেস মঞ্জুর চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন।

বন্দি জেনারেল

বন্দি জেনারেলকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদের জিপ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রবেশ করল। নিয়তির কি করুণ পরিহাস! দু'শো বছর পর যেন বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলার কাহিনীর বাস্তব পুনরাবৃত্তি ঘটল। যিনি ছিলেন রাজ্যের বাদশাহ মহান অধিপতি; দীনহীন ভিখারির বেশে বন্দি হয়ে তাঁর মুর্শিদাবাদ প্রবেশ। মীরজাফর-পুত্র মীরনের নির্দেশে ঘাতক ভৃত্য মহম্মদি বেগ কর্তৃক তাঁর বুকে আমূল ছোরা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হত্যা!

দু'শো বছর পর চট্টগ্রামে পুরনো সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেনাবাহিনীর বরপুত্র চট্টগ্রামের একচ্ছত্র সেনাপতি মেজর জেনারেল মঞ্জুর তার আপন সেনানিবাসে প্রবেশ করলেন দীন-হীন বন্দি বেশে। তার হাত-পা-চোখ বাঁধা। ক্ষমতার মসনদে সদ্য উপবিষ্ট নবাবের ইঙ্গিতে ঘাতকরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত। রাতের অন্ধকারে তাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদের দল সেনানিবাসে ঘুরতে থাকে। জনপ্রিয় জেনারেলকে কেউ খুন করতে রাজি হয় না। এক সময় ঘাতক দল কঠোর হয়। উপরের নির্দেশ পালন করতেই হবে। অতি নিকট থেকে জেনারেল মঞ্জুরের মাথায় একটি গুলি করা হলো।

গুলিটি তাঁর মাথায় একটি বড় গর্তের সৃষ্টি করলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। সরকারের রেডিও-টেলিভিশন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করল, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হাতে জেনারেল মঞ্জুর নিহত হয়েছেন। কী নির্লজ্জ মিথ্যাচার! মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানী ও সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম; চিরশয্যায় শায়িত রয়েছেন ক্যান্টনমেন্টের এক নিভৃত কোণে। তিনজন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর হত্যার সময় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন ব্রিগেডিয়ার এম এ লতিফ, ব্রিগেডিয়ার আজিজুল ইসলাম ও ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান। ব্রিগেডিয়ার আজিজ অকালে মারা যান। লতিফ ও মাহমুদ প্রমোশন পেয়ে জেনারেল হন। মাহমুদও পরে অকালে মারা যান।

মঞ্জুরের তিরোধানের সাথে সাথে চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের অবসান ঘটল। নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন জেনারেল এরশাদ। ধরাশায়ী হলো সকল প্রতিপক্ষ। অতঃপর তারই মনোনীত অসুস্থ অথর্ব সাত্তারকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিয়ে নিজেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেশ শাসন করতে লাগলেন জেনারেল এরশাদ।

মেজর জেনারেল মোজাম্মেলের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হলো অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে। তড়িঘড়ির তদন্তে ঐ পরিস্থিতিতে কী পরিবেশ বিদ্যমান ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তী সময়ে জেনারেল আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে একটি গোপন কোর্টমার্শাল অনুষ্ঠান করে অভিযুক্ত ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। তাদের পরিবার-পরিজনের আকুল আবেদন, কাকুতি মিনতি, অনশন কিছুই এরশাদের ইস্পাত-কঠিন হৃদয়কে টলাতে পারল না।

তারা জীবিত থাকলে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসত। বেরিয়ে আসত নেপথ্য নায়কের বীভৎস চেহারা। এখন সব পাক-সাফ। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত অফিসারদের অনেকেই জিয়া হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। চট্টগ্রাম-বিদ্রোহকে বাহ্যত একটি বিশেষ গ্রুপের অফিসারদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মঞ্জুর বরাবরই এরশাদকে তার দুর্নীতি ও নষ্ট চরিত্রের জন্য প্রকাশ্যে ঘৃণা করত। এরশাদ ভালোভাবেই জানতেন, জিয়ার পর তিনি ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করলেও জীবিত মঞ্জুরের উপস্থিতিতে কোনভাবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে দেশ শাসন করতে পারবেন না। অতএব ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করেই এক ঢিলে দুই পাখি মারার শিকার-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। সব কিছুই ছিল মূলত সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দল, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফসল।

৭ নভেম্বরের সিপাহি বিদ্রোহের পথ ধরে জিয়ার উত্থানের আড়ালে যে বহুরূপী কালো-বিড়ালটি ম্যাঁও ম্যাঁও করে সবার অলক্ষ্যে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে তার অশুভ পদচারণায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় ডেকে আনে। এর জের আজও চলছে। চলবে আরো বহুদিন।

জিয়ার উত্থানের দিনগুলোতে তার পাশে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে ঘনায়মান সংকট নিয়ে হুঁশিয়ার করেছিলাম, তার সাথে কড়া বাক্য বিনিময় করেছিলাম। সে আমার কোন কথাই শোনেনি। ক্ষমতার পঙ্কিলে পড়ে সে ছিল তখন অন্ধ। সে সুযোগে চাটুকার ষড়যন্ত্রকারীরা দল বেঁধে ঘিরে ধরে হিংসা-সংঘাতের দিকে তাকে পরিচালিত করে। আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে জিয়ার কান ভারী করে। তার ও আমার মধ্যে বহুদিনের গভীর সুসম্পর্কে ফাটল ধরায়। ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করে চক্রান্তের পঙ্কিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসি। ওদের জিয়া চিনতে পারেনি; বরং আমাকেই সে ভুল বুঝেছিল।

আজ বলতে দ্বিধা নেই, তখনকার সেই চাটুকার ষড়যন্ত্রকারীদের জালেই আটকা পড়ে জিয়া এবং পরবর্তী সময়ে মঞ্জুরসহ আরো বহু তরুণ অফিসার অকালে জীবন বিসর্জন দেয়।

আমিও জীবনযুদ্ধে পরাজিত এক সৈনিক। সেই উত্তাল দিনগুলোর আমি শুধু এক নীরব সাক্ষী। আজ জীবনসায়াহ্নে এসে গভীর বেদনার সাথে নীরবে নিভৃতে নিকট সহযোগীদের উত্থান আর পতনের স্মৃতি রোমন্থন করে বারবার খেই হারিয়ে ফেলি। মানুষের জীবন কী বিচিত্রময়! কী অপরূপ বিধাতার লীলাখেলা!" (পৃষ্ঠা : ১৮১-১৮৬)

কর্নেল আবদুল হামীদের তথ্যাবলির বিশ্লেষণ

কর্নেল আবদুল হামীদ এমন কতক তথ্য পরিবেশন করেছেন, যাতে জিয়া হত্যার পরিকল্পনায় জেনারেল এরশাদ জড়িত বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন–

১. জিয়ার হত্যাকারী লে. কর্নেল মতির সাথে সেনাপ্রধান এরশাদের চট্টগ্রামে হিলটপ মেসে ঘটনার মাত্র চারদিন পূর্বে দু'ঘণ্টা একান্ত বৈঠক করেন। সেনাপ্রধানের সাথে একজন লে. কর্নেলের এ জাতীয় বৈঠক অস্বাভাবিক।

২. এর ক'দিন আগে লে. কর্নেল মতি ঢাকায় গিয়েও সেনাপ্রধানের সাথে দেখা করেন।

৩. সেনাপ্রধান এরশাদ জিয়া হত্যার চার দিন পূর্বে মিলিটারি একাডেমির নির্ধারিত ভিজিট ক্যানসেল করে প্রায় সারা দিন জেনারেল মঞ্জুরের সাথে একান্তে মিলিত হন।

৪. প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে জেনারেল এরশাদেরও চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা ছিল। অজ্ঞাত কারণে তিনি যাননি।

৫. জিয়ার আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সকলেই হতভম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু জেনারেল এরশাদ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে অতি ভোরেই সবার আগে আর্মি হেডকোয়ার্টারে হাজির হয়ে দৃঢ়তার সাথে সকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এ তথ্যগুলো দ্বারা এ ধারণাও দেওয়া হয়েছে, সেনাপ্রধানের পরিকল্পনা অনুযায়ীই কর্নেল মতি জিয়াকে হত্যা করেন এবং এ পরিকল্পনায় জেনারেল মঞ্জুরও শরীক ছিলেন। জেনারেল এরশাদ দেশের ক্ষমতা হাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূল পরিকল্পনা করেন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন। তাই

তিনি জিয়া হত্যার পর জেনারেল মঞ্জুরকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার জন্য ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এতে জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করার অনুমতিও প্রচ্ছন্ন ছিল। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের পর জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকলে এরশাদও জিয়া হত্যায় জড়িত বলে প্রমাণিত হওয়ার ভয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

২০৫.

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীরবিক্রম-এর পরিচয়

মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জয়দেবপুর হতে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে বীরবিক্রম খেতাবে ভূষিত করে।

১৯৭২-৭৩ সালে তিনি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক, প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি, ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড ও লগ এরিয়ার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তাকে সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে এবং ১৯৮০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

তিনি ১৯৮২ সাল থেকে বহু দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের নাম 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক'। ১৭৬ পৃষ্ঠার এ পুস্তকটি মাওলা ব্রাদার্স ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত। মেজর জেনারেল চৌধুরী ২০০১ সালের কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি জিয়াউর রহমানের নয় বছর জুনিয়র হলেও সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান।

তাঁর পুস্তক পড়ে আমার এ আস্থা হয়েছে যে, তিনি দেশপ্রেমিক খাঁটি সৈনিক। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে তিনি নিরপেক্ষ। তাঁর লেখায় আন্তরিকতা স্পষ্ট। তিনি জেনারেল এরশাদকে অত্যন্ত ধুরন্ধর ও কুচক্রী হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এরশাদের চক্রান্তের ফলেই তাঁকে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জিয়া হত্যা সম্পর্কে মেজর জেনারেল মইনুল

'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক' নামক পুস্তকে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন জিয়া হত্যা সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

জেনারেল এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসারদের মধ্যে তিনিই অত্যন্ত চতুরতার সাথে জেনারেল জিয়ার আস্থাভাজন হন। তিনি সেনাপ্রধান হওয়ার পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তিনি জেনারেল জিয়াকে জেনারেল শওকত ও জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ করে তোলেন এবং তাদের দু'জনকেই ঢাকার বাইরে বদলি করিয়ে ছাড়েন।

জেনারেল এরশাদ সেনাপ্রধান হওয়ার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের কম গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং ঢাকার বাইরে এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে সরিয়ে দেন। অতি কৌশলের সাথে এ কাজ সমাধা করার পর তিনি দেশের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আস্থা অর্জনের ফলেই তিনি সেনাবাহিনীকে তাঁর মর্জিমতো সাজিয়ে নিতে সক্ষম হন।

কিন্তু দেশের ক্ষমতা দখল করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন সুস্পষ্ট ভাষায় জেনারেল এরশাদকে জিয়া হত্যার পরিকল্পনাকারী বলে প্রকাশ না করলেও এ বিষয়ে যা বলেছেন তাতে ঐ ইঙ্গিত স্পষ্ট। কর্নেল আবদুল হামীদও অনুরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন বটে; কিন্তু মেজর জেনারেলের বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট।

এখন মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের বই থেকে একটানা বক্তব্য পরিবেশন করছি। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলেও যতটুকু দিচ্ছি তা সবটুকুই তাঁর রচনা।

"এরশাদের উচ্চাভিলাষ ও ক্রমোন্নতি

জেনারেল এরশাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। ১৯৬৪ সালে এরশাদ যখন ক্যাপ্টেন, তখন আমি যশোরে ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট। এরশাদকে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল থেকে স্বল্পমেয়াদি কমিশন্ড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। এই অফিসার প্রশিক্ষণ স্কিম ছিল স্বল্প সময়ের জন্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধের পর ১৯৫০-এর প্রথম দিকে জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের কোহাট শহরে এ প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল।

অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল নামে ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাত্র ৯ মাসের ট্রেনিংয়ের পর এদের স্বল্পমেয়াদি কমিশন দেওয়া হতো। বয়সসীমা এবং অন্য শর্তাবলি শিথিল করার কারণে অনেকে অন্য চাকরি ছেড়ে এতে যোগ দেয়। পরে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে ওই ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশকে লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি পদে থাকাকালে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কারণ এদের ব্যাপারে শর্তই ছিল, সরকার ইচ্ছা করলেই তাদের অব্যাহতি দিতে পারবে। স্কিম এক্স-এর অধীনে এরশাদের ব্যাচের অনেককেই মাত্র কয়েক বছর চাকরি করার পর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৩ বছর চাকরির পর ১৯৬৫ সালে এরশাদ মেজর পদে উন্নীত হন। একজন দক্ষ, চৌকস ও বিচক্ষণ সেনাকর্মকর্তা হিসেবে যদিও তার সুনাম ছিল না, কিন্তু 'চতুর সামাজিক যোগাযোগের' ক্ষেত্রে তার প্রচুর দক্ষতা ছিল। যেমন– তিনি জেনারেল ওসমানীর প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত এরশাদ বাংলাদেশ

সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৭৩ সালে। এরপর মাত্র সাত বছরে তিনি লে. কর্নেল থেকে তরতর করে লে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে যান। আর আট বছরের মাথায় তিনি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে যান।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অনৈক্যের একটা প্রধান কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসারদের দ্বন্দ্ব। এরশাদ উপ-সেনাপ্রধান হওয়ায় এ সুযোগকে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগান। তিনি এদের মধ্যে বিভেদের ফাটল সৃষ্টি করেন। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের দাবিয়ে রেখে অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। তখন মেজর জেনারেল পদমর্যাদার সেনা অফিসারদের মধ্যে চার জন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। এই চার জনের মধ্যে একজন ছিলেন ডা. শামসুল হক। বাকি তিন জন মীর শওকত, মঞ্জুর ও আমি। আবার এদের মধ্যে দু'জন– শওকত ও মঞ্জুরের সম্পর্ক ভালো ছিল না, যা আগেই বলেছি।" (পৃষ্ঠা : ১১৩-১১৪)

"ছলনা ও চাতুর্য দিয়ে এরশাদ জিয়ার আস্থাভাজন হন

এদিকে এরশাদ ধীরে ধীরে জিয়ার কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আস্থাভাজন হওয়ার পথ করলেন। ছলনা ও চতুরতার মাধ্যমে এরশাদ জিয়ার খুব প্রিয়পাত্র হলেন। জিয়াও তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। একসময় জিয়া এরশাদকে সেনাপ্রধান করে নিজে ওই পদ থেকে সরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে জিয়া একদিন আর্মি হেডকোয়ার্টারের সামনের লনে হাঁটতে হাঁটতে কথা প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি জেনারেল মঞ্জুরকে সেনাপ্রধান করার কথা বললাম। জিয়া আমার ওই মতামতকে অন্যভাবে নিলেন। ভাবলেন, আমি আর মঞ্জুর একই পক্ষের। তাই জিয়া আমার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে বললেন, তোমরা দু'জনেই চিফ হবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে। শুধু আমি নই, জিয়ার অন্যান্য সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুগত ও বন্ধু-বান্ধব এরশাদকে সেনাপ্রধান করার বিপক্ষে ছিলেন। এরশাদ তখন জিয়া সরকারের দুর্নীতি দমনের (কো-অর্ডিনেশন সেল) প্রধান সমন্বয়কারী, অথচ তার বিরুদ্ধেই অনেক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীতে কথাবার্তা হতো। এ ছাড়া তার নৈতিক চরিত্র নিয়ে অনেক কানাঘুষা ছিল। সেনাবাহিনীতে এসব নিয়ে তখন কথাবার্তা হতো। এতকিছু সত্ত্বেও জিয়া ১৯৭৯ সালের ২৯ এপ্রিল এরশাদকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করেন। সেনাপ্রধান হওয়ার পর এরশাদ অত্যন্ত সুকৌশলে পদক্ষেপ নিতে লাগলেন। তার নিজের পছন্দের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন পদগুলোতে বহাল করলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের পার্বত্য বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করা হলো। কৌশলে স্পর্শকাতর পদগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে দেওয়া হলো। সেনা ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগগুলোতে তিনি নিজের কাছের লোকদের নিয়োগ করলেন। পরে ক্ষমতা দখলের সময় এসব লোক তাকে সহায়তা করে এবং তাঁর রাজনীতির দোসর হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লে. জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী, যিনি পরে মন্ত্রী হন। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য নিজের পছন্দমতো লোকদের

পাঠিয়ে তিনি তার প্রতি আনুগত্যের জন্য পুরস্কার দিতেন। আর্মি হেড-কোয়ার্টারের একজন পিএসও হিসেবে এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরামর্শ করার কথা। কিন্তু এরশাদ সেটা এড়িয়ে যেতেন।" (পৃষ্ঠা : ১১৬)

"জিয়ার হত্যাকাণ্ড ও এরশাদের তৎপরতা

৩০ মে শুক্রবার আমি তখনও বিছানায় শোয়া। ভোরেই আমার সহকর্মী আর্মি হেড-কোয়ার্টারের পিএসও জেনারেল নুরুদ্দিন (বর্তমানে মন্ত্রী) ফোন করে আমাকে সত্বর সেনাসদরে যেতে বললেন। সে সঙ্গে জানালেন, জেনারেল জিয়া চট্টগ্রামে নিহত হয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে সেনাসদরে উপস্থিত হই। সেখানে গিয়ে দেখি, জেনারেল এরশাদ আগেই উপস্থিত হয়েছেন। এরশাদ ছিলেন সামরিক পোশাক পরিহিত এবং ধীর, স্থির ও শান্ত। আমার পরে সেনাসদরে এলেন আরেক পিএসও জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী (পরে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী)। আমরা জেনারেল এরশাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কী হবে? জেনারেল এরশাদ সরাসরি কোনো উত্তর দিতে চাননি; বরং পরোক্ষ ইঙ্গিতে সামরিক আইন জারির কথা বললেন। আমরা বললাম, সামরিক আইন জারির কোনো যুক্তি বা অবস্থা এখন নেই। উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার আছেন। তিনি তখন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, তখনও পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে জিয়া নিহত হওয়ার খবর জানাননি। আমরা বলার পর জেনারেল এরশাদ গেলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

সকাল ৯টার দিকে জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম থেকে আমার কক্ষেই ফোন করলেন। আমি তখন জেনারেল নুরুদ্দিনের কক্ষে। জেনারেল মঞ্জুর আমাকে আমার অফিসকক্ষে না পেয়ে জেনারেল নুরুদ্দিনের কক্ষে ফোন করেন। ফোনে মঞ্জুর বললেন, 'জেনারেল জিয়ার নিহত হওয়ার ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানাবেন। কিন্তু এ মুহূর্তে সবাই যেন শান্ত থাকে। ঢাকায় আর যেন রক্তক্ষয়, সংঘর্ষ ইত্যাদিতে কেউ জড়িয়ে না পড়ে। আমি আর বলতে পারছি না, অসুবিধা আছে।' এরপর লাইন কেটে যায়। অনেক পরে ১৯৯০ সালে আমি জানতে পারি, জেনারেল মঞ্জুর তখন জুনিয়র অফিসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও চাপের মধ্যে ছিলেন।

হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খালেদ ও মুজাফফর যা বলেন

এ ছাড়া আমি যখন থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (১৯৮৯-৯৩) তখন জিয়া হত্যায় অভিযুক্ত অন্যতম পলাতক আসামি মেজর খালেদ ব্যাংককে ছিলেন। অপর পলাতক আসামি মেজর মুজাফফর ছিলেন ভারতে। ভারত থেকে এসে মেজর মুজাফফর খালেদকে নিয়ে ব্যাংককে আমার সঙ্গে দেখা করেন। জিয়া হত্যার বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ওই হত্যাকাণ্ডের সঠিক তথ্য জানার ইচ্ছা আমার ছিল এবং সেরূপ চেষ্টাও করি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমি যা জেনেছি তা সংক্ষেপে এরকম–

মতি, মাহাবুব ও খালেদের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ২৪ ডিভিশনের জুনিয়র অফিসাররা জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের অজান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সার্কিট হাউস থেকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল– জিয়াকে

চাপ দিয়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় বিশেষ করে সেনাপ্রধান এরশাদসহ অন্যান্য দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্তানপন্থি শাহ আজিজ ও অন্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করানো। কারণ এরশাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হয়রানি বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ঢালাওভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করাসহ সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্নস্তরের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল। মূলত এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাদের ওই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে।

বিদ্রোহের সেই রাতে বেশ ঝড় হচ্ছিল এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া সার্কিট হাউসের দোতলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর ৪টার দিকে অফিসাররা অতর্কিতে সার্কিট হাউস আক্রমণ করেন। ওই আক্রমণের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, তাতে কোনো সৈনিক, জেসিও বা এনসিওকে সরাসরি জড়ানো হয়নি। জুনিয়র অফিসাররা নিজেরাই দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে সার্কিট হাউসে রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করে। পরে এক গ্রুপ গুলি করতে করতে ঝড়ের বেগে সার্কিট হাউসে ঢুকে পড়ে। গুলির শব্দ শুনে জিয়া রুম থেকে বের হয়ে আসেন এবং কয়েকজন অফিসার তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। ওই সময় লে. কর্নেল মতিউর রহমান মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে 'জিয়া কোথায়, জিয়া কোথায়' বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসে এবং পলকেই গজখানেক সামনে থেকে তার চাইনিজ স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন (২৮টি) গুলি জিয়ার উপর চালিয়ে দেয়। অন্তত ২০টি বুলেট জিয়ার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং পুরো শরীর ঝাঁজরা হয়ে যায়। উপস্থিত অন্য অফিসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায়। তারা কোনো গুলি ছোড়েনি। শুধু দু-একজন অফিসার 'কী করছেন, কী করছেন' বলে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।" (পৃষ্ঠা : ১২০-১২২)

মঞ্জুর হত্যা ছিল পরিকল্পিত

এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, জেনারেল মঞ্জুরের অজ্ঞাতসারেই ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে। বস্তুত জিয়া হত্যার পর থেকেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করেন। তৎকালীন কিছু কিছু রাজনীতিবিদের আনাগোনাও শুরু হয়ে যায় সেনানিবাসে। আর এসব লোকের ক্ষমতার পথ কণ্টকহীন করতেই বলির পাঁঠা হতে হয় জেনারেল মঞ্জুরকে। অথচ সেনাবাহিনীতে রটানো হয় যে, মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে সিপাহিরা হত্যা করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মঞ্জুর হত্যার খবর পাই আমার তৎকালীন সহকর্মী সিজিএস মেজর জেনারেল নুরুদ্দীনের কাছ থেকে। ঐদিন দুপুরে তাঁর অফিসে আমি নিজ থেকে যখন মঞ্জুর সম্পর্কে জানতে চাই তখন তিনি আমাকে বলেন, 'মঞ্জুরকে স্কট করে সেনানিবাসের ভেতর দিয়ে অন্তরীণ করার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় সৈনিকরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে।'

আর্মির মুক্তিযোদ্ধা অফিসার নিধনের নীলনকশা

দুই-তিন দিনের মধ্যে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আমি দেখলাম জিয়া-হত্যার সুযোগে জেনারেল এরশাদ ও অমুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন সিনিয়র অফিসার

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের শায়েস্তা ও সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের এরা সন্দেহ ও হয়রানি করতে লাগল আরো বেশি করে। তারা আমাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমার বাসার চারদিকে সিভিল ড্রেসে ডিজিএফআই-এর লোকজন লাগানো হলো। খোলাখুলিভাবে আমাকে অনেকটা নজরবন্দির মতো রাখা হলো। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর বিচারপতি সাত্তার যদিও রাষ্ট্রপতি ছিলেন, কিন্তু কার্যত এরশাদ সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। তিনি নিজের লোকদের পছন্দমাফিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের কোণঠাসা করতে লাগলেন বিনা বাধায়।

জেনারেল এরশাদের আদেশে জিয়া হত্যার পর গ্রেপ্তারকৃত অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো, যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করা যায়। তদন্ত কমিটি গঠন করার সময় যখন তদন্তের বিষয় নিশ্চিত করার আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল তখন আমি প্রস্তাব দিই যে, কী কারণে অফিসাররা ওই বিদ্রোহ করল তাও এ তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অকারণে কখনও বিদ্রোহ হয় না। কিন্তু তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ আমার ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। তাই অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে ওই তদন্তের আদেশে আমার স্বাক্ষর করার কথা থাকলেও আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানাই। ফলে জেনারেল এরশাদ নিজেই ওই তদন্তের আদেশে স্বাক্ষর করেন। খুব তাড়াহুড়া করেই তদন্ত কমিটি গঠিত হলো। তৎকালীন মেজর জেনারেল (বর্তমানে অব.) মোজাম্মেলের সভাপতিত্বে তদন্ত অনুষ্ঠিত হলো। তদন্তে ৩৩ জন অফিসার ও দু'জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে কোর্ট মার্শাল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা। তারপর তাদের কোর্ট মার্শালের জন্য একটি কোর্ট গঠন করা হলো। কোর্ট মার্শালের সভাপতি করা হলো তৎকালীন মেজর জেনারেল (বর্তমানে মৃত) আব্দুর রহমানকে। সব আইনকানুন ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে চট্টগ্রামের বেসামরিক জেলখানায় বিচারকার্য চলে। অভিযুক্তদের ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বিচার করা হয়। তদন্তের সময় তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও ওঠে। সামরিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক আইনজীবীরাও এরকম কোর্ট মার্শালে অভিযুক্তদের পক্ষে কৌশলী নিয়োজিত হতে পারেন। কিন্তু তাদের কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো সেনাবাহিনীর অফিসার দ্বারা অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করে দেন। এতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আগে থেকেই এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ প্রহসনের কোর্ট মার্শালে ১৩ জন অফিসারের ফাঁসি এবং ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।" (পৃষ্ঠা : ১২৫ ও ১২৬)

এরশাদের প্রকাশ্য তৎপরতা

১৯৮১ সালের নভেম্বরে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী এবং ড. কামাল হোসেন ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী। নির্বাচনে সেনাবাহিনী বিএনপি প্রার্থী সাত্তারকে খোলাখুলি সমর্থন দিল। সাত্তার রাষ্ট্রপতি

পদে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তারের ক্ষমতাগ্রহণের পর সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রাখা উচিত বলে দাবি তোলেন। চাকরিরত একজন সেনাপ্রধান একজন রাষ্ট্রপতির কাছে পত্রিকায় প্রবন্ধের মাধ্যমে এ রকম দাবি তুলে ধরায় অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হন। সেনাপ্রধান এরশাদের প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর জেনারেল ওসমানী পত্রিকার মাধ্যমে তার সমালোচনা করে বলেন, এটা গণতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু এর পরের দিনই লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন (অব.) পত্রিকায় আরেকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এরশাদকে সমর্থন করেন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের কথা আগেই বলেছি। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগমনের দিন জেনারেল ওসমানী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। যাহোক, ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এ সুযোগে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতালাভের পথও সহজ হয়ে উঠছিল। বিএনপির অনেক নেতা, মন্ত্রী এবং কয়েকজন সচিব ও বিভিন্ন দলের পরিচিত লোকজন জেনারেল এরশাদের সঙ্গে গোপনে এবং সময় সময় খোলাখুলিভাবে বৈঠক ও শলাপরামর্শ করতেন। পরে এদের অনেকেই এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্য হন এবং বিভিন্ন রকম ফায়দা লুটেন। এসব কার্যকলাপে সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী ও আরো কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। এরা কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও কয়েকজন সচিবের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালাভের পরিকল্পনার চূড়ান্তরূপ দিচ্ছিলেন। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর এসব মন্ত্রী, সচিব ও রাজনীতিবিদ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা তেমন কোনো গোপন বিষয় ছিল না। কারণ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, বেসামরিক কর্মকর্তা ও আর্মির সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে তাঁর কার্যকলাপ ছিল মূলত তৎকালীন সরকারের প্রতি চরম অবজ্ঞাসূচক। যদিও রাষ্ট্রপতি সাত্তার এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার মতো ক্ষমতা তার সরকারের ছিল না। আর্মিকে মোটামুটি মুক্তিযোদ্ধাবিহীন করে পুরো আর্মিকে এরশাদ তার কব্জায় নিয়ে আসেন। বলতে গেলে ওই সময় আর্মিতে তৎকালীন সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণই ছিল না।" (পৃষ্ঠা : ১৩৩ ও ১৩৪)

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের বক্তব্যের বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে যা কিছু জানা গেল তাতে কয়েকটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়; যা জেনারেল এরশাদের বিপক্ষে যায়।

১. জিয়া হত্যার তদন্ত কমিটি গঠন করার সময় সেনাপ্রধানের নিকট মে. জে. মইন প্রস্তাব দিলেন, যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের 'মোটিভ' কী ছিল তাও তদন্তের বিষয় হওয়া উচিত। এরশাদ এ প্রস্তাব কেন গ্রহণ করলেন না? এ প্রস্তাব তো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল। প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্ত যারা গ্রহণ করল তাদের আসল উদ্দেশ্য জানা খুবই প্রয়োজন ছিল।

২. ৩০ মে শেষ রাতে জিয়া হত্যার ৫ ঘণ্টা পর জেনারেল মঞ্জুর ঢাকায় জেনারেল নুরুদ্দীনের কক্ষে ফোন করেন। কতক অফিসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি ফোন করে থাকলে নিশ্চয়ই সেনানিবাস থেকেই ফোন করে থাকবেন। তাহলে তিনি কেমন করে সপরিবারে পালালেন?

৩. সামরিক আদালতে বিচারের জন্য সেনানিবাস এলাকার বদলে চট্টগ্রামের বেসামরিক জেলখানাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো?

৪. বিচারের সময় অভিযুক্তদের বেসামরিক উকিল নিযুক্ত করার সুযোগ কেন দেওয়া হয়নি?

৫. ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাগ্রহণের পর সেনাপ্রধান প্রবন্ধাকারে পত্রিকায় জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন ও রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা রাখা উচিত বলে দাবি তোলেন। সেনাপ্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের পূর্ণ আনুগত্যের যে ওয়াদা করেছিলেন ঐ প্রবন্ধ শপথের বিরোধী কি-না?

২০৬.

ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্যোগ

ইতঃপূর্বে লিখেছি যে, ১৯৭৮ সালে ৭ বছর পর জুলাই মাসে দেশে ফিরে এলাম। আগস্ট মাসেই রমযান মাস এল। জীবনে পয়লা ই'তিকাফ করার সৌভাগ্য হলো। ই'তিকাফের সময়ই দেশে আসার পর ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে একটি পুস্তিকা রচনা করি। বইটি ১৯৭৮ সালের নভেম্বরেই মুদ্রিত হয়।

এ বইটি দিয়েই ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রথমে বইটি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম (মরহুম), মাওলানা সাইয়েদ কামালউদ্দিন জাফরী ও আজিমপুর গোরস্থান মসজিদের খতীব ও মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে দিলাম। চট্টগ্রামে বাইতুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বারের নিকটও পাঠালাম। চরমোনাই পীর মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল

করীমের নিকট তার ভগ্নিপতি মাওলানা বেলায়েত হোসেনের মাধ্যমে পাঠালাম। টঙ্গীতে তাবলীগী এজতেমায় গিয়ে আমীর মাওলানা আবদুল আযীযের হাতে দিলাম। সিলেটের গৌরিয়ার শায়খ মাওলানা আবদুল করীমের বাসায় গিয়ে তার খেদমতে পেশ করলাম।

বিশিষ্ট ওলামা-মাশায়েখের নিকট 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' পুস্তিকাটি পৌঁছানোর জন্য একজন আলেম মনে মনে তালাশ করছিলাম, যিনি দেশে সফর করার সময় দিতে পারেন। কিছু দিন পরই চানপুর জেলাস্থ হাইমচর থানার মাওলানা আবদুল মজীদ এসে উপস্থিত হলেন। পাকিস্তান আমলে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল। অনেক বছর পর তাঁকে দেখে খুশি হলাম। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামেল পাস করেন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখে আপনার সাথে দেখা করার জন্য আসতে বাধ্য হলাম। উৎসুক ও বিস্মিত হয়ে স্বপ্নের কথা জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, স্বপ্নে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে দেখা। মাওলানা আমাকে হুকুম দিলেন, সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? এটা এমন বিরাট কাজ, যা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই আপনার কাছে এলাম।

আমি আনন্দের সাথে তাঁর সাথে কোলাকুলি করে বললাম, আপনার মতো একজন লোকই আমি কামনা করছিলাম। মনে হয় আল্লাহ তাআলাই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমার অতি প্রয়োজনীয় মেহমান।

'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' পুস্তিকাটি তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ। বইটি পড়ে তিনি আনন্দের আতিশয্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার স্বপ্ন সার্থক। আমি বললাম, যথাসময়েই আপনি হাজির হয়েছেন। বই প্রকাশের পূর্বে যদি আসতেন তাহলে আপনাকে কোন দায়িত্ব দিতে পারতাম না। এমন সময় হাজির হয়েছেন, যখন আপনার জন্য কাজ একেবারে রেডি।

বই বিলির ব্যবস্থা হলো

তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বিশিষ্ট ওলামা ও মাশায়েখের নিকট বইটি পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। শুধু যাতায়াত খরচ নিয়েই তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

কিছু দিন পর জানা গেল, কওমী মাদরাসার আলেমগণের নিকট তাদের মধ্য থেকে কোন আলেম যোগাযোগ না করলে সাড়া পাওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহর মেহেরবানীতে এমন একজন আলেমও পাওয়া গেল। একদিন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম ফোনে আমাকে জানালেন, কাওমী মাদরাসার একজন যোগ্য আলেম পাওয়া গেছে, যিনি ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। আমি এক ওয়াজের মাহফিলে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানায় গেলাম। সেখানে তিনি আমাকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'পাকিস্তান আমলে আপনি ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন। ইসলাম কি কায়েম হয়ে গিয়েছে? তাহলে এখন সংগ্রাম নেই কেন?' তাঁর কথায় আমি বুঝতে পারলাম, যে

উদ্দেশ্যে আপনি কওমী লাইনের একজন আলেম তালাশ করছেন, এর জন্য তিনি যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাথে নিয়ে এসেছি। মাওলানা মাসুম চমৎকার রসিকতার সাথে কথা বলতেন। আমি তাঁকে বললাম, এখনই 'আসামি'কে আমার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।

মাওলানা মাসুম খুবই গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একটি ছোট্ট মোটর গাড়ি নিজেই চালাতেন। তাঁর গাড়িতেই তিনি আসামিকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলেন। আমার সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, মাওলানা মাযহারুল হক দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা হোসাইন আহমদের সরাসরি শাগরিদ। তিনি প্রখ্যাত কারী ইবরাহীম (র)-এর প্রতিষ্ঠিত উযানী কওমী মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নেযামে ইসলাম পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় আইন-পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

তাঁর এ পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলাম। মাওলানা মাসুমের উপস্থিতিতেই তাঁকে বললাম, ইসলামী ঐক্যের পক্ষে আপনার জযবার কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম।

১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টির মধ্যে এ সমঝোতা হয়েছিল যে, নির্বাচনে একই আসনে এ দু'দলের প্রার্থী দেওয়া হবে না এবং উভয় দলের লোক এ দু'দলের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনে কাজ করবে। এদিক দিয়ে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই মনে করি।

কিন্তু জামায়াতে ইসলামীসহ দেশের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের উদ্দেশ্যে আপনি যখন কওমী ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন হয় তো জামায়াত ও মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে কতক প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। আপনার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা মাদানী (র)-সহ আরও কতক ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য রয়েছে; যা হয়তো আপনার জানা আছে। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং জামায়াত মাওলানার রচিত তাফসীর, সীরাত ও বিরাট ইসলামী সাহিত্য প্রচার করে থাকে। আপনি যাদের সাথে ঐক্যের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবেন তারা অবশ্যই আপত্তি তুলবেন। তাই যোগাযোগ শুরুর পূর্বে আপনি মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য ভালোভাবে পড়ে দেখুন। আমার নিকট উর্দু ভাষায় মাওলানার লেখা সকল বই-ই আছে।

আপনি আমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে থাকুন এবং মাওলানা মওদূদীর সকল বই আপনার সামনে হাজির থাকবে। ধীরে-সুস্থে আপনি পড়ে যখন ওলামায়ে কেরামের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম বলে মনে করবেন, তখন যোগাযোগ শুরু করবেন। তিনি আমার প্রস্তাব কবুল করলেন।

তিনি রাতদিন বইগুলো দেখতে থাকলেন। বিশেষ করে রাসায়েল ও মাসায়েলের সব

কয়টি খণ্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে চার দিন পরই তিনি জানালেন, আমার এতমিনান হয়ে গেছে। যে কয়টি আপত্তির কথা এ পর্যন্ত শুনেছি সে কয়টিতে এতমিনান হওয়ার পর আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা আমি প্রয়োজন মনে করি না।

সাড়া পাওয়া গেল

মাওলানা আবদুল মজিদ ও মাওলানা মাযহারুল হক আমার লেখা বইটি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন। আমি যাদেরকে বইটি দিয়েছি তাঁদের মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে তো ১৯৭৭ সালে লন্ডনেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাই তিনি বই পড়ার আগে থেকেই ঐক্যপ্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম ও মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী আগ্রহী হলেন। চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বারও সাড়া দিলেন।

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ বিনা খবরে চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম আমার বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল না। তাঁর মরহুম আব্বা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আইয়ূব খানের সামরিক শাসনামলে তাঁর সভাপতিত্বে বেশ কয়েকটি সভায় আমি বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি মাওলানা আবদুর রহীমের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে একটি লঞ্চ দিয়ে সাহায্য করেন।

পীর সাহেবের আগমনে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলাম এবং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। বললাম, কোনো খবর না দিয়েই এলেন? তিনি বললেন, আপনার বইটি পড়ে আসতে বাধ্য হলাম। আপনার সাথে আমার চিন্তার মিল হয়েছে। সকল ইসলামী শক্তিকে একমঞ্চে একত্রিত করার যে ফর্মুলা আপনি পেশ করেছেন তা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি বললাম, আমি তো প্রস্তাবক মাত্র। যারা ইসলামী ঐক্যের এ ফর্মুলা পছন্দ করেন, তারা একটি কমিটি গঠন করে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। আমি পূর্ণ সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ।

কমিটি গঠিত হলো

১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুমকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠিত হয়। মাওলানা সাঈদী, মাওলানা জাফরী, মাওলানা আবদুল্লাহ, বাইতুশ শরফের পীর সাহেব, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং যোগাযোগকারী দু'জন মাওলানা আবদুল মজীদ ও মাওলানা মাযহারুল হক ঐ কমিটির প্রাথমিক পর্যায়ে সদস্য হন।

কয়েক মাস পরপর যখন কমিটির বৈঠক হয় তখন আমাকেও আলোচনায় শরীক করা হয়; যদিও আমি কমিটির সদস্য ছিলাম না। ক্রমে ক্রমে কমিটির সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। যোগাযোগকারীগণ কমিটির বৈঠকে রিপোর্ট করতে থাকেন যে, তারা কিরূপ সাড়া পাচ্ছেন।

১৯৮০ সালের শেষ দিকে কমিটি সম্মেলন আহ্বান করার চিন্তা শুরু করে। আমি পরামর্শ দিলাম, এ কাজটি তাড়াহুড়া করে করার মতো কাজ নয়। সকল মহলের সাথে যোগাযোগ করতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাতে ক্ষতি নেই।

সম্মেলনের প্রস্তুতি

১৯৭৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত আড়াই বছর উল্লেখযোগ্য সকল মহলের সাথে যোগাযোগের পর ১০ জুন বাইতুশ শরফের পীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট এন্তেজামিয়া কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির উদ্যোগে ৬ আগস্ট (১৯৮১) ঢাকার টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা হয়। এ বৈঠকে আমিও উপস্থিত হই।

ঐ বৈঠকেই ইসলামী ঐক্যমঞ্চের নাম কী রাখা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন নামের প্রস্তাব এল। এটা শুধু 'আলেমগণের ঐক্য' নয়; 'মুসলিম জনগণের ঐক্য' হওয়া উচিত। সে কারণেই দীর্ঘ আলোচনার পর 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামটি সর্বসম্মতভাবে পছন্দ করা হয়। এ নামটির প্রস্তাবক ছিলেন অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক; যিনি জামায়াতের এক সময়ের রুকন, দৈনিক সংগ্রামের সাবেক সম্পাদক, বর্তমানে খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর।

ঐ দিনই (৬ আগস্ট '৮১) টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে ৮৫ জন আলেম, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদের এক বৈঠকে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' নামে একটি ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী ঐক্য সংগঠন কায়েমের উদ্দেশ্যে ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি আগা-গোড়াই সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছি। আমি সংগঠকের ভূমিকা পালন করা সঠিক মনে করিনি। এ কাজটি ওলামা-মাশায়েখের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় হোক, এটাই আমার কামনা ছিল। এ কারণেই কোথাও কোন কমিটিতে আমার নাম রাখা হয়নি। আমি একজন প্রস্তাবক, সহায়ক ও পরামর্শদাতার ভূমিকা পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৮১ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে প্রায় ৩০০ জন আলেম, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ জাতীয় একটি সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করা সহজ ছিল না। মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব লুৎফুর রহমান এবং মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা সিরাজুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এমন একটি সম্মেলনের আয়োজন করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। এ ভাষণটি এন্তেজামিয়া কমিটির একান্ত প্রচেষ্টায় সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সবাই এ ভাষণের দ্বারা অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হন। সকলের মধ্যে ঐক্যের পক্ষে গভীর জযবা ও পরম উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি রয়েছে। এ দেশে ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা কয়েক লাখ। হাজার হাজার মাদরাসার মাধ্যমে প্রতি বছর লাখ লাখ আলেম তৈরি হচ্ছে। এসব মাদরাসার সাথে মুসলিম জনগণের আর্থিক সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থন রয়েছে। অগণিত হক্কানী পীর ও মাশায়েখের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ আল্লাহ তাআলা ও রাসূল (স)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার সুযোগ পাচ্ছে। বহুসংখ্যক যোগ্য ওয়ায়েজ মারফতে বিপুলসংখ্যক লোক ইসলামের বুনিয়াদি জ্ঞান ও জিহাদী জযবা হাসিল করেছে। তাবলীগ জামায়াতের উসিলায় অগণিত লোক কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও নামায সহীহভাবে শেখার সাথে সাথে আখেরাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় দু'লাখ মসজিদ দেশের তৌহিদী জনতার সাক্ষ্য বহন করছে। মসজিদে কুরআনের তাফসীর চর্চা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এখন অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। ইসলামী চেতনা জনগণের মধ্যে এ পরিমাণ রয়েছে যে, ইসলামবিরোধীরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস পায় না।

কিন্তু এ দেশের ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন থাকায় ইসলামবিরোধীরা বিদেশী ভ্রান্ত মতবাদ ও অপসংস্কৃতি দ্বারা যুবসমাজকে কলুষিত করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়াজ, তাবলীগ, ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে যাঁরা নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দীন-ইসলামের মহান খেদমত করছেন, তাঁদের ঐক্য ব্যতীত ইসলামের বিজয় কখনো সম্ভব নয়। এসব খেদমতে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সবাইকে সবার খেদমতের কদর করা উচিত।

মাদরাসা আছে বলেই মসজিদ আবাদ আছে। ওয়াজ, খানকাহ ও তাবলীগ আছে বলেই অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও ইসলামী জযবা কায়েম আছে। ইসলামী সাহিত্য থাকায়ই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইসলামের আলো পাচ্ছে। তাই এ খেদমতগুলো সবই পরস্পর পরিপূরক। এর কোনোটার গুরুত্বই কম নয়। সবার মিলিত খেদমতের ফলেই কুরআন ও সুন্নাহর আলো এখনো বেঁচে আছে।

মাদরাসা দ্বারা দীনের যে খেদমত হচ্ছে তা তাবলীগ দ্বারা সম্ভব নয়। তাবলীগ জামাত জনগণের মধ্যে দীনের যে কাজ করছে, তা মাদরাসার পক্ষে এভাবে করা অসম্ভব। ওয়ায়েজের মাধ্যমে অশিক্ষিত জনগণের নিকট যতটুকু দীনী শিক্ষা পৌঁছতে পারছে তা ইসলামী সাহিত্য দ্বারা কখনও সম্ভব হতো না। তাই আসুন, আমরা সবাই সবার খেদমতকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করি। ইখলাসের সাথে যে যতটুকু কাজ করছেন সেটুকুই আল্লাহ তাআলা নিকট মূল্যবান বলে গণ্য হবে। নিজের খেদমতকে বড় মনে করে অন্যদের খেদমতকে নগণ্য বলে ধারণা করলে অহংকারই প্রকাশ পায়। আর অহংকারীর কোন খেদমতই মনিবের দরবারে কবুল হয় না।

আজ আমরা উদার মন নিয়ে সবার দীনী খেদমতকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা সবাই ইখলাসের সাথে উপলব্ধি করছি যে, এ সকল খেদমতই একে অপরের সহায়ক ও

পরিপূরক। সব খেদমত মিলেই দীনের বিরাট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এসব খেদমত একসাথে করার ক্ষমতা কারো নেই। আমরা সবাই বিভিন্নভাবে একই দীনের খেদমত করে যাচ্ছি। কোনো খেদমতকেই আমরা নগণ্য মনে করি না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের খেদমতই মহা মূল্যবান।

বর্তমানে এ দেশে যাঁরা বিভিন্নভাবে দীনের খেদমত করছেন তাদের কোন ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ নেই বলে দেশের ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। উপরিউক্ত উদার মন নিয়ে সব খেদমতকে স্বীকার করলে এসব বিচ্ছিন্ন শক্তি ইনশআল্লাহ এমন ঐক্যবদ্ধ মযবুত শক্তিতে পরিণত হবে, যা ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন নাজুক যে, ভারত বা রাশিয়া এ দেশকে আফগানিস্তানের মতো কুক্ষিগত করার সুযোগ নিতে পারে। আফগানিস্তানের ইসলামী শক্তিগুলো দেশ থেকে হিজরত করে (১৯৮১ সাল) বিদেশে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার পুতুল বারবাক সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি এসব ইসলামী শক্তি আগেই এমন ঐক্যবদ্ধ হতো তাহলে হয়তো তাদের হিজরত করার দরকারই হতো না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের কোনো ঐক্যশক্তি সৃষ্টি হলে ইসলামের বিদেশী দুশমন ও দেশী মীরজাফররা এদেশকে আফগানিস্তানের মতো দুর্দশায় ঠেলে দিতে পারবে না। কিন্তু 'খোদা না খাস্তা' যদি ইসলামী ঐক্যের অভাবে এ দেশে সে জাতীয় কোনো বিপদ নেমে আসে, তাহলে আমরা আশে পাশে কোথাও কোন আশ্রয় পাব না। তাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও ইসলামী ঐক্য অপরিহার্য।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দীনের সকল খাদেমের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যারা সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে শুধু নিজ নিজ খেদমতের গুরুত্বই বোঝেন কিন্তু অন্যান্য খেদমতকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন না, এ ভাষণ তাদের সকলের মধ্যে উদার মনোভাবের জযবা সৃষ্টি করে। সম্মেলনের সকল ডেলিগেটের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সকল ইসলামী মহল ঐক্যবদ্ধ হলে সকল খাদেম পরস্পর ঘনিষ্ঠ বোধ করবেন এবং এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হবেন বলে সবাই উপলব্ধি করেন। সম্মেলনে ইসলামী উখওয়াতের চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়; যা সবাইকে আপ্লুত করে।

২০৭.

ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ : এক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ

১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' নামে যে ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয় তাতে সকল দীনী মহল প্রথমে শামিল না হলেও এর পূর্বে এতটা ব্যাপক ঐক্য কখনো দেখা যায়নি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে সভাপতি ও সেক্রেটারি পদ না দিয়ে ঐক্যের স্বার্থেই বিভিন্ন মহলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী বা সভাপতি পরিষদ) গঠন করা হয়। শুধু মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে কোন একজনকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভা পরিচালনা করা

হয়। যারা ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশের মজলিসে সাদারাতের সদস্য হন তাদের তালিকা থেকে এ ঐক্যমঞ্চটি কতটা ব্যাপকভিত্তিক সে বিষয়ে ধারণা করা যায়।

কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের সদস্যবৃন্দ

১. মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আহাদ আল্ মাদানী (আওলাদে রাসূল), চট্টগ্রাম।

২. খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, নেজামে ইসলাম পার্টি।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, পীর সাহেব, বায়তুশ্ শরফ, চট্টগ্রাম।

৪. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম, পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল।

৫. মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ছিদ্দীক, পীর সাহেব, শর্ষিনা, বরিশাল।

৬. মাওলানা সাইয়েদ মোসলেহ উদ্দীন, নেজামে ইসলাম পার্টি, কুমিল্লা।

৭. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুফাসসিরে কুরআন, ঢাকা।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রিন্সিপাল, মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।

৯. মাওলানা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ শাহ্, পীর সাহেব, নওয়াপাড়া, যশোর।

১০. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, পীর সাহেব, সুইহারী, দিনাজপুর।

১১. মাওলানা মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ, প্রিন্সিপাল, মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা, বগুড়া।

১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, পীর সাহেব, গারাঙ্গীয়া, চট্টগ্রাম।

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ বশীরুল্লাহ আত্হারী, ইমাম, জামে-কসাই মসজিদ, বরিশাল।

১৪. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম, মুফাসসিরে কুরআন, ঢাকা।

১৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক, পাবনা।

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক, পীর সাহেব, দুধমুখা, ফেনী।

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল হক, সাবেক মুহতামিম, উজানী মাদরাসা, কুমিল্লা।

১৮. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, পেশ ইমাম, চকবাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

১৯. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

২০. মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন খান, সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

২১. মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান খান, শায়খুল হাদীস, জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।

২২. মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী, ঢাকা।

২৩. মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম হক্কানী, পীর সাহেব, আড়াইবাড়ি, কুমিল্লা।

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের, মুফাসসিরে কুরআন, খুলনা।

২৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রিন্সিপাল, নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসা, খুলনা।

২৬. মাওলানা আলহাজ্জ মোহাম্মদ আকীল, জমিয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা।

২৭. মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুল্লাহ, প্রিন্সিপাল, ইসলামিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।

২৮. মাওলানা আবদুস সাত্তার, খতীব, কাপ্তান বাজার মসজিদ, ঢাকা।

২৯. বিচারপতি মোঃ বাকের, ঢাকা।

৩০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১. মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ আলী, পরিচালক, দারুল আরাবিয়া, ঢাকা।

৩২. খন্দকার আবদুল হামীদ, কলামিস্ট ও সাবেক মন্ত্রী, ঢাকা।

সম্মেলনে যারা বক্তব্য রাখেন

যারা মজলিসে সাদারাতের সদস্য তারা তো দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে বক্তব্য অবশ্যই রেখেছেন। তাদের বাইরেও যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রেখেছেন তাদের তালিকা থেকেও ঐক্যমঞ্চের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইমাম, আজীমপুর গোরস্থান মসজিদ।

২. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক।

৩. মাওলানা আবদুল লতীফ, ফেনী।

৪. মাওলানা লুৎফুর রহমান, লক্ষ্মীপুর।

৫. মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ, শায়খুল হাদীস, ঢাকা।

৬. অধ্যাপক মাওলানা মুনীরুয্যামান ফরিদী, ফরিদপুর।

৭. মাওলানা সরদার মুহাম্মদ আবদুস সালাম, বরিশাল।

৮. অধ্যাপক মাওলানা ইমদাদুল হক, গোপালগঞ্জ।

৯. মাওলানা আবদুল কাদের, মুফাসসিরে কুরআন, খুলনা।

১০. মাওলানা আবুল খায়ের যশোরী।

১১. মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, সাংবাদিক।

১২. মাওলানা আবদুস সাত্তার ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম।

১৩. অধ্যাপক মাওলানা আবুল খায়ের।

১৪. মাওলানা আবদুল মালেক, মুহাদ্দিস, সিলেট।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মসূচি

ইত্তেহাদুল উম্মাহ যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক ঐক্যের ডাক দিয়েছে তাতে বিপুল সাড়া জেগেছে। ইনশাআল্লাহ এ ঐক্য অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। সব মহলের ঐক্য স্থাপিত হলে ময়দানের দাবি অনুযায়ী ধাপে ধাপে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর কর্মসূচি অবশ্যই প্রণীত হবে। প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠনতন্ত্রে যে ৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, তার ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এ কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত ইসলামবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উৎপাটিত করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুরোপুরি ইসলামী ছাঁচে রূপান্তরিত করা।"

এর চেয়ে বড় বিপ্লবী উদ্দেশ্য আর কী থাকতে পারে? কিন্তু এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে বিপ্লবী কর্মসূচি দরকার তা এখনই রচনা করা সম্ভব নয়। যাঁরা ইসলামী বিপ্লব চান তাঁরা এ প্লাটফর্মে সমবেত হলে আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে কর্মসূচিও বিস্তার লাভ করবে। 'বিপ্লবী কর্মসূচি নেই'— এ অজুহাত দেখিয়ে যারা এতে শরীক হবেন না, ইসলামী বিপ্লব তাদের নিকট চিরদিন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

প্রাথমিক পাঁচ দফা কর্মসূচি

'আল আমরু বিল মারূফ, ওয়ান-নাহী আনিল মুনকার'-এর যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা ও রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অর্পণ করা হয়েছে, সেই দীনী দায়িত্ব পালনই এ সংগঠনের কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত ইসলামবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুরোপুরি ইসলামী ছাঁচে রূপান্তরিত করা। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতিস্বরূপ এ সংগঠন ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

১. ইসলাম সম্পর্কে যেসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ নেই সেসব বিষয়ের তালিকা প্রকাশ করবে। এতে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন গঠন সম্পর্কে ইসলামী বিধানে বুনিয়াদী কোন মতভেদ নেই। এর ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জাহেলিয়াত ও বিদ্‌আতের শক্তি খর্ব হবে।

২. দেশের সরকার যা কিছু করেছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে সঠিক বক্তব্য পেশ করবে। ফলে সরকার ভুল করলে সংশোধনের সুযোগ পাবে। কোনো বিষয়ে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় প্রকাশ করলে সরকার সহজে তা অমান্য করার সাহসও করবে না।

৩. যারা দেশ শাসন করেন এবং যারা শাসনক্ষমতায় আসতে চান তাদেরকে ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করবে; যাতে ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে তারা তৌহিদী জনতার ভাবানুভূতির বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত না গ্রহণ না করেন।

৪. সকল দীনী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালাবে এবং কোথাও বিরোধ দেখা দিলে মীমাংসায় পৌছতে সাহায্য করবে। ইখতিলাফযুক্ত বিষয়ে যাতে ই'তিদালের সীমা বজায় থাকে সে উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সহযোগিতা করবে এবং পারস্পরিক মুখালিফাতের ফলে জনগণের নিকট ইসলামের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

৫. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল-আখলাক বিনষ্ট করে সে সব যাতে সমাজে চালু থাকতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতি

অতীতের সকল অভিজ্ঞতার আলোকে ইত্তেহাদুল উম্মাহ ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন কতক মূলনীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে ঐক্যের পথে কোনো সমস্যা দেখা দিতে না পারে। সেসব সুচিন্তিত মূলনীতি গ্রহণ করার ফলে কোনো মহল বা কোনো মাক্‌তাবে-খেয়ালের লোকের পক্ষেই ইত্তেহাদুল উম্মাহ'তে শরীক হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই। নিম্নে সে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ব্যাপক ঐক্য সম্পর্কে মূলনীতি

ক. মুসলমানদের কোন দলকেই ইসলামী ঐক্যে আনতে আপত্তি তোলা যাবে না। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

খ. যত রকম মতপার্থক্যই থাকুক, যারা ইসলাম থেকে খারিজ নয় তাদের সবাইকেই এক পতাকাতলে সমবেত করতে হবে।

গ. যদি কোনো মহল ঐক্যে শামিল হওয়ার জন্য শর্ত পেশ করে যে, 'অমুক মহল, ফেরকা বা দলকে বাদ দিতে হবে' তাহলে এমন শর্ত কবুল করা হবে না। কারণ, এভাবে বাদ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলে পূর্ণ ঐক্য হতে পারে না।

ঘ. শুধু ওলামা-মাশায়েখের ঐক্যই যথেষ্ট নয়; সকল শ্রেণী ও পেশার মুসলমানকেই ঐক্যে শরীক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মাহর সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি হয়।

ঙ. হানাফী ও আহলে হাদীস, দেওবন্দী ও বেরেলভী, আলিয়া ও কাওমী ইত্যাদি নামে যত বিভেদই থাকুক, ইত্তেহাদুল উম্মাহতে সবাইকে সাদরে গ্রহণ করা হবে।

২. ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতৃত্বের ব্যাপারে মূলনীতি

ক. সকল মহলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুসলিম উম্মাহ'র সামগ্রিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

খ. ইত্তেহাদুল উম্মাহতে সকল মহলের নেতৃবৃন্দের ঐক্যের ফলে যখন সম্মিলিত নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে, তখন সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো এক ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া যাবে।

গ. সব সময়ই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো অবস্থায়ই নেতৃত্বের জন্য কোনো রকম প্রতিযোগিতা বা কোন্দলের পরিবেশ যেন সৃষ্টি হতে না পারে।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মূলনীতি

ক. যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

খ. কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে, সে সম্পর্কেও সর্বসম্মতভাবে ফায়সালা নিতে হবে।

গ. কোনো ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো এক মতের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

৪. বিভিন্ন মত, পথ ও দলের মর্যাদা সম্পর্কে মূলনীতি

ক. ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্লাটফর্মে কোনো এক দলের প্রাধান্য থাকবে না। এখানে শরীক সবারই মর্যাদা সমান।

খ. প্রত্যেক দল ও মাসলাকের লোক নিজস্ব সংগঠনের কাজ আগের মতোই স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন।

৫. রাজনৈতিক বিষয়ে মূলনীতি

ক. ইত্তেহাদুল উম্মাহ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও এতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাবে।

খ. যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামের স্বার্থে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে শরীক হবেন, তাঁরা নিজস্ব দলীয় কর্মসূচি আগের মতোই চালিয়ে যেতে পারবেন।

গ. ইত্তেহাদুল উম্মাহ সরাসরি নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবে না। কিন্তু নির্বাচনের সময় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সে উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহ সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে কোনো ইসলামী মহলই এ ঐক্যের বাইরে না থাকে এবং মতপার্থক্যের কারণে ঐক্য বিনষ্ট হতে না পারে।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর সাংগঠনিক কাঠামো এমন রাখা হয়েছে, যাতে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকে এবং নেতৃত্ব নিয়ে কোনো রকম কোন্দল সৃষ্টি না হয়। সংগঠনের কোনো একজনকে সভাপতি না করে বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিত্বকারীগণের সমন্বয়ে যৌথ সভাপতিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মেলনের সাফল্যে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম

এ সম্মেলনের মাধ্যমে আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল হওয়ায় মহান মা'বুদের প্রতি শুকরিয়ায় প্রাণ ভরে গেল এবং মন-মগজ পরম তৃপ্তিবোধ করল। আমি সশরীরে সম্মেলনে হাজির না হলেও মন-প্রাণ সেখানেই পড়ে ছিল। কাতরভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়েছিলাম, সম্মেলন যাতে পূর্ণরূপে সফল হয়।

সম্মেলনের পরপরই মাওলানা সাঈদী সাহেব এসে আবেগের সাথে কোলাকুলি করলেন এবং সম্মেলন সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, আপনি ঘরে বসে থেকেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর মতো একটি ঐক্যমঞ্চ তৈরি করতে সক্ষম হলেন। আমি বললাম, আমি তো শুধু প্রস্তাবক ও পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করেছি। আপনারা এখলাসের সাথে প্রচেষ্টা চালানোর ফলে আল্লাহ তাআলা আপনাদের সাফল্য দান করেছেন। ঐক্যের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ। এখন এ ঐক্যমঞ্চকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে আপনাদের অনেক মেহনত করতে হবে।

মাওলানা সাঈদীর বিশেষ বিবরণ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আমার নিকট সম্মেলনের বিবরণ দিতে গিয়ে এমন

একটা বিষয় জানালেন, যা শুনে আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন, সম্মেলনে উপস্থিত ৩০০ ডেলিগেট সবাই যোগ্য ওয়ায়েয। তারা বক্তৃতায় শ্রোতাদের কাঁদান ও হাসান। নিজেরা না কাঁদলেও অনেকের বক্তব্য শুনে জনগণ কাঁদে।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি, পটিয়া মাদরাসার সাবেক প্রখ্যাত শাইখুল হাদীস, পাকিস্তান আমলে খতীবে আযম উপাধিতে ভূষিত বয়োজ্যেষ্ঠ মাওলানা সিদ্দীক আহমদ এমন আবেগপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, যা সকলকে অভিভূত করেছে। তিনি নিজে তো কেঁদে কেঁদেই বলেছেন, সবাইকেও কাঁদিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য সম্মেলনে গভীর দীনী আবেগের পরিবেশ সৃষ্টি করে। সবার অন্তরে ইসলামী জযবার বন্যা বয়ে যায়।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রকাশিত পুস্তক থেকে খতীবে আযমের বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি–

খতীবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব দল-মত নির্বিশেষে সকল ইসলামপন্থিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, "হযরত মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি ও ভ্রাতা হযরত হারূন (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করে বনী ইসরাঈলের একটি অংশ গো-বাছুর পূজার মতো শেরেকী কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে তাদের উম্মত হতে বিচ্ছিন্ন না করে হযরত মূসা (আ)-এর আগমনের অপেক্ষা করেছেন এবং সাময়িকভাবে শেরেককে বরদাশত করেছেন। কারণ, উম্মতের লোকদের সাময়িক কোন বিভ্রান্তির সংশোধন যত সহজ, তিক্ততার মধ্যদিয়ে বিভক্ত হওয়ার পর স্বমতের প্রতি প্রাধান্য দানের স্বাভাবিক প্রবণতায় লিপ্ত বিভক্ত দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা তত সহজ নয়।"

ইসলামের ভিত্তিতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গঠনের স্বার্থে ছোটখাটো ইখতিলাফী বিষয় ভুলে গিয়ে সকল ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলাম দরদি ব্যক্তির প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। "আমি আসার সময় অনেকে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দু'দিনের সম্মেলন আমাকে যে কতটা অভিভূত করেছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এ বৃদ্ধ বয়সে কেউ আমাকে অর্ধঘণ্টা এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু এখানকার আলোচনা আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছে যে, আমি সম্মেলন থেকে চলে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়বার না আসার চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত না এসে পারিনি। যেন আমি ইত্তেহাদুল উম্মাহর আকর্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছি। ইত্তেহাদুল উম্মাহর এ সম্মেলনে শরীক হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

তিনি বলেন, "আমি আজ জীবনসায়াহ্নে এসে উপনীত হয়েছি। আমার দেহের শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সম্মেলনে এসে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এই সম্মেলনের পর আপনাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমি নোয়াখালী থেকে আমার সফর শুরু করব। সারা বাংলাদেশে ইত্তেহাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আপনাদের কাছে এ দোআ চাচ্ছি, যেন আমার মৃত্যু মুসলিম উম্মাহর ইত্তেহাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই হয়।"

হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলনে আমি এসেছিলাম সন্দিহান মন নিয়ে, কিন্তু ফিরে যাচ্ছি সংশয়মুক্ত এবং আশাবাদী অন্তর নিয়ে। এ সম্মেলনে আগত ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামদরদি সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যের নিষ্ঠাপূর্ণ সাড়া লক্ষ্য করে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। আমি বালেগ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন মতের ওলামা ও মাশায়েখকে এভাবে একত্রিত হতে খুব কমই দেখেছি। আমি ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনীতি করেছি; কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ব্যাপারে তেমন কিছু করতে পারিনি। আপনারা দোআ করবেন, যেন আল্লাহ আমাকে মাফ করেন। আমি আমরণ ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি হিসেবে আমার সকল সদস্য ও সাথীকে নিয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহর পক্ষে কাজ করে যাব।"

ইত্তেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি

ইসলামী জনতা ইসলামী নেতৃবৃন্দের ঐক্যের জন্য পাগল। যে নেতাগণ একমঞ্চে সমবেত হলেই ঐক্য হয়, তাদের কারণেই ঐক্য হচ্ছে না। কোনো একজনকে অন্য নেতারা নেতা মেনে নেন না বলেই ঐক্য হয় না। ইত্তেহাদুল উম্মাহ এ সমস্যার সমাধান করায় এখন ঐক্যের পথে প্রধান বাধা দূর হয়ে গেল। তাই সারা দেশে ঐক্যের পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেল।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর পক্ষ থেকে কোনো সময় পত্রিকায় কোনো বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হতে পারে। তাই ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্র হিসেবে এক বছরের জন্য চরমোনাইর পীর সাহেবের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করে জনগণ থেকে বিপুল সহযোগিতা পেয়েছে। মাওলানা মাসুম, চরমোনাইর পীর সাহেব, মাওলানা সাঈদীসহ কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের পাঁচ-ছয় জন সদস্য যেখানেই সম্মেলনে হাজির হবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেই স্থানীয় ইসলামপন্থি সকল মানুষ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সম্মেলনের এন্তেজামিয়া কমিটিতে সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শরীক হয়েছেন।

সম্মেলনের ব্যয়ভার বহনের জন্য এন্তেজামিয়া কমিটিকে তহবিল সংগ্রহে সামান্যও বেগ পেতে হয়নি। অনেকে নিজে এসেই অর্থ-সাহায্য দিয়ে গেছেন। সম্মেলনে এত লোকসমাগম হয়েছে যে, উদ্যোক্তা, বক্তা ও শ্রোতা সবাই অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামী নেতৃবৃন্দকে একমঞ্চে দেখার জন্য ইসলামী জনতার কামনা কত তীব্র এবং তাদের আবেগ কত গভীর। ঐসব সম্মেলনে মাওলানা সাঈদী সাহেবের সফরসঙ্গী মাওলানা মীম ফযলুর রহমান বলেন, প্রতিটি সম্মেলন শেষে তহবিলের বেশ পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ ইত্তেহাদুল উম্মাহর কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়।

২০৮.

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ল

১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা পূরণের প্রয়োজনেই আর একটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিকল্প হতে পারেন না।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত কোনো পলিটিক্যাল সিস্টেম গড়ে ওঠেনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ই যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সিস্টেম থাকত তাহলে নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্টই অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতেন। কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হতো না এবং হঠাৎ আরও একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝামেলায় পড়তে হতো না।

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামী ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপযোগী একটি ৫ দফা পলিটিক্যাল সিস্টেম পেশ করে, যার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

কোনো সিস্টেম না থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নির্বাচনে প্রার্থী করার প্রয়োজনে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে হলো।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীগণ

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিএনপি মনোনীত বিচারপতি আবদুস সাত্তার ও আওয়ামী লীগ মনোনীত ড. কামাল হোসেন।

প্রথমে মোট ৩৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। আট জন প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের পক্ষে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় শেষ পর্যন্ত ৩১ জন প্রার্থীর নাম নির্বাচন কমিশনে অবশিষ্ট রইল।

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন—

১. জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী, জাতীয় নাগরিক কমিটি ও জাতীয় পার্টি।

২. মেজর এম. এ. জলিল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল।

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)।

৪. অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

৫. ড. আলীম আল রাযী, বাংলাদেশ পিপলস লীগ।

৬. মোহাম্মদ তোয়াহা, প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেযজী হুজুর।

এটা বড়ই লজ্জাজনক ও হাস্যকর যে, দেশের প্রেসিডেন্টের মতো সর্বোচ্চ পদে এত বিরাটসংখ্যক আজেবাজে লোক প্রার্থী হওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন। তাদের মধ্যে একজন মধ্য বয়সের লোক মাঝে মাঝে আমার নিকট আর্থিক সাহায্য নিতে আসতেন। সে বেচারা নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিকিউরিটির টাকা কীভাবে জোগাড় করলেন জানি না। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াটা যে রীতিমতো একটা বিরাট ডিগ্রি লাভের সমতুল্য, সেটা এক মাওলানা সাহেবের প্যাড দেখে বুঝতে পারলাম। নির্বাচনের অনেক বছর পরও তার প্যাডে বড় অক্ষরে '৮১ সালে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী' কথাটি তার ডিগ্রির সাথে ছাপিয়েছেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো প্রধান দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর পোস্টারের ছবি। যে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের ছবি পোস্টারে ছোট করে ছাপানো হয়েছে। আর শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের ছবি বড় আকারে শোভা পেয়েছে। এ পোস্টার দেখে আমি মন্তব্য করলাম, এ নির্বাচনে দু'জন নিহত প্রার্থীই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বোঝা গেল। প্রতিযোগিতা হচ্ছে দু'জন মৃত সাবেক প্রেসিডেন্টের মধ্যে। জীবিত দু'জন প্রার্থীর নিজস্ব তেমন যোগ্যতা নেই। তারা মৃত দু'জন নেতার খলীফা হিসেবেই জনগণের নিকট পরিচয় দিলেন।

নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সরকার প্রত্যেক প্রার্থীর প্রচারাভিযানের জন্য একটি করে জিপ বরাদ্দ করে এবং প্রার্থীর নিরাপত্তার জন্য প্রতি জিপে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ দান করে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বেশ চমকপ্রদ কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে। যেমন–

১. কোনো কোনো প্রার্থী এতটা অজ্ঞাত পরিচয়ের লোক ছিলেন যে, পুলিশ জিপ নিয়ে প্রার্থীর দেওয়া ঠিকানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

২. কোনো কোনো প্রার্থী সরকারি জিপে বসে মাইক লাগিয়ে নিজেই তাকে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানান।

৩. যে প্রার্থী মাঝে মাঝে আমার নিকট সাহায্যের জন্য আসতেন বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি সরকারি জিপে আমার বৈঠকখানার পাশের বাড়িতে মগবাজার কাজী অফিসে পৌঁছেন। সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে আমাকে পৌঁছানোর জন্য কিছু কাগজপত্র রেখে যান। কাজী অফিস থেকে প্রাপ্ত কাগজের মধ্যে এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিরাট তালিকা রয়েছে। তালিকার উপরে লেখা 'আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে আমার মন্ত্রিসভা গঠিত হবে'। কৌতুকের বিষয় হলো, কাকে কোন্ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের সাবেক প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা রয়েছে। আমাকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচনের প্রচারাভিযানে সহযোগিতার অনুরোধ

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দাঁড় করায়নি বলে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াতকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানাতে আমার নিকট দু'জন প্রার্থীর পক্ষ থেকে এমন দু'জন এলেন, যাদের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একজন হলেন হাফেযজী হুজুরের পক্ষ থেকে চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম। অপরজন হলেন মাওলানা আবদুর রহীমের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার কুরবান আলী। দু'জন অবশ্য একদিন বা একসাথে আসেননি।

আমি পীর সাহেবকে বললাম, হাফেযজী হুজুর পূর্বে রাজনীতি করেননি। হঠাৎ করে একেবারে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ অবস্থায় জামায়াত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আমার একা বলা সম্ভব নয়।

ব্যারিস্টার সাহেবকে বললাম, মাওলানা আবদুর রহীম এমপি হিসেবে ভালো পজিশনেই আছেন। আপনারা তাঁকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করলেন কেন? আমার আশঙ্কা হয়, তিনি সংসদ নির্বাচনে একটি আসনে যে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সারা দেশে ঐ সংখ্যক ভোটও হয়তো পাবেন না। জামায়াত এমন অবাস্তব প্রস্তাব সমর্থন করবে বলে মনে করি না।

নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত সকলেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কাকে ভোট দেবে, তা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের জিজ্ঞেস করা স্বাভাবিক। তাই এ বিষয়ে জামায়াত একটি সুচিন্তিত বক্তব্য নির্বাচনের দেড় মাস পূর্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। উক্ত বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ ঃ

জিয়া হত্যার কারণে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হচ্ছে। জামায়াত পার্লামেন্টে মযবুত অবস্থান অর্জনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া সমীচীন মনে করেনি। ভোটের ক্ষমতাটা দায়িত্ববোধ সহকারে প্রয়োগ করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জনগণের বিবেচনার জন্য জামায়াত কয়েকটি কথা পেশ করছে।

১. দেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ সেটাই পয়লা নম্বরে বিবেচ্য। প্রতিবেশী দেশ থেকেই স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। তাই যারা এ প্রতিবেশী দেশকে বন্ধু মনে করে তাদের ভোট দেওয়া নিরাপদ নয়।

২. দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় গণতন্ত্র। কাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ তা তাদের অতীত আচরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায়। যারা একদলীয় শাসন জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল তারা গণতন্ত্রের দুশমন।

৩. যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায় তাদের ভোট দেওয়া আত্মহত্যারই শামিল।

৪. ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রার্থী হয়েছেন। তাদের দ্বারা ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব মনে করলে ভোট দিতে পারেন।

৫. হাফেযজী হুজুর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় জামায়াত তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানায়। ভোটের ফলাফল যা-ই হোক তিনি রাজনৈতিক ময়দানে এ বৃদ্ধ বয়সে অবতীর্ণ হওয়ায় আলেম সমাজের মধ্যে যারা রাজনীতি করা দীনী দায়িত্ব মনে করেন না, তাদের ভুল ধারণা দূর হতে পারে।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ড. কামাল হোসেনের চেয়ে ৮৫,২২,৭১৭ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন। এ বিজয় প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়াউর রহমানেরই বিজয়। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণেই ধানের শীষে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে।

এ নির্বাচনে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার হাল ভোটের ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়। নির্বাচনী অভিযানে শেখ হাসিনা সারা দেশ সফর করে ভোটারদের নিকট তার পিতার দোহাই দিয়ে ভোট ভিক্ষা চেয়েছেন।

নির্বাচনে উভয় পক্ষের ব্যাপক প্রচারাভিযানের ফলে অজপাড়াগাঁয়ের মহিলাদের মধ্যেও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গেছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি।

আমাদের গ্রাম ভৈরব থেকে দক্ষিণে চার-পাঁচ মাইল দূরে। লঞ্চ বা মোটরচালিত নৌকায় যাওয়ার পরও মাইলখানেক পথ হেঁটে যেতে হয়। তাই নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে কোন বড় নেতা বা নেত্রীর বক্তব্য সেখানে সহজে পৌঁছার কথা নয়। এ সত্ত্বেও গ্রামের এক বয়স্কা মহিলা রাবেয়ার কাছে নির্বাচনের খবর শুনলাম। এ মহিলা ছোট সময়ে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। এখন সাহায্যের জন্য আসে। গত কুরবানীর (২০০৫) সময়ও গোশত নিতে এসেছিল।

'৮১ সালের ঐ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ঐ মহিলা আমাদের বাড়িতে এলে জিজ্ঞেস করলাম, নির্বাচনে ভোট কাকে দিয়েছিলে? সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, ভাই সাব! আপনি জানেন না আমাদের গেরামে সবাই ধানের শীষে ভোট দিছে? আমি বললাম, শেখ হাসিনা নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য এত বলল, মেয়েরাও কি ভোট দিল না? সে হাসতে হাসতে বলল, দল বাইন্দা (বেঁধে) পাড়ায় গান গাইয়া বেরাইছে 'হাসিনা গো হাসিনা, তোর কথায় নাছিনা (নাচি না)। তোর বাপের কথায় নাইচ্যা (নেচে), দেশটা দিছি বেইচ্যা (বেচে)'।

নির্বাচনে অন্য প্রার্থীদের হাল

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন ছাড়া আর সকল প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল, অধ্যাপক মুজাফফর, ড. আলীম আল রাযী, হাফেযজী হুজুর কারোই জামানত ছিল না। অবশ্য ভোটপ্রাপ্তির সংখ্যার দিক দিয়ে হাফেযজী হুজুর প্রার্থীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ৩,৮৭,২১৫ ভোট পেয়েছেন। প্রদত্ত

৬ কোটি ভোটের মধ্যে এ সংখ্যা কি গৌরবজনক? মাওলানা আবদুর রহীম সম্পর্কে আমি ব্যারিস্টার কুরবান আলীর নিকট যে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, তা সত্য প্রমাণিত হয়।

জেনারেল ওসমানী ও মেজর জলিলের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চেয়ে অধিকসংখ্যক ভোট পাওয়ায় হাফেযজী হুজুরের একটা সম্মানজনক পজিশন অবশ্যই অর্জিত হয়েছে। যার ফলে নির্বাচনের পর তিনি 'খেলাফত আন্দোলন' নামে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য আলেম শামিল হন। আমি দৈনিক সংগ্রামে উপসম্পাদকীয় কলামে তাঁর এ উদ্যোগকে মুবারকবাদ জানাই। আলেম সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের বিরাট অভাব পূরণ হওয়ায় জামায়াতের পক্ষ থেকে উৎসাহ প্রকাশ করি। আমার ঐ লেখা পড়ে চরমোনাইর পীর সাহেব খুশি প্রকাশ করেন।

নির্বাচনোত্তর সরকার গঠন

বঙ্গভবনের দরবার হলে ২১ নভেম্বর বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রেসিডেন্ট ২৪ নভেম্বর অর্থনীতিবিদ ড. এম. এন. হুদাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন।

২৭ নভেম্বর ৪২ সদস্যবিশিষ্ট নবগঠিত মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী, জামালউদ্দীন আহমদ উপপ্রধানমন্ত্রী ও শামসুল হক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রায় সকলেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৪ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়া দুটো গোয়েন্দা সংস্থাকে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। জিয়া হত্যার পর তদন্ত মুলতবি থাকে। বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর তদন্তকার্য সমাধা করার নির্দেশ দেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরদিন থেকেই জিয়ার মন্ত্রিসভার ২৬ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ সম্পর্কে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্ত চলছিল।

১৯৮২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয় যে, যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাসেমের মিন্টু রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকেই নাখালপাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামি এমদাদুল হক (ইমদু)-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এসব ঘটনায় মন্ত্রিসভা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সরকারের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। মন্ত্রিপরিষদের অনেক সদস্যের নিষ্ঠা ও সততা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট ১১ ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ৪২ সদস্যবিশিষ্ট ৭৭ দিনের মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেন। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮ সদস্যের নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনে মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

১০ জন মন্ত্রী ও আট জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে গঠিত নয়া মন্ত্রিপরিষদে শাহ আজিজুর রহমান পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

সেনাপ্রধানের রাজনীতি চর্চা

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই ১৯৮১ সালের ৭ অক্টোবর লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' ও ১৪ অক্টোবর 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ সেনাপ্রধান এরশাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন, দেশ শাসনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হলে সেনা-অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান রোধ করা সম্ভব। এ মন্তব্য পত্র-পত্রিকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় সেনাভবনে জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থাসমূহের সম্পাদক সমাবেশে সেনাপ্রধান এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। ৩০ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করছি : বিবৃতিটি মুক্তিযোদ্ধা মেজর রফিকুল ইসলামের 'বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক সংকট' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, "কতিপয় সাংবাদিকের সাথে আমার আলোচনার বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। ঐ আলোচনায় আমি সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ করেছিলাম। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এবং বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, আমাদের সমাজে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সমস্যা হিসেবে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে; কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়নি এবং সুস্পষ্টভাবে উঠে আসেনি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অপবাদ এবং লঘু করার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও গুজব বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, যা শূন্যতা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবের জন্য এটা হয়েছে বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। জাতীয় সংবাদপত্রের সাথে যোগাযোগ এবং কতিপয় বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি অপসারণে সহায়ক হবে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বলতে সিএএস (চিপ অব আর্মি স্টাফ) কী বুঝিয়ে থাকে? এই যুক্তিসঙ্গত বিষয়টির জবাব দেওয়া প্রয়োজন। কিছু লোক সামরিক ব্যাপার-স্যাপার না বুঝে-শুনে এবং আমাদের সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে তাদের কল্পিত ব্যাখ্যার আলোকে তারা আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে অভিযুক্ত করে থাকেন। তারা বলে বেড়ান আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করছি। আমরা সরকারে ক্ষমতার ভাগ চাই, সশস্ত্র বাহিনী উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েছে এবং এ ধরনের বহু অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে। এ সমস্তই জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনাপূর্ণ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাফল্যের সাথে তুলে ধরার পর গৌরবজনক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য স্থাপন করার পর এবং সফল নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই জনগণের মধ্যে অহেতুক উদ্বেগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই উৎকণ্ঠা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেন মনে হয় রাষ্ট্রপতি ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা সংঘর্ষ চলছে। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা কি সর্বদা গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতির প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করিনি? ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা তাই করব।

আমি সৈনিক, রাজনীতিক নই। এ যাবত আমি প্রমাণ করে আসছি যে, আমি সৈনিক থাকতে চাই। আমার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই। সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশ্ন তুলে আমি যা করতে চাইছি তা হলো অত্যন্ত সংকটপূর্ণ এবং বদ্ধমূল রাজনৈতিক সামরিক সমস্যা সম্পর্কে আমি অকপট আলোচনা করছি। আমি আশা করি যে, আমাদের রাজনীতিকরা আমাদের রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই সমস্যার সংকটজনক প্রকৃতি ও ব্যাপকমাত্রিকতা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন। এটা ক্ষমতায় অংশগ্রহণের প্রশ্ন নয়, এটা আমাকে মন্ত্রিসভায় স্থান অথবা পদ দানের প্রশ্ন নয়, আমাদের জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারদের পদ ও মর্যাদা লাভালাভের প্রশ্ন এটা নয়; আমাদের অফিসার ও লোকজন বেসামরিক অনুসঙ্গীদের উপর তাদের ক্ষমতা খাটানোর প্রশ্ন নয়। না, আদৌ তা নয়। এসবই সামান্য ব্যাপার। জাতীয় নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এসব পদ্ধতিগত এবং যথাযোগ্য সাংগঠনিক কাঠামোগত ব্যাপার মাত্র। জনস্বার্থে সরকার যদি এটা করা প্রয়োজন মনে করেন তারা এটা করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক, সামরিক সমস্যাবলি স্বীকৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক ধ্যান-ধারণা এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে এসবের স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা।

আমাদের সাধারণ সৈনিকরা রাজনীতিতে সামরিক হঠকারিতা চান না কিংবা সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক হঠকারিতা প্রশ্রয় দিতে চান না। গণতন্ত্র নির্মাণে সাহায্য করতে ভবিষ্যতে কোন অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ প্রতিসাম্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জনগণের সাথে তারা শুধু থাকতে আগ্রহী। পরবর্তী সময়ে আমি এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে পরিষ্কার করে বলব। আমার ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি, আমার কী হবে তা কোন বিষয়ই নয়। একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক ও চিফ অব স্টাফ হিসেবে যে সেনাবাহিনীকে আপদে-বিপদে পরিচালনা করেছে, আমি সমস্যাবলি যা উপলব্ধি করেছি তা তুলে ধরতে উদাসীন থাকতে পারি না। এটা জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজন। ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা দান, সামরিক প্রতিষ্ঠানকে লঘু মূল্য করা এবং তিক্ত সত্য না বলা জনগণের সাথে প্রবঞ্চনা করার শামিল। আমাদের অবশ্যই প্রকৃত অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে এবং সমস্যার গভীরে পৌঁছাতে হবে। এটা গুরুতর ব্যাপার, যদি আমাদের সমাজে সামরিক বাহিনীকে যথাযথ স্থান দিতে পারি, তবে চিরকালের জন্য গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে তার সুদূরপ্রসারী সুফল থাকবে সিএএস (চিফ অব আর্মি স্টাফ) হিসেবে আমার অবশিষ্ট কার্যকালের সময়ে ইনশাআল্লাহ কোনো অভ্যুত্থান হবে না, কিন্তু আপনাদের যা করতে হবে তা হলো সাংবিধানিক সমাধান, যেন পাঁচ বছর পর কিংবা দশ বছর পর কিংবা আর কখনোই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হয়। লক্ষ্য করছেন তো, কী বিপন্ন হয়ে পড়ছে শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব এবং আমাদের জাতির অস্তিত্ব!

এই উদ্দেশ্যে আসুন, আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা মন দিয়ে দেখি। এই সশস্ত্র বাহিনীর সাথে অন্যান্য বাহিনীর পার্থক্য রয়েছে। এই বাহিনী আমাদের জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে দেশ মুক্ত করেছে। এভাবে আমাদের জনগণ ও সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক গভীরভাবে একাত্ম হয়েছে– আমরা প্রকৃতই জনগণের সশস্ত্র বাহিনী;

ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনী নই। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কেউ-ই আমাদের সৈনিকদের সমাজ এবং আলোড়ন থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়নি। এটা ইচ্ছা করলেই করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীকে শুধুমাত্র চাকুরে হিসেবে কারোর মনে করা ঠিক হবে না, এটা তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের সামরিক বাহিনী দক্ষ, সুশৃঙ্খল, সত্যিকারভাবে উৎসর্গিত সৎ সংস্থা এবং সংঘবদ্ধ জাতীয় শক্তি। আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশে এরূপ চমৎকার একটি শক্তির সম্ভাবনা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও উৎপাদনশীল এবং জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাদের এরূপ একটি ধারণা দিয়ে গেছেন। আমি তার ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি। এটা আমি এগিয়ে নিতে অত্যন্ত আগ্রহী। এই ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে আমাদের আলাদা পথে চলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতি গঠনের ভূমিকা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষাকে সমন্বিত করে সামগ্রিক জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি ধারণার মধ্যে স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার মতো উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব না। আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সমরশক্তির অভাবের সীমাবদ্ধতা এই অর্থনৈতিক দুর্ঘটই চাপিয়ে দিয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের একটি মাত্র পন্থা হলো আমাদের সমরশক্তির স্থানে বিপুল জনশক্তিকে ফলপ্রসূ বিকল্পরূপে প্রতিস্থাপন। আমাদের সীমানা রক্ষায় সক্ষম শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের জন্য তাই আমাদের প্রয়োজন লাখ লাখ শিক্ষিত সৈনিক। কখন আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ দেব— জাতীয় পর্যায় থেকে কর্মকর্তাদের নীতিগত নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। সর্বোচ্চ জাতীয় পর্যায়ে গভীর সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ব্যতীত এ কাজ সুচারুভাবে করা সম্ভব নয়।

এরূপ সংক্ষিপ্ত সময় ও কালে আমার পক্ষে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। ক্রমান্বয়ে এই ধারণা দানা বাঁধবে। যেহেতু আশার কথা, জাতীয় প্রেক্ষাপট মনে রেখে এই বিষয়টি অনুশীলন করা হচ্ছে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমাদের সমাজে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ স্থির করতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি যে, এই প্রশ্ন গভীরভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির কাছে পেশ করা যেতে পারে। এ ধরনের কমিটিতে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং এ বিষয়ে সামরিক বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমি কোনোভাবেই ক্ষমতার ভাগ চাইনি। সশস্ত্র বাহিনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছে— এ কথাও ভিত্তিহীন। আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে এসব কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কী চায়, সে সম্পর্কে এখন জনগণের মনে কোনো সন্দেহ নেই। সশস্ত্র বাহিনী গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পক্ষে। সাহসী ও দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত দুঃসময়ে কীভাবে গৌরবোজ্জ্বল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে

সমুন্নত রেখেছে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেনাবাহিনী সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করার যে নজির রেখেছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কোনো হঠকারীর হিংসার পথ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমি যা বলেছি এবং আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করি তা হলো স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা এবং অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধের একটা জাতীয় প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের সমস্যা ও অসুবিধা এবং সেই সঙ্গে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যাদি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে। এটাকেই আমি রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যা বলছি। আপনাদের এসব কথা, এসব তিক্ত সত্য না বললে আমি আমার জাতীয় কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হব। এসব কথা গোপন রাখার অর্থ আমাদের জনগণকে প্রবঞ্চিত করা। জনগণ কর দিচ্ছে, তারা তাদের সশস্ত্র বাহিনীর খরচ চালাচ্ছে। তাই সশস্ত্র বাহিনীতে কী হচ্ছে, তা জানার অধিকার তাদের রয়েছে। বাহিনীপ্রধানগণ ছাড়া সঠিকভাবে এসব কথা আর কে বলতে পারবেন।

এটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা চাই সমস্যাদি সমাধান হোক, আমরা চাই একটি সৎ ও কার্যকর সরকার। সত্যি আমাদের এ দেশে গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে এবং আমি বলতে চাই যে, আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন করুন। তাদের এটা অনুভব করতে দিন যে, তারাও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ এবং এভাবে হঠকারিতা প্রতিহত করতে জনগণ সৈনিকদের সাহায্য করতে পারেন। আপনারা জানেন যে, বিশ্বের বহু দেশেই সংবিধানে এ ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে।

সবশেষে আমি বলতে চাই যে, যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ওপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তাঁর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের ওপর আমার বিরাট আস্থা রয়েছে। সামরিক বাহিনীর সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সমঝোতা ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাব। আমি আপনাদের আহ্বান জানাই, কেউ যেন আমাদের জনগণকে তাদের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্ত কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ কিংবা তাদের মর্যাদা নস্যাৎ করতে না পারে। যে জাতি তার সৈন্যদের শ্রদ্ধা করে না, তারা তার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকেও শ্রদ্ধা করতে পারে না।"
(পৃষ্ঠা : ১৫৫-১৫৯)

২০৯.

সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়াউর রহমানের মতো সরকার পরিচালনার ব্যাপারে জেনারেলদের আলোচনার সুযোগ দিতে পারেননি। জিয়া হত্যার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালেও এটা করা সম্ভব ছিল না। তখন থেকেই সেনাপ্রধানের মগজে এ চিন্তা ঢুকেছে যে, সরকার পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীকে শরীক করার সুযোগ দিতে হবে। জিয়াউর রহমান যেভাবে ইনফরমালি করতেন তা প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার করতে না পারায় জেনারেল এরশাদ এ জাতীয় দাবি উত্থাপন করে থাকবেন।

১৯৮১ সালের ২ অক্টোবরে সেনানিবাসে জেনারেল এরশাদ যে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর কোন নজির নেই। জিয়া হত্যার পরই এরশাদ সামরিক শাসন জারি করতে আগ্রহী ছিলেন। অন্য জেনারেলদের সমর্থনের অভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। '৮১ সালের পয়লা জুন থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের আমলে বৃদ্ধ ও অসুস্থ প্রেসিডেন্টের দুর্বলতার সুযোগে এবং বিএনপিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে সেনাপ্রধান দাপট দেখাতে থাকেন।

যে শাসনতন্ত্রের আনুগত্যের শপথ নিয়ে জেনারেল এরশাদ সেনাপতির দায়িত্ব পেলেন, তাতে এ জাতীয় রাজনৈতিক দাবি করার কোনো অধিকার তার ছিল না; বরং এ জাতীয় বক্তব্য সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে।

'৮১-এর অক্টোবরে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল এরশাদের বিবৃতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলেন, 'সেনাবাহিনী সরকারের একটি অংশ। তাদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা। এর বাইরে এবং এর বেশি কোনো কাজ করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।"

এ বিষয়ে '৮১ সালের ৪ ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদে জেনারেল ওসমানীর নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়— 'রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর জড়িয়ে পড়ার কারণে পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হয়। তাই সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করার আমি বিরোধী। কারণ এর ফলে সশস্ত্র বাহিনী ও দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।....... যদি কোনো সামরিক অফিসার সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসর বা রিলিজ নিয়ে বা পদত্যাগ করে দেশের সেবার জন্য রাজনীতিতে যোগদান করেন, তাহলে তিনি একটি সঠিক উদাহরণ তুলে ধরবেন। উর্দিপরা অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার অপচেষ্টা একটি বিশ্রী উদাহরণ বিধায় পরিহার করা উচিত।"

সব আপত্তি সত্ত্বেও সেনাপতি এরশাদ তাঁর রাজনৈতিক দাবি আরও জোরে-শোরে তোলেন। এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা না হলেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। যতদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়িত না হবে, ততদিন পর্যন্ত মুক্তির সংগ্রাম চলবে।'

বিচারপতি আবদুস সাত্তারের দুর্বলতার সুযোগ

জিয়া হত্যার পরপরই অন্য জেনারেলদের আপত্তির কারণে সেনাপ্রধান সামরিক আইন জারি করতে পারেননি। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগে এরশাদ ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। জিয়াউর রহমানের বিশাল ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতিতে বিএনপি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ল। এ জাতীয় ব্যক্তিভিত্তিক দলে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না। দলের নেতা-কর্মী ও জনগণের নিকট বিকল্প নেতা হিসেবে কেউ গণ্যও হয় না।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায়ই পত্র-পত্রিকায় অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তিনি গোয়েন্দা বিভাগকেও তদন্তের নির্দেশ দেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ঐসব মন্ত্রীকে নিয়েই সরকার পরিচালনা করায় নৈতিক দিক দিয়ে তাঁর দুর্বলতাবোধ করারই কথা। জিয়ার ইমেজ একমাত্র পুঁজি হলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি তখন বলতে গেলে নেতৃত্বশূন্য। বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বার্ধক্য ও দুর্বল নেতৃত্ব এরশাদকে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক অঙ্গনে অবতীর্ণ করাননি। পরবর্তীকালে তিনি ময়দানে আসায় দলের নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ হয়। '৮১ সালে জিয়া হত্যার পর দলটি নেতৃত্বশূন্য হওয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। শাহ আজিজুর রহমান, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ড. এম. এন. হুদার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে মনোনয়ন দেওয়া যেত; কিন্তু নেতৃত্বশূন্য দলটির এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্টকেই মনোনয়ন দিতে হয়। এতে আইনগত সমস্যা দেখা দেয়। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হওয়ায় বেতনধারী সরকারি কর্মকর্তার মর্যাদায় ছিলেন বলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে তাঁকে প্রার্থী করার ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁর মতো বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিত্বের লোককে মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে সেনাপ্রধানও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর রচিত 'বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনে সেনাপ্রধান বিচারপতির বিজয়ের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হলে তার ক্ষমতা দখলের কোনো সুযোগ থাকবে না বলেই হয়তো এমনটা করেছেন। সেনাপ্রধান নির্বাচনের দেড় মাস পূর্বে ২ অক্টোবর সেনানিবাসে সাংবাদিক সম্মেলনে যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার উক্ত বিবৃতির দায়ে অভিযুক্ত করে সেনাপ্রধানকে অপসারণের চিন্তাও হয়তো করতে পারেননি। তিনি তখন নির্বাচনে বিজয়ের জন্য পেরেশান। আর এরশাদ তাঁকে বিজয়ী করতে সচেষ্ট। উক্ত বিবৃতির জন্য এমন একটা সময় নির্ধারণ করায় এরশাদের চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেনাপ্রধানের ঐ দীর্ঘ বিবৃতি ব্যাপকভাবে পত্রিকায় ফলাও হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বিস্ময় ও ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও সশস্ত্র তিন বাহিনীর নিকট এরশাদ 'হিরো' হিসেবে গণ্য

হলেন। তার বিরুদ্ধে সরকার নিশ্চুপ থাকায় তার ইমেজ গোটা সশস্ত্র বাহিনীতে দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণ

২১ নভেম্বর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার শপথ নেওয়ার পর ২৭ তারিখ ৪২ জনের বিরাট মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। সেনাপ্রধান ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় সেনাভবনে জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থাসমূহের সম্পাদকগণের সমাবেশে দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবি করেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিনা অনুমতিতে প্রেস কনফারেন্স করায় সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে এরশাদের কোর্ট মার্শাল হওয়ার কথা। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস প্রেসিডেন্টের ছিল না।

সেনাপ্রধান এরশাদ ১৯৮১ সালের ১২ ডিসেম্বর দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রিসভা বাতিলের দাবি তোলেন। এমনকি তিনি বঙ্গভবনে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, লে. কর্নেল আকবর, জামালউদ্দীন, হাবিবুল্লাহ খান ও অন্যদের অবিলম্বে বরখাস্তের দাবি জানান। এরশাদকে শান্ত করার জন্য ঐ রাতেই প্রেসিডেন্ট নূরুল ইসলাম শিশু ও কর্নেল আকবরকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেন।

সশস্ত্র বাহিনীকে সরকার পরিচালনায় শরীক করার দাবি মেনে নিয়ে ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট দশ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করেন। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রিপরিষদ সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র বহির্ভূত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না। সেনাপ্রধানের চাপের নিকট আত্মসমর্পণের এ দুর্বলতা প্রদর্শন করায় জেনারেল এরশাদের সাহস আরও বেড়ে যায়।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সদস্য করা হয়। কিন্তু তিন বাহিনী প্রধান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে নবগঠিত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে মন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এতে শামিল হতে অস্বীকার করেন।

প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ পুনর্গঠন করে সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীসহ তিন মন্ত্রী নিয়ে সর্বমোট মাত্র ছয় জনের পরিষদ গঠন করেন।

সেনাপ্রধান সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে অফিসার ও সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সুপারিশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে সক্ষম হওয়ায় তার পজিশন আরও মযবুত করতে সক্ষম হন। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তিনি দ্রুত ক্ষমতা দখলের পরিবেশ গড়ে তোলেন।

১৯৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ১৮ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। বিচারপতি সাত্তার তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য সেনাপ্রধানের সমর্থনের

ওপর নির্ভর করেছিলেন। এরশাদেরও সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজ অবস্থানকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের সমর্থন কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল।

প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার সেনাপ্রধান এরশাদের দাপট সহ্য করে এবং তার বিভিন্ন দাবি মেনে নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর যে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন, মাত্র আড়াই মাস পরই সেনাপ্রধানের দাবির মুখে দুর্নীতির অভিযোগ স্বীকার করে মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। তিনি যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তখন দুর্নীতিগ্রস্তদের কেন মন্ত্রী নিয়োগ করলেন। এতে তার ইমেজ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ন হয়।

জিয়া হত্যার সাড়ে পাঁচ মাস পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এর কয়েক মাস পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানের মধ্যে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব চলে, এর বিস্তারিত বিবরণ আমি দুটো গ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছি। গ্রন্থ দু'টি হলো–

১. বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট।

২. স্বৈরশাসনের নয় বছর।

এ বই দুটোর লেখক মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি বীর উত্তম। ১৯৯৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে এমপি নির্বাচিত হন এবং প্রায় পৌনে তিন বছর শেখ হাসিনা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মতো ভদ্রলোক দ্বারা এ দায়িত্ব যথাযথ পালন সম্ভব বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেননি। বিচারপতিগণকে লাঠির ভয় দেখানোর যোগ্য একজন লাঠিয়াল মার্কা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রয়োজনে তাকে অপসারণ করা হয়।

মেজর রফিক প্রচুর বই লিখেছেন, যার বেশির ভাগই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। কর্নেল আবদুল হামীদ ও মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের মতো তিনি নিরপেক্ষ বলে আমার মনে হয়নি। তবুও তার পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কারণ, তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেছেন।

এরশাদের ক্ষমতা দখল

১৯৮১ সালের ২ অক্টোবর সেনানিবাসে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত দীর্ঘ বিবৃতিতে এরশাদ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় দেশে সামরিক শাসন কায়েম হবে না। অথচ তিনিই '৮২ সালের ২৪ মার্চ (মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই) সামরিক শাসন জারি করেন। এ সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলাম 'স্বৈরশাসনের নয় বছর' গ্রন্থে লিখেন—

"এরশাদ সেনাবাহিনীর আইন-কানুন ও শৃঙ্খলাকে দারুণভাবে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। তেজগাঁও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

হিসেবে অপর একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবি করে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন।

এরশাদের এই সব কর্মতৎপরতায় রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরশাদ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে উৎখাত করবেন। এরশাদকে তার এই উচ্চাভিলাষ অভিযান থেকে কীভাবে বিরত করা যায়, এ বিষয়ে সাত্তার ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন। এই সংকটের নিরসন ও ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার তথা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এরশাদকে বরখাস্ত করে তদস্থলে অপর একজন জেনারেলকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট সাত্তার এরশাদকে বরখাস্ত করে মেজর জেনারেল শামসুজ্জামানকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। তিনি তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরীকে টেলিভিশন ও বেতারে এই সংবাদ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন এবং মেজর জেনারেল শামসুজ্জামানকে তার নতুন নিয়োগের কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী জাতীয় সম্প্রচারে এই ঘোষণা দেওয়ার পরিবর্তে এরশাদকে অবহিত করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শামসুজ্জামানও সেনাভবনে গিয়ে এরশাদকে বিষয়টি জানান।

এরশাদ এই খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে ২৩ মার্চ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কনফারেন্স আহ্বান করেন। তখন রাত সাড়ে আটটা। এরশাদ ভীষণ উত্তেজিতভাবে বললেন, জিয়ার মৃত্যুর পরে তিনি রাষ্ট্রপতিকে কীভাবেই না সাহায্য করেছেন। এত আনুগত্যের পরেও সাত্তার তাকে বরখাস্ত করতে যাচ্ছেন। পবিত্র কুরআন শরীফ স্পর্শ করে তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে জড়িত হবেন না। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটেছে, খুনের কুখ্যাত আসামিকে মন্ত্রীর বাসভবনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতেই হবে। এই সামরিক আইন অন্য সামরিক আইন থেকে আলাদা। তার নিজের স্বার্থে নয়; বরং দেশের স্বার্থে, সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারিপূর্বক একটি নির্বাচিত সরকারকে তিন মাসের মাথায় উৎখাত করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এইভাবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের নামে ক্ষমতা দখল করে এরশাদ সমাজকে পরিণত করেন সীমাহীন দুর্নীতির আখড়ায়। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে প্রশাসনকে ক্রমশ বন্দি করে ফেলেন তার শক্ত হাতের মুঠোয়। দেশ পরিণত হয় এক বিরাট কারাগারে।" (পৃষ্ঠা : ৪৭ ও ৪৮)

মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেন ঃ

"দেশের এই গভীর অর্থনীতিক সংকট, ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও ক্ষমতাসীন সরকারের দেশ পরিচালনায় দুর্বল নেতৃত্ব ও সীমাহীন দুর্নীতির প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত এবং সংসদ ও প্রেসিডেন্টসহ মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করা হয়। জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক

আইন প্রশাসক হিসেবে সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। দেশকে পাঁচটি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করে পাঁচজন আঞ্চলিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রে জেনারেল এরশাদ বিপন্ন জাতীয় অর্থনীতি, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বেসামরিক সরকার, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে জনজীবনে অশান্তি, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, জনগণ চরম হতাশা ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী সারা দেশে সামরিক আইন জারি করার দায়িত্ব গ্রহণ করছে। সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রের আংশিক নিম্নে দেওয়া হলো।

'যেহেতু, দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে যখন অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছে, সকল স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হইয়া উঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে সম্মানজনক জীবনযাপন, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বপালনকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যেহেতু দেশের জনগণ চরম হতাশা, দিশাহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাহাদের দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর ইহার দায়িত্ব বর্তাইয়াছে।

সেহেতু, আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ লইয়া ২৪ মার্চ, ১৯৮২ বুধবার হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিতেছি এবং এ মুহূর্ত হইতে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।'

ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি সাত্তার ২৫ মার্চ অপরাহ্ণে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করে বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, জাতীয় স্বার্থে সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারির পরে রেডিও-টেলিভিশনে এক ভাষণে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এদেশের জনগণ ধর্ম, বর্ণ ও

দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। স্বাধীনতার আদর্শে দীক্ষিত প্রতিটি নাগরিক সেদিন জীবনপণ করিয়া আগাইয়া আসিয়াছিল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম স্বদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আপনারা জানেন, শুধু একখণ্ড জমি অথবা একটি পতাকার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ করা হয় নাই। ইহা করা হইয়াছিল স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে। আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি; শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বাধীনভাবে লালন করা, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের প্রতিফলন সুনিশ্চিত করাও ছিল এই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য। চরম আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহনকারী আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা কিছু পাইবার আশায় যুদ্ধ করে নাই; বরং সব কিছু উজাড় করিয়া দিয়া একটি সত্যিকারের স্বাধীন ও সার্বভৌম, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল দেশ গঠনের জন্যই তাঁহারা মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়াছিল। তাহাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিতে আজ আমাদেরকে নতুন করিয়া শপথ নিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সব রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিতে চাই যে, কৃতজ্ঞ জাতি তাহার বীর সন্তানদের অতি সাধের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।" (পৃষ্ঠা ১৬৫ ও ১৬৬)

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা এবং বিএনপি'র নেতৃত্বশূন্যতার সুযোগে সেনাপ্রধান সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করতে সক্ষম হন। শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্রমে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জিয়া হত্যার পর নির্বাচিত সরকারকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে সহযোগিতা না করে সেনাপ্রধান আবার স্বৈরশাসন চালু করেন। এর জন্য প্রেসিডেন্ট ও বিএনপি'র নেতৃত্বই প্রধানত দায়ী। কোটি কোটি ভোটারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বলিষ্ঠতা এবং সরকারি দল বিএনপি'র যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটাকে জেনারেল এরশাদের সাফল্য না বলে প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের ব্যর্থতা বলাই অধিকতর সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

২৪ মার্চ সেনাপতি এরশাদ পেশি শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের পরদিন প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে 'সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে অযোগ্যতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন। নির্বাচনে যারা তাঁকে ভোট দিয়েছেন, তিনি তাদের এর দ্বারা অপমান করলেন। সামরিক আইন জারির পক্ষে সাফাই না গাইলে কি তাকে হত্যা করা হতো? বড় জোর 'হাউস এরেস্ট' করে রাখা হতো। এতে তাঁর ভাব-মর্যাদা কিছুটা হলেও বহাল থাকত। ১৯৮৩ সাল থেকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমে শক্তিশালী হলো, বেগম জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিএনপি ময়দানে অবতীর্ণ হলো এবং সকল রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হলো তখন একপর্যায়ে গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট জানালেন, তাকে ঐ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এ কথা প্রকাশ করে তিনি তার চরম কাপুরুষতার পক্ষেই সার্টিফিকেট দিলেন।

২১০.

সেনা-অফিসারদের মধ্যে বিভেদ

বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার রচিত গ্রন্থাবলি থেকে জানা গেল, সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের একটা সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা সবসময় সক্রিয় ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ময়দানে এ বিভেদ দূর করতে কিছুটা সফল হলেও সশস্ত্র বাহিনীতে সফলতা লাভ করেননি। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদাতা সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেও পদ দখলের প্রতিযোগিতা দেশের রাজনীতিকে বারবার প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থে নেতৃত্বের কোন্দল চলে, সশস্ত্র বাহিনীতেও এ মারাত্মক রোগ দীর্ঘ দিন চলেছে।

তাই সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ অনুধাবন করা জরুরি মনে করেই মেজর রফিকুল ইসলামের 'স্বৈরশাসনের নয় বছর' থেকে কতক তথ্য তুলে ধরা কর্তব্য মনে করছি।

"পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসার ও সৈন্যদের সংখ্যা যে এত বেশী হবে, সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের এ ধারণা ছিল না। এই প্রত্যাগমনের ফলে রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈন্যরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়। পাকিস্তান প্রত্যাগতরা সাড়ে তিন বছর যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে কাটিয়েছেন। ভুট্টো ৯৮,০০০ যুদ্ধবন্দিদের একজনকেও সেনাবাহিনীতে বহাল রাখেননি। অথচ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার পাকিস্তান প্রত্যাগতদের সেনাবাহিনীতে স্থান দিলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দেওয়ার ফলে পাকিস্তান প্রত্যাগতরা সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও অনেকের জুনিয়র হয়ে পড়েন। অথচ পাকিস্তানে বন্দিজীবন যাপনে তারাও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের স্বীকার হয়েছেন। বস্তুত বিনা অপরাধেই পাকিস্তান প্রত্যাগতরা এই শাস্তি পেলেন। এর ফলে সেনাবাহিনী শুধু দুই প্রধান দলেই বিভক্ত হলো না, পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ ধূমায়িত হতে লাগল। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল স্বাভাবিক। যেকোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এই অবস্থায় পড়লে বিব্রত হবেন, সন্দেহ নেই।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারগণ পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন অথবা ছুটিতে এসেছিলেন অথবা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পেয়েও যোগ দেননি এমন অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কারের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার সমন্বয়ে একটি স্ক্রিনিং বোর্ড গঠিত হয়।" (পৃষ্ঠা ৩২ ও ৩৩)

"এরশাদ চাকরি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া এরশাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভোলা মিয়া এরশাদকে চাকুরিচ্যুত না করার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে সুপারিশ করেন। শোনা যায়, একদিন সন্ধ্যায়

এরশাদ মুজিব কোট পরিহিত অবস্থায় ভোলা মিয়াকে সঙ্গে করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলেন এবং ভোলা মিয়া এরশাদকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ বঙ্গবন্ধুর পদযুগল স্পর্শ করে কদমবুছি করেন। ভোলা মিয়া বঙ্গবন্ধুকে বললেন, আমার ভাগ্নের চাকরিটা না থাকলে স্বাধীনতাযুদ্ধ করে কি লাভ হলো? বঙ্গবন্ধু এতে খুশি হয়ে এরশাদকে চাকুরিতে রাখার নির্দেশ দিলেন।" (পৃষ্ঠা : ৩৩)

এরশাদ সম্পর্কে কতক তথ্য

জেনারেল এরশাদ ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। সোয়া তিন বছর পর ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও রাজনীতিতে তিনি দীর্ঘ সময় দাপটের সাথে নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের ৬ তারিখ তিনি গণআন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন এবং ছয় বছর কারাগারে আবদ্ধ থাকলেন। এ সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাই সেনাবাহিনীতে তাঁর উত্থানের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মেজর রফিকুল ইসলামের বই থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করছি ঃ

"এরশাদ ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন।

১৯৬৬ সালে কোয়েটাস্থ স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি লাভ করেন। এরশাদ তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলে চাকুরি করেন এবং বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তিযুদ্ধরত এরশাদ তখন পাকিস্তানে সপ্তম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সপ্তম ইস্ট বেঙ্গল তাঁর অধিনায়কত্বে যখন পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের আওতায় মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। পরে ভুট্টো যখন আটকেপড়া বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের কোর্টমার্শাল করার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন তখন এরশাদকে উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

একাত্তরের ২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাত্রিতে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা পাশবিক হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, তখন এরশাদ রংপুরে ছুটি ভোগরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করে এপ্রিলের প্রথমদিকে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান এবং সপ্তম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক হিসেবে পুনরায় যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্য তিনি সেপ্টেম্বরে রংপুরে এসেছিলেন। এবারেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যান। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার শুরু হলে লে. কর্নেল এরশাদকে উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং এইসব কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর চাকুরি থাকার কথা নয়। তবুও তাঁকে সেনাবাহিনীতে স্থান দেওয়া হয় এবং এই বিপজ্জনক ব্যক্তির সেনাবাহিনীতে বহাল থাকার পরিণতি সবার জানা।" (পৃষ্ঠা : ৩২)

"এরশাদ ব্যক্তিগতভাবে মৃদুভাষী ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী। সদা হাস্যরত লম্বা একহারা চেহারার অধিকারী এরশাদ সেনাবাহিনীর চৌকস অফিসার হিসেবে সুনাম

অর্জনে সক্ষম না হলেও কারো সঙ্গে তাঁর আপাত বিরোধ ছিল না। জিয়া ও শফিউল্লাহর মধ্যে অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও তিনি দু'জনকে মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য দিয়ে খুশি রাখতেন।

দু'দিকেই সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারদর্শী এই অফিসারটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও একটি সুখের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সেনাবাহিনীতে তাঁর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরকেও তিনি তোয়াজ করতে দ্বিধা করতেন না। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে এই সময়ে কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এরশাদ এদের অন্যতম। কর্নেল শওকত আলী তাঁর রচিত 'কারাগারের ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রথম দিনই দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে সে আমার অফিসে এসে আমাকে বলেছিল, আপনার Blessing নিতে এলাম।' (পৃষ্ঠা : ৩৩)

"১৯৭৩ সালে এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে নয়াদিল্লীতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে ব্রিগেডিয়ার হন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। মেজর জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর উপ-স্টাফ প্রধান নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।"

প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা ও জেনারেল মঞ্জুর হত্যা

ইতঃপূর্বে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও চট্টগ্রামের জিওসি জেনারেল মঞ্জুর হত্যা সম্পর্কে কর্নেল আবদুল হামীদ ও মেজর জেনারেল মইনুল হোসেনের রচিত পুস্তক থেকে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছি, তাতে এ উভয় হত্যা জেনারেল এরশাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তারা দু'জনের কেউ-ই তা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেননি। আমার ঐ লেখার পর মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের লেখায় এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট বক্তব্য পেলাম।

উপরিউক্ত তিন জন লেখকই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সকলেই তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের জন্য জেনারেল এরশাদকে দায়ী করেন। কর্নেল আবদুল হামীদ লিখেছেন, জেনারেল এরশাদ ও জেনারেল শওকত ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে তাঁর বিরুদ্ধে ভুল ধারণা দেওয়ার কারণে জিয়া তাঁর পরম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও জিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন লিখেছেন, এরশাদ সেনাবাহিনীতে তাঁর অবস্থান মযবুত করার হীন উদ্দেশ্যে তাঁকে সামরিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত থাকতে বাধ্য করেন। আর মেজর রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, সেনাপ্রধান এরশাদ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, পাকিস্তানফেরত অফিসার ছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকা সেনানিবাস থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর অবস্থান মযবুত করার ষড়যন্ত্র করেন এবং জিয়া হত্যার পর বহু জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক বাহিনী থেকে বিতাড়িত করেন। '৮১ সালে একবারেই ১৯ জন মেজরকে চাকরিচ্যুত করেন, যার মধ্যে তিনি নিজেও একজন।

শেখ মুজিব হত্যা ও জিয়াউর রহমান হত্যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরাট দুটো ঘটনা। তবে দুটো ঘটনার পার্থক্যও বিরাট। একটি হত্যায় স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে, অন্যটির পরিণামে আবার স্বৈরশাসন কায়েম হয়। একটি হত্যায় দেশবাসী আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেছে, অপরটিতে সিপাহি-জনতা কেঁদেছে।

জেনারেল মঞ্জুর হত্যা তত বড় ব্যাপার না হলেও তাঁর মতো যোগ্য, সাহসী ও নিষ্ঠাবান জেনারেল বেঁচে থাকলে একসময় অবশ্যই সেনাপ্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হতেন। তাই জিয়া হত্যা ও মঞ্জুর হত্যা সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলামের যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ জনগণের জানা প্রয়োজন।

যে তিন জন সেনা কর্মকর্তার লেখা গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি তারা সবাই একটি বিষয়ে একমত। তা হলো জেনারেল এরশাদ চতুরতা, ধূর্ততা ও কৌশলের যোগ্যতাবলে মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল জিয়াউর রহমানের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর ওপর জিয়ার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে জেনারেল এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার সাথীদের বিরুদ্ধে তাঁর কান ভারী করায় অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। একদিকে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে জেনারেল শওকত ও জেনারেল মঞ্জুরের সম্পর্ক বিনষ্ট করেন, অপরদিকে ঐ দু'জেনারেলের মধ্যেও আস্থাহীনতা সৃষ্টি করেন।

মেজর রফিকুল ইসলামের মতে, এরশাদ দেশের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো যোগ্যতার সাথে ক্ষমতার পথের কাঁটা জিয়া ও মঞ্জুরকে হত্যা করিয়ে পথ সুগম করেন।

জিয়া হত্যার জন্য দায়ী কে?

মেজর রফিকুল ইসলাম 'স্বৈরশাসনের নয় বছর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"এরশাদ জিয়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি-না তা তদন্তসাপেক্ষ, তবে তিনিই যে জিয়া হত্যার বেনিফিশারি বা ফলভোগকারী তা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে।

জিয়া হত্যাকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু মনে কয়েকটি প্রশ্ন তোলে, এরশাদ কেন ২৬ মে তারিখে জিয়া হত্যার মাত্র চার দিন আগে অনির্ধারিত সফরে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন এবং সারাদিন মঞ্জুরের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে কি আলোচনা হয়েছিল? বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী পরিদর্শনসূচি থাকলেও তিনি যাননি কেন? দ্বিতীয়, চট্টগ্রামে এত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের সমাবেশ তিনি কি উদ্দেশ্যে ঘটিয়েছিলেন? মঞ্জুর অফিসার বদলির আদেশ জারি করেননি, করেছিলেন তাঁর সামরিক সচিব। তৃতীয়, রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী হওয়ার কথা থাকলেও তিনি খোঁড়া অজুহাতে কেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গেলেন না? তাহলে কি এরশাদ জানতেন যে, সেই রাতেই জিয়া নিহত হবেন? চতুর্থ, শ্বেতপত্রে বলা হয়েছিল ডিজিএফআই প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী রাষ্ট্রপতিকে চট্টগ্রামে রাত্রিযাপন করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, জিয়া চট্টগ্রামে নিরাপদ নন। এ কথা সত্য হলে এরশাদ রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করেছিলেন? পঞ্চম, শ্বেতপত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মঞ্জুর জিয়াকে হত্যা করতে চাননি, বন্দি করতে চেয়েছিলেন। লে.

কর্নেল মতির সার্কিট হাউসের নিচ তলায় থাকার কথা। কার নির্দেশে মতি দৌড়ে দোতলায় গেলেন এবং পরিকল্পনায় হত্যার আদেশ না থাকা সত্ত্বেও নির্মমভাবে জিয়াকে হত্যা করলেন? এর সঙ্গে কি হিলটপ অফিসার মেসে এরশাদের সঙ্গে লাঞ্চের সময় আলাপ ও এর আগে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে এরশাদের সঙ্গে দেখা করার কোন সম্পর্ক আছে? ষষ্ঠ, মঞ্জুর আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানোর জন্য পুলিশপ্রধানকে অনুরোধ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে সেনানিবাসে নিয়ে এসে মাথায় একটি মাত্র গুলিবর্ষণে কেন বিনা বিচারে হত্যা করা হলো? শ্বেতপত্র অনুযায়ী উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক কর্তৃক হত্যার কথা সত্য হলে মঞ্জুর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে নিহত হতেন। একটি মাত্র গুলিবর্ষণে পরিকল্পিতভাবে একজন জেনারেলকে হত্যা করল কে, তা তদন্ত করে শনাক্ত করা হলো না কেন? যুদ্ধবন্দি শত্রুকেও আত্মসমর্পণের পরে হত্যা করা জেনেভা কনভেনশনবিরোধী। তাহলে কার নির্দেশে মঞ্জুরকে হত্যা করা হলো এবং মঞ্জুরের হত্যাকারী কে? সপ্তম, রাষ্ট্রপতির হত্যাকারী লে. কর্নেল মতি ও লে. কর্নেল মেহবুবকে কেন বন্দি করার পরিবর্তে বিনাবিচারে হত্যা করা হলো? অষ্টম, মঞ্জুরকে কোনো তদন্তে দায়ী সাব্যস্ত করা যায়নি। এমন হতে পারে যে, তরুণ অফিসারগণ বিদ্রোহ করে জিয়াকে হত্যা করেছিল। তাহলে খুনি মঞ্জুরের নেতৃত্বে জিয়া নিহত— এ ঘোষণা বারবার টেলিভিশন ও বেতার থেকে কেন প্রচার করা হলো? নবম, মঞ্জুর, মতি ও মেহবুব জীবিত থাকলে এরশাদের জড়িত থাকার বিষয়টি কি ফাঁস হয়ে যেত? দশম, শওকতকে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে অবসর প্রদান ও বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রমকেও বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকে অবসর প্রদান করা হয়। এই তিন সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে অপসারণ করা হলো কেন? এটা কি নীল-নকশার অংশ? একাদশ, জিয়া হত্যাকাণ্ডে মঞ্জুরের সঙ্গে সেনাবাহিনীর আর কারা জড়িত ছিল তা অনুসন্ধানের জন্য মেজর জেনারেল সামাদের নেতৃত্বে একটি স্ক্রিনিং বোর্ড গঠিত হয় এবং এই স্ক্রিনিং বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী শাসনতন্ত্রবিরোধী এবং বেআইনিভাবে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার পন্থা অবলম্বন করে ১৯৮১ সালে ১১ নভেম্বর ১৯ জন অফিসারকে (যাদের বেশির ভাগই মুক্তিযোদ্ধা ও অন্য সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন) কোন কারণ না দেখিয়ে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হলো কেন? তৎকালীন সামরিক সচিব অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের এই ঢালাও অপসারণের কারণ কী? দ্বাদশ, মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রমুখ থাকতে বৃদ্ধ অথর্ব অসুস্থ সাত্তারকে শাসনতন্ত্রে পঞ্চম সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিতে বিএনপি'র উপর চাপ প্রয়োগ করা হলো কেন? এটাও কি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ? ত্রয়োদশ, সেনাবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছে। এতে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়-দায়িত্ব কি সেনাপ্রধানের ওপর বর্তায় না? চতুর্দশ, জিয়া নিহত হন ভোর ৫-৪০ মিনিটে অথচ জিয়া নিহত হওয়ার প্রায় ৪০ মিনিট আগে থেকেই এরশাদ তার পিএসওদের সেনাবাহিনীর

সদর দপ্তরে ডাকেন এবং সামরিক পোশাকে অপেক্ষা করতে থাকেন। জিয়া নিহত হওয়ার আগেই তিনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কি কারো সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন? পঞ্চদশ, মাত্র তিন মাসের মধ্যে একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতার জোরে উৎখাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেন এরশাদ কোন্ বৈধ অধিকারে? ষোড়শ, মঞ্জুরের তত্ত্বাবধানে যারা নিয়োজিত ছিলেন এবং শ্বেতপত্র অনুযায়ী যাদের ব্যর্থতার কারণে মঞ্জুর উচ্ছৃঙ্খল সিপাইদের হাতে নিহত হলেন, তারা শাস্তি বা তিরস্কৃত না হয়ে পুরস্কৃত হলেন কেন? সপ্তদশ, তিনি কীভাবে এত ভোরে জিয়া নিহত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন, কে তাকে এই সংবাদ দিয়েছিল? অষ্টাদশ, তৎকালীন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনার সাইফুদ্দিনকে লন্ডনে ইকোনমিক মিনিস্টার ও জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিনকে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকে লোভনীয় চাকরি প্রদান করা হয়েছিল কেন? উনবিংশ, বিএনপি'র একাংশের সঙ্গে তার যোগসাজসের বিষয়টি কি পূর্বপরিকল্পিত নয়? সবশেষে জিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের বেসামরিক আদালতে খোলা বিচার অনুষ্ঠান না করে চট্টগ্রাম কারাগারের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচারের নামে প্রহসন করা হলো কেন এবং তড়িঘড়ি করে কেন তাঁদের ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হলো? জিয়া হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত হলে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এবং নেপথ্য হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।" (পৃষ্ঠা : ৪০ ও ৪১)

"জিয়া হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় পত্রিকা 'সানডে টাইমস'-এ। এই পত্রিকা তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করে বলেছে, ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন থাকাকালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW- Research and Analysis Wing) ভারতবিদ্বেষী জিয়াকে হত্যা করে এরশাদকে ক্ষমতাসীন করার ষড়যন্ত্র করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রশিক্ষণরত সময়ে দিল্লীর পুলিশ কমিশনার জাসপল সিং-এর সঙ্গে এরশাদের আন্তরিক বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাসপল সিং-এর মাধ্যমে এরশাদ 'র'-এর এজেন্ট হতে সমর্থ হন। ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হলে জিয়া হত্যার নীলনকশা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর আদেশে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হলে জিয়া হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী 'র' অগ্রসর হয়।" (পৃষ্ঠা : ৪২)

মঞ্জুর হত্যার জন্য দায়ী কে?

জেনারেল মঞ্জুর হত্যা সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলাম ঐ একই পুস্তকে লিখেন,

"জিয়া হত্যাকাণ্ডে এরশাদ কতটুকু জড়িত তা তদন্তসাপেক্ষ হলেও এরশাদের ব্যক্তিগত আদেশেই যে মঞ্জুরকে স্থিরমস্তিষ্কে হত্যা করা হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বঙ্গভবনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলেন এরশাদ ও সদরুদ্দিন। নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডিমিরাল এম. এ. খান তখনো চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরতে পারেননি। এমন সময় পুলিশের আইজি উপস্থিত হয়ে মঞ্জুরের ধৃত হওয়ার খবর দেন। এতে এরশাদ স্প্রিং-এর

মতো লাফিয়ে উঠে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ফোন করে একজন ঊর্ধ্বতন অফিসারকে নির্দেশ দেন, Go ahead with that plan. সদরুদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, May I know what is that plan? এতে এরশাদ রাগান্বিত স্বরে জবাব দিলেন, এয়ার চিফ! আপনি ওসব বুঝবেন না। সদরুদ্দিন এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, But Manzur should not be killed. If Manzur is killed, you will be answerable to the whole nation. উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পরে বৈঠক এখানেই শেষ হয়। ঐদিনই এরশাদ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কয়েকজন জেনারেলকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন এবং এই বৈঠকে মঞ্জুরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতঃপর এরশাদ মঞ্জুরকে হত্যা করার আদেশ দেন।

পরদিন সকালে রেডিওতে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক কর্তৃক মঞ্জুর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সদরুদ্দিন এরশাদকে ফোনে বলেন, এরশাদ সাহেব! শেষ পর্যন্ত আপনারা মঞ্জুরকে মেরেই ফেললেন। এরশাদ জবাবে বলেন, You know, some indisciplined soldiers killed him. সদরুদ্দিন ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, এই গল্প অন্য কাউকে বলুন। Atleast don't ask me to believe it.

এর কয়েকদিন পরে এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকে বিমানবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করে সুলতান মাহমুদকে বিমানবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে এই ঘটনার যেন কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়, সেজন্য দ্রুত সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কর্মরত মেজর পদমর্যাদা ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সম্মেলনকক্ষে সমবেত করে এরশাদ ভাষণ দেন। এই ভাষণে এরশাদ বলেন, এয়ার চিফ সদরুদ্দিন বিমান বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে বরখাস্ত করার সুপারিশসহ ফাইল নিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য যান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে সদরুদ্দিনকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে ফাইল প্রসেস করার জন্য বলেন। সদরুদ্দিন এতে রাগ করে পদত্যাগের হুমকি দিলে সাত্তার তাকে পদত্যাগ করতে বলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার স্বাক্ষর না করে প্রতিরক্ষা সচিবকে দিতে বললে সদরুদ্দিন বলেন, আপনি সুপ্রিম কমাণ্ডার, আমি আপনার চিফ অব স্টাফ, What more your Defence Secretary can add to this. এর অর্থ হচ্ছে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। If you don't trust me, then I also don't trust you. I will offer my resignation.

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মঞ্জুর ধৃত হওয়ার আগে চট্টগ্রাম বেতার থেকে তাঁর ভাষণ ও অভ্যুত্থানের সপক্ষে বেতারে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল। এরশাদ এই বেতার কেন্দ্রটিতে বোমাবর্ষণের জন্য সদরুদ্দিনকে অনুরোধ করেন। সদরুদ্দিন বোমাবর্ষণে অস্বীকার করলে এরশাদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া সদরুদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং প্রয়াত জিয়ার প্রিয়ভাজন ছিলেন। আর সেজন্য তিনি ছিলেন এরশাদের চক্ষুশূল। জিয়া নিহত হওয়ার পরে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে এরশাদ সামরিক আইন জারির প্রস্তাব করলে সদরুদ্দিন আরো কয়েকজন

জেনারেলের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে সামরিক আইন জারির বিপক্ষে মত দেন। এর পরে আরো দু'টি বৈঠকে সদরুদ্দিন অনুরূপভাবে সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া সদরুদ্দিন এরশাদের এইসব কার্যকলাপে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ছয় পৃষ্ঠার একটি পত্র লিখে এরশাদের উচ্চাভিলাষ ও সম্ভাব্য সামরিক শাসনের ইঙ্গিত দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার অনুরোধ করেন। এসব কারণে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করার জন্য সদরুদ্দিনকে অপসারণ করা হয়। অপরদিকে সুলতান মাহমুদ মুক্তিযোদ্ধা হলেও সদরুদ্দিনের বিপক্ষে ছিলেন এবং এরশাদের পক্ষের লোক ছিলেন।" (পৃষ্ঠা : ৪২ ও ৪৩)

অভিনেতার ভূমিকায় এরশাদ

মার্শাল ল' জারি করে দেশের সকল সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক সরকারের সকল বিভাগের কর্তৃত্ব দখল করে জেনারেল এরশাদ দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তার সর্বপ্রথম চমকপ্রদ অভিনয় হলো, সেনানিবাসস্থ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অফিসে সাইকেলে চড়ে আগমন। টেলিভিশনে আমি তাকে সাইকেলে দেখে অত্যন্ত কৌতুকবোধ করেছি। তিনি সামরিক অফিসার হিসেবে দীর্ঘ চাকরিজীবনে হয়তো সে দিনই প্রথম সাইকেলে চড়ে অফিসে এলেন। তিনি দেশবাসীকে দেখাতে চাইলেন যে, তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই সরল জীবন যাপন করবেন এবং দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

তার অভিনেতাসুলভ ভূমিকা সম্পর্কে মেজর রফিকুল ইসলাম 'স্বৈরশাসনের নয় বছর' পুস্তকে লিখেন ঃ

"এরশাদ প্রতিটি সেনানিবাসে সফর করে বেড়াতে লাগলেন এবং অরাজনৈতিক সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, তিনি সৈনিক এবং সৈনিক হিসেবেই তিনি তাদের মধ্যে থাকতে চান, রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। আবার বললেন, সেনাবাহিনীই দেশের একমাত্র রাজনৈতিক সংঘবদ্ধ দল।

সামরিক আইন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির দায়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা ছাড়াও কয়েকজন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হলো। বেঙ্গল কার্পেটের আবুল খায়ের লিটু, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংকের মোর্শেদ খান, বেঙ্গল স্টিল লিমিটেডের আজিজ মোহাম্মদ ভাই ও রাজনৈতিক নেতা মওদুদ, জামালউদ্দিন, হাসনাত ও অন্যদের গ্রেপ্তার করা হলো। দেশের কোটিপতি নামে পরিচিত জহুরুল ইসলাম ও হাই স্পিড নেভিগেশনের মালিক মাহমুদুর রহমানের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করা হলো। এভাবে একদিকে এরশাদ বোঝাতে চাইলেন, দুর্নীতি দমনে তিনি বদ্ধপরিকর, অপরদিকে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের বোঝালেন যে, উগ্রপন্থিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এরশাদের নেতৃত্বের সরকার তাদের জন্য নিরাপদ। এক ঢিলে এরশাদ অনেকগুলো পাখি মেরে নিজ অবস্থান সংহত করলেন।

সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য তরুণ অফিসারদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য চটকদার পরিবর্তন আনা হলো। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলো। এরশাদ স্লোগান দিলেন, '৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে'। তিনি একটি গান লিখলেন, 'নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা, নতুন করে আজ শপথ নিলাম।' সারা দেশে এই গান প্রতিটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হতে লাগল।" (পৃষ্ঠা : ৫২)

ক্ষমতা সুসংহত করার কৌশল

এ বিষয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম লিখেন :

১. "দেশ পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর সকল স্তরের ও সৈনিকদের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়াও প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সমর্থন। এই প্রত্যাশিত সমর্থন ছাড়া দেশ চালানোর মতো একটা দুরূহ কাজ সহজসাধ্য হয় না। সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ছিলেন সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে। এরশাদ ছিলেন অনেকের দৃষ্টিতেই অযোগ্য, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ। একজন চরিত্রহীন এ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিয়ে দেশের মঙ্গল হতে পারে না, দুর্নীতির বিরুদ্ধে উদ্ভট জেহাদ সফল হতে পারে না এবং দেশের জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর হতে পারে; দেশকে পৌঁছে দিতে পারে সর্বনাশের শেষ সীমায়। এই আশঙ্কায় সামরিক শাসনের বিরোধী না হলেও এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক শাসনবিরোধী ছিলেন অনেকেই। মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান, মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী ও আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার ব্যতীত কেউ এরশাদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে পারেননি। মেজর জেনারেল মান্নাফ, মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান, মেজর জেনারেল সামাদ ও মেজর জেনারেল শামসুজ্জামান প্রমুখ সকলেই সামরিক আইন জারির প্রশ্নে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু এরশাদ ক্ষমতাদখলে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এরশাদ সামরিক আইন জারি করবেন— এই বিষয়ে সামরিক আইন জারির আগে ঢাকার বাইরের অন্য জেনারেল ও অফিসারগণ জানতেন না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমর্থনে এরশাদ যখন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর নামে সামরিক আইন জারি করলেন, তখন যাঁরা সামরিক শাসনের পক্ষে ছিলেন না তাঁরাও সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন।" (পৃষ্ঠা : ৫০)

২. "এরশাদ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেন তার সদস্য মনোনীত হলেন, অর্থ উপদেষ্টা এ. এম. এ. মুহিত, কৃষি উপদেষ্টা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, শিল্প উপদেষ্টা শফিউল আজম। অন্যরা ছিলেন মাহবুবুর রহমান, মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী, মেজর জেনারেল আবদুল মান্নান সিদ্দিকী, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, এয়ার ভাইর্স মার্শাল আমিনুল ইসলাম ও দুই উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ ও রিয়ার এডমিরাল এম. এ. খান।"

৩. "সৈনিক ও অফিসারদের বোঝানোর জন্য কয়েকজন অফিসার সেনানিবাসগুলো সফর করে বেড়াতে লাগলেন। সেনাবাহিনীর নতুন অফিসারদের এর ফলে দলে টানা সম্ভব হলো। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই অভিযান জাদুর মতো কাজ করল। এরশাদ এই কৌশলের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সৈনিক ও অফিসারদের বোঝাতে সফল হলেন যে, এবারের সামরিক আইন চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার ক্ষমতা দখলের সামরিক শাসন নয়, এটা এরশাদের ক্ষমতা দখলের জন্য সামরিক শাসন নয়, বরং এটা তরুণ অফিসারদের সামরিক আইন। বাংলাদেশের চির পুরাতন জরাজীর্ণ ঘুণেধরা দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের জন্যই এই ব্যতিক্রমধর্মী সামরিক শাসন ঘোষণা করা হয়েছে।

ধূর্ত এরশাদ এভাবে তরুণ অফিসারদের সমর্থন আদায় করলেন এবং উর্ধ্বতনদের বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁরা যদি তাঁর সহযোগিতা না করেন তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তরুণ অফিসাররা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রশাসন দখল করবে এবং সেক্ষেত্রে উর্ধ্বতন জেনারেলগণ ও আমলারা চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত ও নির্যাতনের শিকার হবেন।" (পৃষ্ঠা : ৫১)

৪. "এরশাদ সামরিক বাহিনীর সকলকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এই সময় দু'বার বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন লাভের আশায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এক সভায় ঘোষণা করেন, তিনি নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা। এরশাদকে এই সভায় চাটুকরেরা 'রণবীর' উপাধি দেয়। অপর এক সভায় কিছু দিন পরে চাটুকারেরা তাকে পল্লীবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি, অর্থের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করলেন এবং তরুণ অফিসাররা যারা বিপ্লবী স্লোগান তুলেছিলেন তাদেরকে রাতারাতি বদলি করে দিলেন এবং তারপর থেকে এরশাদ একজন পূর্ণাঙ্গ রাজনীতিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন।"

৫. "সামিরক আইন জারির পরে বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু দিন না যেতে তিনি নিজেই রাষ্ট্রপতি হতে চাইলেন। এরশাদ পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে রাজনীতিতে যুক্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা বেমালুম ভুলে গেলেন। তিনি প্রথমে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মন্ত্রী পদে উন্নীত করলেন। কারণ হিসেবে এরশাদ বললেন, উপদেষ্টা হিসেবে কেবিনেট সদস্যগণ বিদেশে সমাদৃত হন না, এ কারণেই উপদেষ্টা শব্দটি পরিবর্তন করে মন্ত্রী করা হয়েছে। এরপরে যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার প্রাক্কালে তিনি নিজেকে President of the Council of Ministers পদে ভূষিত করলেন। তিনি বললেন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে সভ্য জগতে কেউ সম্মান করে না, তাই এ ব্যবস্থা। সেনাবাহিনীর সদস্যদের বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তাকে বিচারপতি আহসানউদ্দিনের বাম পাশে দাঁড়াতে হয়, এতে সশস্ত্র বাহিনীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং তার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত।" (পৃষ্ঠা : ৫৩)

২১১.

সামরিক শাসন জারির কোন পরিস্থিতি ছিল না

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপতি এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন। রাষ্ট্রের পবিত্র আমানত জনপ্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্র মুলতবি ঘোষণা করলেন। অথচ এ শাসনতন্ত্র বহাল রাখার শপথ নিয়েই তিনি সেনাপতি হয়েছিলেন। নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল করায় মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। মাত্র চার মাস পূর্বে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা হলো।

পাঁচটি পদাতিক ডিভিশনের জিওসিকে পাঁচজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হলো। প্রতিটি জেলায় সামরিক আইন প্রশাসক ও সামরিক আইন আদালত কায়েম করা হলো। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ অনভিজ্ঞ সামরিক শাসকদের অধীনে বিব্রতবোধ করলেন।

দেশে কি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছিল যে, বেসামরিক শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ার দরুন সামরিক শাসন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল? দেশে বেসামরিক প্রশাসন চালু ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিল না। সেনাপ্রধান মন্ত্রিসভার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় প্রেসিডেন্ট ৪২ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে ১৮ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদকে ঐ পরিস্থিতিতে যা করণীয় তা করতে দেওয়া উচিত ছিল। সামরিক শাসন জারীর কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রেসিডেন্টের বার্ধক্য ও কাপুরুষতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতালোভী সেনাপতি দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মুলতবি করে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

কোন্ পরিস্থিতিতে সামরিক শাসনের প্রয়োজন হয়

যখন কোন দেশে বেসামরিক সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে জনগণ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে লিপ্ত হয় এবং সরকার গণ-আন্দোলন দমন করতে অক্ষম হয়, যার ফলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে তখন জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সামরিক শাসন ছাড়া হয়তো কোন উপায় থাকে না।

যেমন— ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে মি. ভুট্টো ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করলেন। তখন সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল ভুট্টোর পদত্যাগের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ব্যর্থ হলো। ভুট্টো সেনাবাহিনীকে বিক্ষোভরত জনগণকে দমন করার জন্য নিয়োগ করলেন। জনগণ সেনাবাহিনীর গুলির সামনে বুক পেতে দিতে প্রস্তুত হলে সেনাবাহিনী গুলি চালাতে অস্বীকার করল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল।

এ পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক সামরিক আইন জারি করলেন। জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়াই তাঁর উচিত ছিল; কিন্তু কোন সেনাবাহিনীই ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর সহজে ফিরে যায় না। যা হোক পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, তখন সামরিক আইন জারি করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

বাংলাদেশে এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি যে, সামরিক শাসন অপরিহার্য ছিল। এরশাদের ক্ষমতা দখলকে জেনারেল আইয়ূব খানের সাথে তুলনা করা যায়। তিনিও সামান্য অজুহাতেই সামরিক শাসন জারি করে ১০ বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলনের ফলেই বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। এরশাদও নয় বছর স্বৈরশাসনের পর গণআন্দলোনেই বিদায় হন।

এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর

ক্ষমতা দখলের সময় এরশাদের ঘোষণা ছিল ঃ

১. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

২. দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা হবে।

৩. দেশের অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হবে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, এসব ঘোষিত করণীয়ের বদলে তিনি এমন কতক পদক্ষেপ শুরু করলেন, যা দীর্ঘমেয়াদী কর্ম। বোঝা গেল, 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চান।

১. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে ভেঙে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরে চারটি হাই কোর্ট স্থাপিত হলো। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি প্রতিবাদ করলে ১৩ জন প্রখ্যাত আইনজীবীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসন শুরু হয়ে গেল।

২. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে থানাকে উপজেলায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হলো। উপজেলা পরিভাষা সৃষ্টির পর মহকুমাগুলোকে জেলার মর্যাদা দেওয়া হলো।

এসব দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক মহলে এ ধারণা হয় যে, দীর্ঘকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এগুচ্ছেন।

মনে পড়ে একটা ঘটনার কথা। সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় কমান্ডার আতাউর রহমান ফোনে যোগাযোগ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী আপনাকে একটা ম্যাসেজ দিয়েছেন এবং তা পৌছানোর দায়িত্ব আমাকে দিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। বললেন, এরশাদ সরকার উপজেলা পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনারা এটা গ্রহণ করবেন বলে সরকার আশা করে। আমি বললাম, এ বিষয়ে দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি এখন কোন মন্তব্য করব না। তিনি বললেন, জেনারেল সাহেব জানিয়েছেন, এ সরকার একমাত্র প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে এটাকেই চালু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এর জন্য প্রয়োজন হলে রক্তপাত করতেও সরকার প্রস্তুত। আমি বললাম, জোর করে যারা ক্ষমতা দখল করেছেন তারা শক্তিবলে যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তাতে আমাদের মতামত চাওয়া অর্থহীন।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে টি এন্ড টি কলোনী মসজিদে ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। '৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর এক বছরে জেলা শহরগুলোতে সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেল। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে তাঁরা দু'জন ব্যক্তিত্বকে হাজির করার চেষ্টা করলেন। একজন হাফেযজী হুজুর, অপর জন ছারছিনার পীর সাহেব মাওলানা আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ। পীর সাহেবকে তারা নাগাল পেয়েছিলেন কি-না আমি জানতে পারিনি। তবে হাফেযজী হুজুর ঢাকায় অবস্থান করেন বলে এ বিষয়ে আমি অবহিত হই।

সম্মেলনের আগের দিন চরমোনাইর পীর সাহেবের উদ্যোগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত হাফেযজী হুজুরকে সম্মেলনে হাজির করার উদ্দেশ্যে যান। পীর সাহেব ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি যাদেরকে সাথে নিয়ে যান তারা হলেন—

১. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম।

২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

৩. ক্যাপটেন আবদুর রব, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় সহকারী কমিশনার। তিনি দারুণ আবেগ নিয়ে ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহী বিভাগে চাকরিরত অবস্থায় বিভিন্ন ইসলামী মাহফিলে তাঁকে আমি অত্যন্ত জোশীলা বক্তৃতা দিতে দেখেছি।

তাঁরা হাফেযজী হুজুরের দরবারে পৌঁছলে চরমোনাইর পীর সাহেব কথা শুরু করতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, তুমি কেমন করে জামায়াতের ধোঁকায় পড়লে? নতুন শাড়ি পরে নতুন নাম নিয়ে এটা তো মওদূদী-জামায়াতই। তাঁরা এক রকম বিতাড়িত হয়েই ফিরে এলেন।

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন ডেলিগেটগণ ছাড়াও অনেক নতুন লোক এতে শরীক হন। এ সম্মেলনে ঐক্যের দাওয়াত সারা দেশে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী বছরের জন্যও চরমোনাইর পীর সাহেবকেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্র নির্বাচিত করা হয়।

হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা

পীর সাহেব লালবাগ মাদরাসারই ছাত্র। হাফেযজী হুজুর পীর সাহেবের উস্তাযের উস্তায। ইসলামী ঐক্যে হাফেযজী হুজুরকে আনার প্রচেষ্টা তিনি জারি রাখলেন। একদিন পীর সাহেব আমার বাড়িতে হঠাৎ করে বিনা খবরেই এলেন। তিনি মেহেরবানী করে বহুবারই আমার বাড়িতে এসেছেন এবং কোন সময়ই যোগাযোগ করে আসেননি। ঐদিন এসে বললেন, হাফেযজী হুজুরের সাথে আপনাকে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমি তাঁকে ঐক্যের ব্যাপারে বোঝাতে পারলাম না। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনারা যদি তাঁকে বোঝাতে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তাহলে আমার পক্ষে তা কেমন করে সম্ভব হবে? তিনি বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে একত্রে বসাতে চাই। বললাম, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আপনি দিন-তারিখ ঠিক করে আমাকে জানান। আপনি নিজে এসে যদি আমাকে সাথে করে নিয়ে যান তাহলে আমি অবশ্যই যাব।

১৯৮৩ সালের ঘটনা। পীর সাহেব দিন-তারিখ-সময় নির্দিষ্ট করে আমাকে জানালেন। ঐ ধার্যকৃত তারিখে আমি যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে রইলাম। সকাল ৯টায় পীর সাহেব আমার বাড়িতে পৌঁছার কথা এবং ১০টায় সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত। সকাল সাড়ে আটটায় পীর সাহেব আমাকে ফোন করলেন। অত্যন্ত আফসোস করে বললেন, হঠাৎ গত রাতে হাফেযজী হুজুর তেহরান চলে গেছেন বলে সাক্ষাৎ হচ্ছে না। এভাবেই পীর সাহেবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

হাফেযজী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৮৪ সালে আমার এক দীনী বন্ধু মাওলানা আবদুল হাই আমাকে না জানিয়েই হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা চালালেন। হুজুরের ছেলেরা তার খালাত ভাই। তিনি বয়সে তাদের বড়। তাদের সামষ্টিক চেষ্টায় হাফেযজী হুজুর আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হলেন। মাওলানা আবদুল হাই মোহাম্মদপুর থাকতেন। এখনও সেখানেই থাকেন। বর্তমান বয়স ৭৮ বছর।

আমি ফোনে ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র অফিস সেক্রেটারি মাওলানা মাযহারুল হককে জানালাম, হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার অমুক সময় সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। চরমোনাই'র পীর সাহেব ঢাকায় আছেন কি-না, খোঁজ নিন। তিনিই তো এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যদি তাকে পাওয়া যায় তাহলে যথাসময়ে ওখানে হাজির থাকার জন্য আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ করবেন। মাওলানা আমাকে ফোনে জানালেন, পীর সাহেব যথাসময়ে যাবেন। আমি খুব খুশি হলাম। কারণ তিনি হাজির থাকলে ইসলামী ঐক্যের পক্ষেই কথা বলবেন।

১৯৮৪ সালের এপ্রিলের কোন এক তারিখে মাওলানা আবদুল হাই আমাকে হাফেযজী হুজুরের দরবারে নিয়ে গেলেন। আমার সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও গেলেন। সেখানে হাফেযজী হুজুরের তিন ছেলে এবং ১০/১২ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন চরমোনাই'র পীর সাহেব।

হাফেযজী হুজুর চৌকিতে বসা ছিলেন। বাকি সবাই মেঝেতে। আমাদের দু'জনকে চৌকিতে হাফেযজী হুজুরের সামনে বসতে দিলেন।

আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। কেন গেলাম সে কথা তো প্রথমে আমাকেই বলতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বক্তব্য পেশ করলাম, যার সারকথা হলো—

ইসলামের বিজয়ের পথে ইসলামী ঐক্যের অভাবই প্রধান বাধা। আপনি ইসলামী খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে এ বয়সে নির্বাচন করলেন এবং 'খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি ইসলামী সংগঠনও কায়েম করলেন। সবার মুরব্বী হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনি ডাক দিতে পারেন। আপনার ডাকে জামায়াতে ইসলামীও সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি উর্দুতে কথা শুরু করলেন। আওয়াজ খুবই অস্পষ্ট মনে হলো, তার কথা শোনার প্রয়োজনে চৌকিতে এগুতে এগুতে তার এতটা কাছে যেতে বাধ্য হলাম যে, আমার কান তার মুখের মাত্র এক ফুট দূরে ছিল। তার বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ।

"আমাদের আকাবিরীন (নেতৃস্থানীয় আলেমগণ) মাওলানা মওদূদীর খিলাফত তথা চিন্তাধারাকে সহীহ্ মনে করেন না। মাওলানা থানভী (র) (যিনি তার পীর এবং তিনি যার খলীফা) মাওলানার চিন্তাধারা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, আমার দিলে এতমিনান (আস্থাবোধ) হয় না"। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উর্দুতেই কথা বললেন।

আমি বললাম, "মাওলানা মওদূদীকে আমরা নির্ভুল মনে করি না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে কী কী ভুল আছে, তা ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নেব। আপনি কয়েকজন আলেমকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিলে জামায়াতের কয়েকজন তাদের সাথে বসে ভুলগুলো জেনে নিতে পারবে। আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।"

চরমোনাই'র পীর সাহেব বললেন, হুজুর অনুমতি দিলে আমরা এ ব্যবস্থা করতে পারি। হাফেযজী হুজুরের মেঝো ছেলে হাফেয হামীদুল্লাহ্ অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, আব্বা আপনি এজাযত দিন— এ ঝগড়ার মিটমাট হয়ে যাক।

হাফেযজী হুজুর রাগতকণ্ঠে হাত উঁচিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি বুযুর্গানে দীনের সাথে আছি।" উত্তেজিত অবস্থায় বলায় এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা গেল। উপস্থিত সবাই একদম হতবাক হয়ে রইলেন। আমরা দু'জন সালাম দিয়ে বিদায় হয়ে এলাম।

হাফেযজী হুজুরের সাথে এ বৈঠকের উদ্যোক্তা মাওলানা আবদুল হাইকে আজ (১৯.০৬.০৫) এ লেখাটা পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, বৈঠকে হাফেযজী হুজুরের দু'জামাতাও উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা আবদুল হাই আরও বললেন, "আপনাদের সাথে সাক্ষাতের পরের দিন আমি আবার হাফেযজী হুজুরের নিকট গিয়ে বলেছিলাম, হুজুর! এমন একটা সুন্দর প্রস্তাব আপনি কেন গ্রহণ করলেন না? জামায়াতের সাথে বসে তাদেরকে সংশোধন করার সুযোগটা নিলে কি ভালো হতো না?"

জবাবে হাফেযজী হুজুর নাকি বলেছিলেন, "ওদের সাথে বসায় অসুবিধা আছে। ওরা জানে, আরবের আলেমগণ মাওলানা মওদূদীকে সমর্থন করবে। আমরা আপত্তি তুললে তারা আরবের আলেমদের অভিমতও তুলে ধরতে পারে।" মাওলানা আবদুল হাই নাকি বলেছিলেন, আরবের আলেমদের কি ইসলাম সম্পর্কে সহীহ্ ইল্‌ম নেই? তিনি এ কথার কোন জওয়াব দেননি।

এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ ঘোষণা করলেন, ১ এপ্রিল থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ 'ঘরোয়া' রাজনীতি করতে পারবে। অর্থাৎ ঘরের ভেতরে বৈঠকাদি করা ও সামরিক আইনের সীমালঙ্ঘন না করে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

কিন্তু জেনারেল এরশাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি এমন এক রাজনৈতিক বালকসুলভ আবেগ প্রকাশ করে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং রাজনৈতিক বিবৃতি প্রদান শুরু হয়ে গেল। জমিয়তে মুদাররিসীনের এক বিরাট সম্মেলনে হাজার হাজার মাদরাসা শিক্ষকের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে ইসলামের মহানেতার ভূমিকায় অভিনয় করে বসলেন। তিনি এমন তিনটি ঘোষণা দিলেন, যা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহলের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

১. তিনি ঘোষণা করলেন যে, তার সরকার বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

২. আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কুরআনখানি ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী তরীকায় শহীদ দিবস পালন করা হবে এবং অনৈসলামী কোন কার্যকলাপ সেখানে হতে দেওয়া হবে না।

৩. আর্ট কলেজের জনৈক অধ্যাপক ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে মক্কার সাথে মস্কোর তুলনা করার খবর পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও আপনারা জিহাদের ডাক দিলেন না, আমি কি একা জিহাদ করব? আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি আপনাদের সাথে আছি।

পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সব দৈনিক পত্রিকায় বড় বড় হেডিং-এ এসব বিপ্লবী ঘোষণার বিবরণ প্রকাশিত হলো। ঐ দিনই ১৫ দলীয় জোট গঠিত হলো। সাধারণত রাজনৈতিক দলসমূহের জোট গঠন করতে বহু লবির দরকার হয় বলে এটাকে সময়সাপেক্ষ ব্যাপারই মনে করা হয়। কিন্তু ১৫টি দলের বিরাট জোট হঠাৎ একদিনের মধ্যেই কেমন করে গঠন করা সম্ভব হলো? এর গোটা কৃতিত্ব জেনারেল এরশাদের প্রাপ্য। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহু দল ভেঙে টুকরো টুকরো করে দুর্নাম কুড়িয়েছেন। এরশাদ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ব্যবস্থা করে 'সুনাম' কামাই করলেন।

১৫ দলীয় জোটের পনেরো জন সভাপতি ও সচিবের যুক্ত স্বাক্ষরে ঐ দিনই এরশাদের ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদে এক বিরাট ও বিদ্রোহাত্মক বিবৃতি পত্রিকার অফিসে পৌঁছল। ঐ বিবৃতিটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ঐ বিবৃতির কোন কথাই পরের দিনের পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি। কারণ বিবৃতিটির প্রতিটি কথাই সামরিক আইনের আওতায় পড়ে। এ বিবৃতি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকসহ কর্তাদের নজরে নিশ্চয়ই পড়েছিল। কিন্তু সামরিক আইনের চরম বিরোধী বিবৃতি দেওয়ার জন্য সরকার সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করার সাহসও পায়নি। পত্রিকাওয়ালারা আইনের ভয়ে ছাপেনি। কিন্তু এ বিবৃতিদাতারা বুঝতে পারলেন যে, এরশাদ কাগুজে বাঘ মাত্র।

এরশাদের ঐসব বালখিল্য ঘোষণা দেশের ইসলামবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আর কোন কল্যাণই করেনি। তার তিন দফা ঘোষণার কোনটাই তিনি বাস্তবায়িত করার সামান্য উদ্যোগও নেননি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঐবার আগের চেয়েও বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ঐসব অনুষ্ঠানই হলো, যা করতে দেওয়া হবে না বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন। মক্কার সাথে মস্কোর তুলনা করার বিরুদ্ধে জিহাদ করার দায়িত্ব মাদরাসা

শিক্ষকদের হাতে দিয়ে এরশাদ সাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে নীরব রইলেন। আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যা করা দরকার তার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ হলেন।

ঘরোয়া রাজনীতি শুরু

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা দিলেন, আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। এ ঘোষণার পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। বিবৃতির প্রধান বিষয় ছিল মুলতবি শাসনতন্ত্রের পুনর্বহালের দাবি। সামরিক শাসনের কারণে শাসনতন্ত্র মুলতবি করা হয়। এখন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু করতে হলে মুলতবি শাসনতন্ত্রকে বহাল করতে হবে। রাজনৈতিক দল ও জোটের পক্ষ থেকে মুলতবি শাসনতন্ত্র বহাল করার দাবি করাই যথার্থ ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বিভিন্ন দল নিজেদের সুবিধা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এ বিষয়ে পৃথক পৃথক দাবি উত্থাপন করল।

১. আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় জোট দাবি জানাল যে, শাসনতন্ত্রের তৃতীয় সংশোধনী পর্যন্ত বহাল করা হোক এবং পরবর্তী সংশোধনীগুলো বাতিল করা হোক।

২. বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় জোট দাবি করল, পঞ্চম সংশোধনী পর্যন্ত বহাল করা হোক।

৩. আরও কয়েকটি দল দাবি করল, ১৯৭২ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র সকল সংশোধনী বাতিল করে অরিজিন্যাল অবস্থায় বহাল করা হোক।

এসব দাবির যৌক্তিকতা

যারা এসব দাবি উত্থাপন করেছেন তাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। ১৫ দল পঞ্চম সংশোধনী চান না। কারণ তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। এ সংশোধনী দ্বারা শাসনতন্ত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' সংযোজন করা হয়েছে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ধারা উৎখাত করা হয়েছে। এসব সংশোধনী তাদের আদর্শবিরোধী। তাই তারা চান না যে, এ সংশোধনীটি বহাল থাকুক।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে 'বাকশাল' নামে একটি দল কায়েম করে আজীবন রাষ্ট্রপ্রধান থাকার উদ্দেশ্যে যে চতুর্থ সংশোধনী পাস করিয়েছিলেন তা তাদের নিকট যত পছন্দনীয়ই হোক, ঐ সময় তারা তা বহাল করার দাবি করতে সাহস করেননি। তাই তারা এর পূর্বের তিনটি সংশোধনী বহাল রাখার দাবি জানালেন।

বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট সঙ্গত কারণেই পঞ্চম সংশোধনী বহাল রাখার পক্ষে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই এ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা ১৫ দলীয় জোটের আদর্শের বিপরীত।

যারা ১৯৭২-এর মূল শাসনতন্ত্র বহাল করার দাবি জানালেন তারা সকল সংশোধনীই বাতিল করতে চেয়েছেন। তারাও আদর্শিক দিক দিয়ে আওয়ামী লীগেরই সমমনা।

এসব দাবির মারাত্মক পরিণতির কথা তারা ভাবেননি

এসব দাবির মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করার মতো বিরাট ক্ষমতা সামরিক শাসকের হাতে তুলে দেওয়ার কী মারাত্মক পরিণতি হতে পারে, সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ কেন বিবেচনা করতে ব্যর্থ হলেন তা আমার বোধগম্য নয়। শাসনতন্ত্র কোন দলের বা ব্যক্তির মনগড়া দলীল নয়। গণতন্ত্রে শাসনতন্ত্রের বৈধতার ভিত্তি হলো জনসমর্থন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রণীত শাসনতন্ত্রই বৈধ।

১৯৭২ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। শাসনতন্ত্র সংশোধনের নিয়মপদ্ধতিও শাসনতন্ত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। ঐ পদ্ধতির বাইরে কোন সংশোধনীই বৈধ হতে পারে না। জেনারেল এরশাদের নিকট উপরিউক্ত দাবি করে প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধনের এখতিয়ার সামরিক শাসকের হাতেই তুলে দিলেন। এ ক্ষমতা পেলে তিনি নিজের মর্জিমতোই যেকোন সংশোধনের সুযোগ পেয়ে যাবেন। এ বিষয়টি কোন নেতা-নেত্রীই বিবেচনা করতে সক্ষম হলেন না।

জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐসব দাবিতে অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে চিন্তা করতে ব্যর্থ হতে দেখে হতাশা বোধ করে। ঐসব দাবির মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক একনায়কের হাতে শাসনতন্ত্রের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিবর্তন আনার অধিকার তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কেমন করে করতে পারলেন তা ভেবে জামায়াত পেরেশান হয়ে গেল।

জামায়াতে ইসলামী পরিস্থিতির গভীরতা অনুভব করে ১ এপ্রিলের আগেই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জামায়াতের বক্তব্য জনগণের নিকট বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে পেশ করার ব্যবস্থা করে। ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হচ্ছে। তাই ২৮ মার্চ সারাদেশে জেলা ও মহকুমা শহরে হ্যান্ডবিল আকারে জামায়াতের বক্তব্য ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। রাজধানীতে লাখ লাখ হ্যান্ডবিল বিলি হয়। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ঐ বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তখন ইত্তেফাকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবে গণ্য হতো। কোন হ্যান্ডবিল দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বক্তব্যটির গুরুত্বের কারণেই পত্রিকায় স্থান পেয়ে থাকবে।

হ্যান্ডবিলের বক্তব্য

"শাসনতন্ত্রে হাত দিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হবে যে, শেষ পর্যন্ত দেশ কোন্ সংকটে পতিত হয় তা বলা যায় না। কারণ শাসনতন্ত্র এমন এক পবিত্র দলীল, যার উপর জনগণের আস্থা না থাকলে দেশে কোনক্রমেই স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। যে

শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সে শাসনতন্ত্রই স্বাভাবিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়। জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া শাসনতন্ত্র কখনো ঐ মর্যাদা পায় না।

দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত। এ পর্যন্ত যে ক'বার একে সংশোধন করা হয়েছে তার কোনটাই শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত (Unconstitutional) পদ্ধতিতে করা হয়নি। এসব সংশোধনীর পক্ষে ও বিপক্ষে যত মতই থাকুক এসব সংশোধনী আইনসম্মত বলে স্বীকার করতে সবাই বাধ্য। কারণ এসব সংশোধনী হয় জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে, আর না হয় গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তাই বর্তমান শাসনতন্ত্রের যেকোন রকম সংশোধনী আনতে হলে জাতীয় সংসদের প্রয়োজন।

যারা শাসনতন্ত্রে যে সংশোধনীই আনতে চান তাদের জন্য একমাত্র সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমই হলো জাতীয় সংসদ। সংলাপের মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা ব্যাপক। কেউ চান সংশোধন-পূর্বকালীন শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৪র্থ সংশোধনীর পূর্বের শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৫ম সংশোধনীর পরবর্তী, আর কেউ ৬ষ্ঠ সংশোধনীসহ চান। এর মীমাংসা কে করবে এবং কীভাবে হবে?"

হ্যান্ডবিলের সুদূরপ্রসারী অবদান

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ ছোট হ্যান্ডবিলটির অবদান সুদূরপ্রসারী ও ঐতিহাসিক। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন রকমের দাবির কারণে জেনারেল এরশাদ যদি সংলাপের মাধ্যমে মীমাংসার সুযোগ পেতেন তাহলে তিনিও তাঁর দাবি অবশ্যই পেশ করতেন। ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই তিনি দাবি করে আসছিলেন যে, সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দিতে হবে। পরবর্তীতে আরও স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার সামরিক স্বৈরশাসক সুহার্তোই তার আদর্শ।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, ঐ হ্যান্ডবিল প্রচারের পর সকল রাজনৈতিক জোট ও দলের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাদের দাবি আর তারা তুলেননি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তারা উপলব্ধি করেন যে, শাসনতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ জেনারেল এরশাদকে কিছুতেই দেওয়া সমীচীন নয়।

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে জামায়াতের এ পদক্ষেপ যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু জামায়াতের এ কৃতিত্ব স্বীকার করার মতো উদার মন এ দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেই। আমি এ বিষয়টি রেকর্ডে রেখে যাচ্ছি। হয়তো এমন সময় আসতে পারে যখন এর স্বীকৃতি মিলবে।

জামায়াতে ইসলামী এ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের যে কী দশা হতো তা আল্লাহই জানেন। হয়তো জেনারেল সুহার্তোর মতো জেনারেল এরশাদও শাসনতন্ত্র তার মর্জিমতো সংশোধন করে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হতেন।

একটি বিশেষ ঘটনা

১৯৮৩ সালেই ইডেন হোটেলে ১৫ দলীয় জোটের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পর আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ (পরে আযাদ) ফোনে যোগাযোগ করে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। '৭৮ সালে আমার দেশে ফিরে আসার পর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গোপনে আমার সাথে দেখা করার কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

তিনি বললেন, "আপনাদের হ্যান্ডবিল আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। চতুর্থ সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত বহাল করার দাবি জোরে-সোরে করার পর আমরা থেমে যেতে বাধ্য হলাম। আপনাদের যুক্তি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। সম্মেলনের প্রস্তাব রচনার জন্য গঠিত সাবজেক্ট কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম আমি। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের দাবি অনুযায়ী প্রস্তাব রচনা করা গেল না। তাই দায়সারা গোছের একটা প্রস্তাব পাস করে দায়িত্ব পালন করতে হলো।

১৪ ফেব্রুয়ারি মাওলানা আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদরাসা শিক্ষকদের সম্মেলনে এরশাদের বক্তৃতার পর আমাদের সবার এ ধারণাই ছিল যে, আপনারাও এরশাদের সাথে আছেন। এরশাদের নেতৃত্বে সব রাজাকাররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মনে করেই ১৫ দলীয় জোট সৃষ্টি হয়েছে একে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। ১৫ ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া ১৫ দলীয় বিবৃতির বক্তব্য এরশাদ-রাজাকার আঁতাতের বিরুদ্ধেই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞপ্তি মারফতে যে বক্তব্য পাওয়া গেল, তাতে আমাদের ভুল ভেঙে গেছে। বোঝা গেল আপনারা এরশাদের সাথে নেই।"

আমি শাসনতন্ত্রে এরশাদকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, "আপনাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে আমরা ১৫ দলীয় পূর্বের দাবি আর উত্থাপন করছি না। ইডেন হোটেলের কর্মীসম্মেলনে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোন কথা না বলে অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে।"

আমি বললাম, সামরিক শাসন জারি করার পূর্বে এরশাদ সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ পর্যন্ত যত বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে শাসনতান্ত্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কায়েম করাই তার লক্ষ্য। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ তিনি অনুসরণ করতে চান। তাই শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করাই তার প্রয়োজন। এ সুযোগ কিছুতেই তাকে দেওয়া যাবে না। সামাদ সাহেবও এ বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে বিদায় নিলেন।

জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনাতেই জামায়াতে ইসলামী ঐ ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এটাই প্রথম মাইলফলক। এর দ্বারা শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এরশাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল।

২১২.

এরশাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে লাগল। যদিও শেখ হাসিনা ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে এরশাদের সামরিক শাসনকে সমর্থন করেছিলেন, তবুও এরশাদের রাজনৈতিক ভূমিকায় ক্ষিপ্ত হয়ে ১৫ দলীয় জোট গঠন করেন। বিএনপি সরকারের পতনের কারণেই হয়তো শেখ হাসিনা সামরিক শাসনে খুশি হয়েছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে যে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বহাল করার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে, ১৫ দলীয় জোটের সাথে পাল্লা দিয়ে ৭ দলীয় জোট ময়দানে তৎপর ছিল। ১৫ দলীয় জোট ১১ দফা দাবি ও ৭ দলীয় জোট ৫ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করে। এ আন্দোলন কোন উত্তাপই সৃষ্টি করতে পারবে না বলে জামায়াত উপলব্ধি করল।

সকল দলের একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার কোন পরিবেশ ছিল না। তাই জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। এ উদ্দেশ্যে উভয় জোটের সাথে যোগাযোগের জন্য ঢাকা মহানগর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন সর্বজনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা ও শেখ আনসার আলী এডভোকেট।

যোগাযোগ শুরু

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি প্রথমেই দুই নেত্রীর সাথে যোগাযোগ করে। এ প্রাথমিক যোগাযোগের বিবরণ লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব মুজাহিদের ভাষায় পেশ করছি :

"১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তার বাসায় জামায়াতের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জামায়াত নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লাসহ আমরা ৩ জন উপস্থিত ছিলাম। তখনো বেগম জিয়া সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি। তবে প্রবেশ করবেন বলে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। এ যোগাযোগে আমরা তাকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করলাম। রাজনৈতিক সংকটে আমাদের দৃষ্টিতে সমাধানও তার নিকট তুলে ধরলাম। বিএনপি'র তখন সংকট চলছিল। বিএনপি'র অনেকেই বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নেতা মেনে নিয়ে রাজনীতি করা সম্ভব নয় বলে মনে করছিলেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তারও আগ্রহী ছিলেন না। অথচ বিএনপি অভ্যন্তরে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যার নেতৃত্বে দল এগিয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব যে বেগম খালেদা জিয়ার হাতেই অর্পিত হচ্ছে এটা জেনে-বুঝেই আমরা যোগাযোগ করি। আলাপ-আলোচনায় তার বক্তব্যে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পায়। কারণ তার দৃষ্টিতে

তিনি সঠিক ভূমিকা পালন করেননি; বরং নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছেন।

প্রথম সাক্ষাতে আমরা বেগম জিয়াকে পবিত্র কুরআন শরীফ এবং কিছু ইসলামী সাহিত্য সৌজন্য হিসেবে দেই।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার ৩২ নং ধানমন্ডির বাসভবনে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা ৩ জনই যাই। অর্থসহ পবিত্র কুরআন ও কিছু ইসলামী সাহিত্য নিয়ে যাই। ২৮ মার্চের লিফলেট তো সাথে ছিলই। আমরা ৩ জন তার বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি উপস্থিত হন। আমাদের কারো সাথেই পূর্ব পরিচিতি ছিল না। ঢাকা মহানগরীর আমীর হিসেবে আমার পরিচিতি পাওয়ায় আমীর বলতে কী বুঝায় তা তিনি জানতে চান। ওমরাহ্ হিসেবে দলে কেউ আছেন কি-না তাও প্রশ্ন করেন। আলোচনার ধরন ও উপস্থাপনা খুব একটা সুন্দর মনে হয়নি। ফলে অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল এবং বিরক্ত হচ্ছিলাম। তাই কুরআন, ইসলামী সাহিত্য ও লিফলেট দিয়েই চলে আসব বলে মনস্থির করলাম। কিন্তু লিফলেট হাতে পেয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'ভেতরের রুমে আসুন। আপনাদের সাথে আমার কথা আছে।' ভেতরে একান্তে তার সাথে আমাদের দীর্ঘ এক ঘণ্টা আলাপ হলো। আলাপকালে বোঝা গেল জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তো বটেই, ইসলাম সম্পর্কেও যথেষ্ট ভুল ধারণা তিনি পোষণ করেন। সুযোগমতো ইসলাম সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কেও একটা ধারণা দিলাম। বিস্মিত হলাম এই জন্য যে, তিনি মাওলানা আবদুল মান্নানকে জামায়াতে ইসলামীর লোক বলে মনে করেন। আমাদের নিকট থেকে জেনে তিনি তার ভুল স্বীকার করলেন। আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হলো। আলাপে তিনি স্বীকার করলেন যে, এরশাদ সরকারের নিকট সংবিধান সংশোধনী দাবি করা ঠিক হচ্ছে না। কথা দিলেন সামনে ১৫ দলের পক্ষ থেকে এ দাবি আর করা হবে না। এভাবে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক ভুল থেকে ১৫ দলকে জামায়াত উদ্ধার করে। সেদিন উদ্যোগ নিয়ে এটা যদি করা না হতো তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি ভুল খাতে প্রবাহিত হতো এবং তার পরিণতিও ভয়াবহ হতো। (বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, পৃষ্ঠা : ২০ ও ২১)

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির তৎপরতা

লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আবদুল কাদের মোল্লার থেকে জানা গেল, লিয়াজোঁ কমিটি যখন বিএনপি'র নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করল তখন বেগম জিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমান মন্তব্য করলেন, জামায়াত যদি যোগাযোগের ব্যাপারে সিরিয়াস ও সিনসিয়ার হয় তাহলে আরও সিনিয়র দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ প্রয়োজন। বিএনপি'র সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন বলে জানা গেল।

জামায়াত তাঁদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক করে। এ বিষয়ে

নিজামী সাহেব থেকে জানা গেল, তিনি আহ্বায়ক হওয়ার পরও সর্বজনাব মুজাহিদ, কামারুজ্জামান ও মোল্লাই প্রধানত যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন।

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি ১৫ ও ৭ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেও যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাবে তারা সাড়া দেননি। ১ এপ্রিলের পর থেকে জোট ও দলসমূহ দলীয় সভা অনুষ্ঠান ও প্রস্তাবাবলি পাস করতে থাকে এবং এসবের খবর সরকারি অনুমতি পরিমাণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইতোমধ্যে বেগম জিয়া বিএনপি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন আবদুল হালীমের নেতৃত্বে বিএনপি'র একটি প্রতিনিধি দল জামায়াতের সাথে যোগাযোগ করে।

জনসভায় প্রথম কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি ঘোষণা

১৯৭৯ সালের নির্বাচন পর্যালোচনা করে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলাম। মনে হলো '৭৩-এর নির্বাচন রীতিমতো প্রহসন, কিন্তু '৭৯-এর নির্বাচন সে তুলনায় অনেক নিরপেক্ষ হলেও পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ নয়। তাই নির্বাচনে জনগণের সিদ্ধান্ত অবাধ ও নিশ্চিত করার উপায় চিন্তা করে ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে আমি 'কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা' পেশ করি। কর্মপরিষদের কয়েকটি বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর সম্ভবত নভেম্বর মাসে সর্বসম্মতভাবে কর্মপরিষদ এ ফর্মুলা গ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপর ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সর্বপ্রথম জাতির নিকট জামায়াতের পক্ষ থেকে 'কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা' দাবিটি উত্থাপন করেন। সংবাদপত্রে বিষয়টি প্রকাশিত হলেও কোনো মহলই এ দাবিটি সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করেনি।

১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর বায়তুল মুকাররামের দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতের জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব হিসেবে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট দুটো যুগপৎভাবে গণতন্ত্র বহালের আন্দোলনে তখন ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলসমূহ জামায়াতের এ প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য করেনি। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় কোনো আলোচনা হয়েছে বলেও মনে পড়ছে না। রাজনৈতিক মহলের নিকট প্রস্তাবটি নতুন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বড় কোনো দলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত না হলেও তা বিবেচনাযোগ্য হয়তো মনে করা হয় না। দুনিয়ার কোথাও এ পদ্ধতির সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না বলে এটাকে উদ্ভট মনে করেও হয়তো কেউ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

জনাব আব্বাস আলী খান উক্ত জনসভায় দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রদান করেন ঃ

১. এরশাদ সরকার অবৈধ। কারণ, সেনাপতি হিসেবে শাসনতন্ত্রের আনুগত্য করাই তার কর্তব্য ছিল। তিনি অন্যায়ভাবে শাসনতন্ত্র মুলতবি করে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করেছেন।

২. শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করার উদ্দেশ্যে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

আন্দোলনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি

জামায়াতে ইসলামীকে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক করায় অনীহা লক্ষ্য করা গেল। ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট যুগপৎভাবে কিছু কর্মসূচি দিতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর তারা সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি দেয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় জনগণ এতে সাড়া দেয়নি। সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙা ও অনুরূপ নাশকতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। সরকার এ সুযোগে সামরিক শাসন আবার দৃঢ় করে নেয়। রাজনৈতিক তৎপরতা আবার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দু'জোটের আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এ জটিল পরিস্থিতিতে জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি দু'জোটের দুই নেত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ করে তাদেরকে বিনীতভাবে পরামর্শ দেয় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সফল হতে পারে না। এতে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একমাত্র গণতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমেই জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। তা না হলে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ পেয়ে যাবে। জামায়াতের এ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তারা পছন্দ করলেন।

অতঃপর যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য দুই জোট ও জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির যৌথ বৈঠক চলতে থাকে। একই দিন পৃথক পৃথক রুটে মিছিল, পৃথক পৃথক সমাবেশ, একই দাবিতে পৃথক পৃথক বিবৃতি ইত্যাদি চলতে থাকে। লিয়াজোঁর যৌথ বৈঠকে জোটের পক্ষ থেকে হরতালের প্রস্তাব করা হলে জামায়াতের পক্ষ থেকে বিকল্প কর্মসূচির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। শেষ পর্যন্ত যদি হরতালের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঠেকানো সম্ভব না হতো, তাহলে হরতালের মেয়াদ যথাসাধ্য কম সময় রাখার চেষ্টা করা হতো। যেমন– পূর্ণ দিবসের বদলে অর্ধদিবস বা সারা দেশের বদলে শুধু রাজধানী ঢাকায়।

যুগপৎ আন্দোলন জোরদার হলো

১৯৮৪ সালের শুরুতে সামরিক সরকার উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। থানাগুলোকে উপজেলা ঘোষণা করে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকার-সমর্থক বাহিনী গঠনই উদ্দেশ্য বলে বোঝা গেল। এটা স্বৈর-সরকারের ভিত মজবুত করার কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেই ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। উপজেলা নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দালাল-গোষ্ঠী জোগাড় করতে সক্ষম হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদ অতি সহজেই তার মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করতে পারবেন।

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে। তারা জোরালো দাবি তোলে যে, সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন চাই। নির্বাচিত সংসদেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, উপজেলা পরিষদ গঠন করা হবে কি-না। প্রশাসনে কোনো পরিবর্তন সাধনের ইখতিয়ার সামরিক সরকারের নেই।

আমাদের ধারণা ছিল, জেনারেল এরশাদ নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদীদের নির্বাচিত করার চেষ্টা করলেও সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে সক্ষম হলে সংসদে সরকারি দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হবে না। পূর্বে উপজেলা নির্বাচন করতে পারলে সংসদ নির্বাচনে একচেটিয়া বিজয়ী হওয়ার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

এসব বিষয় বিবেচনা করে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াত বলিষ্ঠ যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। '৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতেই জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি তার সাথে সংলাপে বসার আহ্বান জানান। যুগপৎ আন্দোলনরত জোট ও দলের পক্ষ থেকে এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়, উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন করা হবে বলে ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কোনো দল সংলাপে যাবে না।

এরশাদ সরকার দুই জোট ও জামায়াতকে সংলাপে শরীক করতে ব্যর্থ হলেও নামসর্বস্ব প্রায় ৫০টি দল, যার মধ্যে মুসলিম লীগ নামেই কয়েকটি দল সংলাপে সাড়া দেয়। অপরদিকে যুগপৎ আন্দোলন আরও জোরদার হয়। জনগণ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সাড়া দেয়।

একটি নির্বাচিত সংসদকে অস্ত্রবলে বাতিল করে সেনাপতি নিতান্ত অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। দেশ শাসনের কোনো অধিকার জনগণ তাঁকে দেয়নি। তাই দেশ পরিচালনার উদ্দেশ্যে আর একটি নির্বাচিত সংসদই অপরিহার্য। এ যৌক্তিক দাবি স্বাভাবিক কারণেই জনসমর্থন লাভ করে।

ফলে রাজনৈতিক ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক দলের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপ প্রহসনে পরিণত হয়।

অর্থবহ রাজনৈতিক সংলাপের আয়োজন

১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াত মিলে ২৩ দলের যুগপৎ আন্দোলন এতটা জোরদার হয় যে, জেনারেল এরশাদ এপ্রিলের প্রথম দিকেই উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করার ঘোষণা দিয়ে দুই জোট ও জামায়াতকে তার সাথে সংলাপের জন্য ফরমালি দাওয়াত দেন। ১০ এপ্রিল থেকে সংলাপ শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১০ তারিখ সকাল ১০টায় জামায়াতকে এবং বিকেলে ৭ দলীয় জোটকে সময় দেওয়া হয়।

সংলাপ শুরু হতে তখনো সাত-আট দিন বাকি আছে। জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল যে, ১৫ ও ৭ দলীয় জোটকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মত করতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

"যুগপৎ আন্দোলন জনপ্রিয় হওয়ার কারণেই সামরিক সরকার আন্দোলনরত দলসমূহের সাথে সংলাপে বসা প্রয়োজন মনে করেছে। এটা এক বিরাট সুযোগ। সংলাপ সফল হলে আমাদের দাবি আদায় করা সম্ভব হবে। সংলাপ সফল করতে হলে ১৫ ও ৭ দল এবং জামায়াত মিলে ২৩ দলকে একসাথে যেতে হবে, যাতে আমাদের দাবি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার আদায় করা যায়। আলাদা আলাদাভাবে গেলে এটা সম্ভব হবে না। একজোট যা বলবে তা শুনে সরকার এ কথা বলে বিদায় দেবে যে, ঠিক আছে, আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, অন্যরা কী বলেন, তা শোনার পর আমাদের বক্তব্য পেশ করব। তাই আমরা যদি সংলাপ চলাকালেই কমিটমেন্ট আদায় করতে চাই তাহলে ২৩ দলকে একসাথেই যেতে হবে।"

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি উপরিউক্ত বিষয়ে উভয় জোটকে সম্মত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে দুই জোটের দুই নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। এক নেত্রী বললেন, "আমি ঐ বেটির সাথে যাব না।" অপরজন যেতে সম্মত হলেও উভয়ে একসাথে যেতে রাজি না হলে তো উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

জামায়াতের পক্ষ থেকে উভয় নেত্রীকে বলা হলো, আমরা সবাই একসাথে যেতে না পারলেও যদি সবাই একই দাবি পেশ করি তাহলে একসাথে যাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। তারা বললেন, কী কথা বলা হবে, এর খসড়া লিখিত আকারে দিন, আমরা বিবেচনা করে দেখি। জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি খসড়া তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে তারা বললেন, আপনারা তো একদল, তাই আপনাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ। আমরা তো অনেক দল, তাই জোটের বৈঠকে আলোচনা করা ছাড়া আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

সংলাপে ২৩ দলের একই রকম বক্তব্য প্রদান সম্ভব হলো না

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংলাপের উদ্দেশ্যে যে খসড়া দুই জোটকে দেওয়া হলো, সে বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। তারা কী বক্তব্য পেশ করবেন, সে কথাও আমাদের জানানোর প্রয়োজনবোধ করলেন না। জামায়াত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে হতাশাবোধ করল এবং সংলাপের সাফল্যের আশাও প্রায় ত্যাগ করল।

সংলাপ সফল হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন কি-না জানা গেল না; বরং তাদের ভূমিকায় জামায়াত বিস্মিত ও দুঃখিত হলো।

১৫ দল সংলাপে যোগদান করার এমন কতক পূর্বশর্ত আরোপ করল, যা সম্পূর্ণ তাদের দলীয় স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর কোনোটাই যুগপৎ আন্দোলনের দাবির সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন– এরশাদের সামরিক শাসন জারি করার ১৩ দিন পূর্বে ১১ মার্চ (১৯৮২) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৪ জনকে নিহত করা হয়। সামরিক আদালতের বিচারে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাদের শাস্তি মওকুফ করা ১৫ দলের অন্যতম শর্ত ছিল। তাদের শর্ত পূরণের জন্য এ রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দণ্ডপ্রাপ্ত

অপরাধীদের সাজা মওকুফ করে এরশাদ চরম মহানুভবতার (!) পরিচয় দিলেন। প্রমাণিত হলো যে, ১৫ দল ও এরশাদ জালিম ঘাতকদেরই বন্ধু।

৭ দলীয় জোট প্রথমে শর্ত দিল, এরশাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে তারা সংলাপে বসবে না। কারণ, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত ৭ দলীয় জোটের অন্যতম শরীক ছিলেন উক্ত প্রধানমন্ত্রী। ৭ দলীয় জোটের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বৈরশাসকের সহযোগী হওয়ায় তার সাথে আলোচনায় বসা যাবে না।

এভাবে উভয় জোট বেশ ক'টি দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করে সংলাপে শরীক হয়। দেশ ও জনগণের স্বার্থে বা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে কোন শর্ত তারা আরোপ করলে আন্দোলনে তাদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হতো। এরশাদের ঐ দুর্বল মুহূর্তে রাজনৈতিক স্বার্থ-শিকারি তাদের দলীয় স্বার্থ আদায় করে নিল। প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশে যে রাজনীতি চালু আছে তা দেশ ও জনগণের স্বার্থে কতুটুকু নিবেদিত?

যা হোক, ১০ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সংলাপ চলে। জেনারেল এরশাদের সাথে জামায়াতের ১০ ও ১৭ তারিখ দু'বার বৈঠক হয়। দুই জোটের সাথে কয়েকবার বৈঠক হয়। এছাড়া সব দলের সাথে মন্ত্রী পর্যায়েও বৈঠক হয়।

২১৩.

এরশাদ সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ

১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল সকাল ১০টায় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর সাত সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে সরকারের সাথে সংলাপের উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হয়। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য হলেন জনাব শামসুর রাহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।

সরকারপক্ষে জেনারেল এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও অন্য মন্ত্রীগণ। এরশাদ সাহেব কথা শুরু করলেন, "আব্বাস সাহেব! আমি ইসলামের জন্য এত কিছু করলাম, এত কিছু করছি, অথচ আপনারা আমার সাথে থাকলেন না। আপনারা পনের দলের সাথে আন্দোলন করছেন।"

খান সাহেব জোরালো ভাষায় বললেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে, আল্লাহর রাসূল (স) তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। যে ব্যক্তি ও দলের ভেতর ইসলাম নেই, তাদের দ্বারা ইসলাম কায়েম হতে পারে না।

সূচনায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ জাতীয় কিছু কথা হয়ে গেল। আসল আলোচ্য বিষয় তো হলো যুগপৎ আন্দোলনে বড় দুই জোট ও জামায়াতের দাবি। আন্দোলনের মূল দাবি

হলো সামরিক আইন প্রত্যাহার, শাসনতন্ত্র বহাল করার উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এ দাবি সম্পর্কে আন্দোলনরত জোট ও দলসমূহ কোনো সর্বসম্মত ফর্মুলা পেশ করতে সক্ষম হয়নি। ঐ দাবিকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে যেভাবে পেশ করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, এরই রূপরেখা ঐ দাবিনামায় রয়েছে। তাই এরশাদ সরকারের নিকট জনাব খান সাহেব যে দাবিনামা পেশ করেন তা হুবহু তুলে ধরছি :

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সামরিক সরকারের সাথে সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য

তারিখ : ১০/ ০৪/ ১৯৮৪ ইং

জামায়াতে ইসলামী সামরিক আইন প্রত্যাহার ও মুলতবি শাসনতন্ত্র বহাল করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য সরকার ও জনগণের নিকট পেশ করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সকল রাজনৈতিক দলের প্রধান দাবি হলো, অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

সরকার উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করে রাজনৈতিক সংলাপের দাওয়াত দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র বহাল করার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা প্রকাশ পেলেও সংলাপের পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি। গত ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বক্তৃতায় সরকারের পক্ষ থেকে দুটো বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ পাওয়ায় সংলাপের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মনে করেই জামায়াতে ইসলামী সংলাপে অংশগ্রহণ করছে।

প্রধানমন্ত্রী জাতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সশস্ত্র বাহিনী আর রাজনীতিতে জড়িত থাকতে আগ্রহী নয় এবং তারা ব্যারাকে ফিরে যেতে চায়। আর রাজনৈতিক দলসমূহের দাবি অনুযায়ী সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনেও কোনো বাধা নেই। এ ঘোষণা সামরিক সরকারের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে বলে জামায়াতে ইসলামীর ধারণা।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর আসল লক্ষ্য

সংলাপের শুরুতেই আমরা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সরকারকে জানাতে চাই যে, দেশ রক্ষার ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন রয়েছে। কিন্তু দেশ শাসনে এ বাহিনীকে ব্যবহার করা দেশ, জাতি ও দেশরক্ষা বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাসই জামায়াতে ইসলামীকে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করতে বাধ্য করেছে।

সরকার ও জনগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী শুধু জাতীয় ইস্যুকেই গুরুত্ব দিয়েছে জামায়াতের দলীয় কোনো ইস্যু বা স্বার্থকে কখনও সংলাপের পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করেনি।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের আসল লক্ষ্য ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং দেশের শাসনতন্ত্র বহাল করে গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কায়েমের ব্যবস্থা করা।

জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ

রাজনৈতিক সংলাপের এ মুহূর্তে আমরা সরকারের নিকট ঐ মহান আদর্শের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, যে আদর্শের ভিত্তিতে জামায়াত এ দেশকে গড়ে তুলতে চায়। এ আদর্শ জামায়াতে ইসলামী রচিত নয়। এমনকি রাসূল (স)ও এর রচয়িতা নন। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, তাদের ইহকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মঙ্গল ও মুক্তির জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যে আদর্শ কুরআন মাজীদে পেশ করেছেন এবং তাঁর সর্বশেষ রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) বাস্তবে যে আদর্শ দুনিয়ায় কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন, হুবহু সে আদর্শই জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ।

মানবজাতির নিকট ঐ আদর্শের মূল দাবি তিনটি

১. জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলা।

২. কথায়, কাজে ও চিন্তায় এর বিপরীত যা কিছু আছে তা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করা।

৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য করতে হলে ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকদের নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েম করা।

আল্লাহর দেওয়া এ মহান আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যেই জামায়াতে ইসলামী কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার জাতির নিজস্ব ভাষায় প্রচার করছে। ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হচ্ছে। এমনকি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চরিত্রের পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও তাদের মাঝে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি যে, জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাত, খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের নীতি, এ দেশে চালু করতে চায়। এসব দিক থেকে আমাদের কোন ভুলত্রুটি থাকলে কুরআন-হাদীসের যুক্তি দিয়ে যারা সে ভুল ধরিয়ে দেন আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকি। কিন্তু যারা অন্য কোন কারণে জামায়াতের বিরোধিতা করেন তাদের প্রতিও আমরা বিদ্বেষ পোষণ করি না। আমাদের কাজ হলো, সবার নিকট ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা। যারা তা গ্রহণ করেন, তারা নিজেদেরই কল্যাণ করেন। আর যারা বিরোধিতা করেন, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেন।

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে হলে তার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি অপরিহার্য। ইসলামই সত্যিকার গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী গণতন্ত্রের মূলকথা আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব, শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-

এর নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব। ইসলামের পরিভাষায় এরই নাম খিলাফত। দেশ ও সমাজ পরিচালিত হবে আল্লাহর আইনে এবং জনগণ অথবা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করবে। তাই মানুষের শাসক কোন একজন মানুষ বা গোষ্ঠী নয়; বরং মানুষের শাসক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর আইন জারি করবে মাত্র। এ গোটা ব্যবস্থাকেই ইসলামী খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ ধরনের এক সর্বজনীন খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে চলেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকবচ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। এ মুসলিম পরিচিতিই এ দেশটির পৃথক সত্তার ভিত্তি। এ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ জনগোষ্ঠীর আকীদা-বিশ্বাস-ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিতে মুসলিম চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। এ দেশটি প্রায় চারদিক থেকে একটি মাত্র বৃহৎ দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ মুসলিমচেতনা এ দেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

সশস্ত্র বাহিনী পেশাগতভাবে যতই দক্ষ ও শক্তিশালী হোক, তারা যদি ঐ চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয় তাহলে সত্যিকার জিহাদি প্রেরণা সৃষ্টি হবে না। দুর্বার ইসলামী চেতনা ও জিহাদি জযবাই যে সর্বকালে মুসলিম জাতিকে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছে, ইতিহাসই এর সাক্ষী।

তাই ইসলামই এ দেশের স্বাধীনতার সত্যিকার রক্ষাকবচ। এ দেশবাসীকে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ করা হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। আর এ রক্ষাকবচকে অবহেলা করা হলে দেশ রক্ষার যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যেতে পারে।

পলিটিক্যাল সিস্টেম

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সর্বজনীন সুবিচারপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সম্ভব। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সুষ্ঠু, স্থিতিশীল, ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর করার জন্য একটা সুষম পলিটিক্যাল সিস্টেমের একান্ত প্রয়োজন; যার অভাবে কোন স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ যাবৎ দেশে কোনো সুষ্ঠু ও সুষম পলিটিক্যাল সিস্টেম গড়ে ওঠেনি বলে এ দুর্ভাগা জাতির দু-দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ইতঃপূর্বে কতিপয় রাষ্ট্রপ্রধান তাঁদের আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি করে পলিটিক্যাল সিস্টেম গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁদের জীবনাবসানের সাথে সাথেই সে সিস্টেমেরও অপমৃত্যু ঘটেছে। সে জন্য একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে এবং জাতির রক্তক্ষয় চিরতরে বন্ধ করতে হলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমের প্রয়োজন।

আমরা বিগত আশি সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি পলিটিক্যাল সিস্টেম জাতির সামনে পেশ করেছিলাম। অবগতির জন্য তার অনুলিপি বক্তব্যের সাথে সংযোজিত করা হলো।

বর্তমান রাজনৈতিক সংকট

সব দেশেই মাঝে মাঝে ছোট-বড় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। কিন্তু এ দেশের বর্তমান সংকট অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণ শাসনতন্ত্র মুলতবি করে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল করে ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করে দেশের শাসন-ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে নেওয়ার কারণেই এ সংকটের উদ্ভব হয়েছে। তারা দেশ গঠনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পেশ করে সরকারি ক্ষমতা ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করার ফলে এ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। আর সামরিক সরকার এ দাবি উপেক্ষা করে সর্বাগ্রে উপজেলা নির্বাচন এবং একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে চান। এরই ফলে সংকট চরমে পৌঁছেছে।

অবশেষে সামরিক সরকার সদিচ্ছার পরিচয় দিয়ে উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিয়োজিত রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহকে সংলাপের দাওয়াত দেওয়ার পর সংকটের তীব্রতা হ্রাস পায়। সরকার সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে সংলাপ অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে।

সংলাপের সফলতা

সামরিক সরকারের সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের সংলাপের সফলতার ওপরই সংকট নিরসন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সরকার যদি সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি মেনে নিয়ে একটি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে, তাহলে সংলাপ সফল হয়েছে বলে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।

সংকট নিরসনের উপায়

সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি মানা সত্ত্বেও সরকার যদি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকার গঠনের ব্যবস্থা না করে তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় না। এমন একটি সরকার থেকেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় যে, সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিগণ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নেতা থাকবেন না এবং সরকারি পদে থাকাকালে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।

আমরা নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে অরাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবি করছি, এর জন্য দুটো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে– সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির

হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। অথবা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজেও অরাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্ব দিতে পারেন। এ অবস্থায় তার সরকারকে অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ মর্যাদায় উন্নীত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে–

১. তিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা দিতে হবে।
২. তাঁর মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
৩. তিনি ও তার মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের পরিবারকে সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা আহত ও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি সম্প্রসারণ করে পরিবেশকে আরও সুস্থ করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। আর এ আন্দোলনে জড়িত হওয়ার দরুন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা যাদের বিরুদ্ধে কোনো কেস দায়ের করা হয়েছে তাদের সবাইকে অবিলম্বে মুক্ত করা প্রয়োজন।

সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্তদের আপিলের সুযোগ

সামরিক আইনে যত লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের সবাইকে বেসামরিক আদালতে আপিল করার জন্য সুযোগ দিলে এ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের উপসম হবে বলে আমরা আশা করি।

সামরিক আইন ও মৌলিক অধিকার

নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আইনগত অসুবিধার দরুন যদি সামরিক আইন তুলে নেওয়া সম্ভব না-ই হয়, তাহলে নামমাত্র সামরিক আইন বহাল রেখে রিট পিটিশনের অধিকারসহ শাসনতন্ত্রে বর্ণিত সকল মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছাড়া আর সব সামিরক আইন প্রশাসকের পদ তুলে দিতে হবে এবং সশস্ত্র সামরিক আদালত বন্ধ করতে হবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

গত ৭ মার্চ (১৯৮৪) শাসনতন্ত্রের যেসব ধারা সংশোধন করা হয়েছে তা বাতিল করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যদি কোনো শাসনতান্ত্রিক জটিলতা দেখা দেয় তাহলে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

নির্বাচনের সময়

জাতীয় সংসদের নির্বাচন কখন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে এখনও কোনো পরামর্শ দেওয়ার সময় আসেনি। সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন হবে কি-না এবং নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি-না তা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত

নির্বাচনের সময় নিয়ে কথা বলা অর্থহীন। আমরা এখনও জানি না যে, সংকট কেটে যাচ্ছে কি-না এবং নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আবার জোরদার করতে হবে কি-না। বর্তমান সংকট নিরসনের পরই নির্বাচনের সময় নির্ধারনের কথা উঠবে।

সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে

একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী জাতির আশা-ভরসার স্থল ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকে। আমরা আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনীকে সুনিপুণ পেশাগত যোগ্যতার অধিকারী দেখতে চাই, যা জাতির জন্য পরম ও চরম গর্বের বস্তুতে পরিণত হতে পারে। জাতির শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য তাঁদেরকে থাকতে হবে সকল দল-মতের উর্ধ্বে। রাজনীতির স্পর্শ থেকে বহু দূরে। তাঁরা হবেন দেশ রক্ষার মহান কাজে নিবেদিতপ্রাণ এবং গোটা জাতি তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব ছিল তাঁদেরকে রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে একটা সুনিপুণ সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা। তাহলে তিনি জাতির জন্য এক অমর অবদান রেখে যেতে পারতেন। সেনাবাহিনীর সকল কর্মতৎপরতাকে দেশ রক্ষার মহান কাজে সীমিত রাখাকে ঔপনিবেশিকতা বলা ঠিক নয়; বরং এটাই প্রকৃত কাজ। পেশাগত দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজনীতি ও দেশ শাসনের কাজে জড়িত করলে সেনাবাহিনীর মূল কাঠামোই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, যা ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোরই মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারে। ইংল্যান্ড, আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এ ধরনের চিন্তাধারা কারো মনের কোনো স্থান লাভই করতে পারে না।

অতএব সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, দেশ ও জাতির স্বার্থের জন্য অচিরেই অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রিয় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দেশ পরিচালনার সকল দায়-দায়িত্ব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের হাতে তুলে দিয়ে জাতীয় স্বার্থে এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করুন।

শেষ কথা

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আমরা আমাদের দলীয় স্বার্থের বহু উর্ধ্বে থেকে এবং নিছক জাতীয় স্বার্থেই এ বক্তব্য পেশ করলাম। জামায়াতে ইসলামী কোনো দিনই সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়; বরং সমাজে সন্ত্রাস, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমনের সকল প্রকার প্রচেষ্টা সর্বদাই চালিয়ে এসেছে এবং চালিয়ে যাবে। আমাদের এ বক্তব্যের পেছনে কারো সাথে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারার অংশীদার হওয়ার সামান্যতম প্রবণতাও নেই।

সামরিক সরকারের প্রধান দায়িত্বশীলগণের ওপর গণতন্ত্র বহাল করার যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করলে জাতির বিরাট খেদমত হবে। তারা নিশ্চয় বিশ্বাস

করেন যে, তাদের ভেতর এবং বাইরের সবকিছুই আল্লাহ্ তাআলা ভালো করে জানেন এবং প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপের জন্য আদালতে-আখেরাতে তাঁর সামনে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা আমাদের দায়িত্বের অনুভূতি ও পরকালে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতির চাপে কথাগুলো সরকারের সামনে বিবেচনার জন্য রাখলাম। আশা করি, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ্ তাআলা সরকারকে, আমাদেরকে ও গোটা জাতিকে সুপথে পরিচালিত করুন। আমীন!

খোদা হাফেজ
১০.০৪.১৯৮৪

আব্বাস আলী খান
ভারপ্রাপ্ত আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

জনাব খান সাহেব সরকারপক্ষকে জামায়াতের বক্তব্য সবটুকু পড়ে শোনান। শোনানোর পর তারা দুই জোটের সাথে আলাপের পর এর জওয়াব দেবেন বলে জানান। এ রকম বলাই স্বাভাবিক। সবাই একসাথে একই রকম বক্তব্য পেশ করলে তারা নগদ জওয়াব দিতে বাধ্য হতেন।

মন্ত্রী পর্যায়ে জামায়াতের সাথে পরবর্তী বৈঠক হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। মন্ত্রীদের মধ্যে এয়ার ভাইস মার্শাল এ.জি. মাহমুদ, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আমিনুল ইসলাম ও জনাব মাহবুবুর রহমান থাকবেন বলে জানানো হলো। জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জনাব মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বৈঠকে বসবেন বলে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

জামায়াতের প্রতিনিধিগণ বিদায় নেওয়ার জন্য যখন দাঁড়ালেন তখন মাওলানা ইউসুফ প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহালের দাবি করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এখন তো আপনি ক্ষমতায় আছেন। বিষয়টি দেখবেন বলে আশা করি।"

সংলাপ চলাকালে মাওলানা ইউসুফ এ কথাটি বলেননি। সংলাপ শেষ হওয়ার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মাত্র। সরকারের পক্ষ থেকে রেডিও, টিভিসহ সকল প্রচার মাধ্যমকে জানানো হলো, জামায়াতে ইসলামী সংলাপে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দাবি করে গেছে। অথচ সংলাপে জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলার যে দাবি পেশ করেছে তার কোন উল্লেখই করা হয়নি। এটা রীতিমতো বেঈমানি। সংলাপ সফল করার নিয়ত থাকলে তারা এ জাতীয় জঘন্য অসততার আশ্রয় নিতে পারতেন না।

জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতের প্রতিনিধি দল

সংলাপ থেকে বিদায় হওয়ার পর জামায়াত নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবন থেকে সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে উপস্থিত হন। তারা সাংবাদিকগণের নিকট জামায়াতের পক্ষ থেকে সংলাপের সময় সরকারের নিকট যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, এর কপি বিলি করে দেন, যাতে জনগণ জানতে পারে যে, সংলাপে জামায়াতের বক্তব্য কী ছিল।

১১ এপ্রিল জামায়াতের সাথে মন্ত্রীদের বৈঠক

এরশাদের সাথে সংলাপের পরদিন তিনজন মন্ত্রীর সাথে জামায়াতের তিন নেতার সাক্ষাতের বিবরণ জনাব মুজাহিদের ভাষায় নিম্নরূপ :

"আমাদের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক হয় মন্ত্রী পর্যায়ের। সেখানে আমরা মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আমাদের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিষয়টিকে এমনভাবে প্রচার করলেন কেন? তারা এর কোনো সদুত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। তখন আমরা বললাম, এটা যেহেতু প্রচার করেই ফেলেছেন তাই এ ব্যাপারে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সাথে সংলাপ চলতে পারে না। মন্ত্রীগণ এ ব্যাপারে তাদের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে বললেন, 'রাষ্ট্রপতির সাথেই আপনাদের বৈঠক হওয়া উচিত।' এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে আমরা সরকারের আপত্তিকর ভূমিকার কথা তুলে ধরলাম। আমরা বললাম, 'অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না। এ অবস্থা আপনারাই সৃষ্টি করেছেন, আমরা নই।' সরকার বেকায়দায় পড়ল। এরশাদ সাহেব বললেন, বিষয়টি আমরা পরে বিবেচনা করব। এরপর আলোচনা শুরু হলো। আমরা পুনরায় কেয়ারটেকার সরকারের মাধ্যমে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনই একমাত্র সমাধান বলে জোরালো ভাষায় জানিয়ে দিলাম। সাথে সাথে সরকারের মতামতও জানতে চাইলাম। সরকার যা বলল, তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জনগণের এ দাবি মেনে নিতে সরকার প্রস্তুত নয়।" (বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, পৃষ্ঠা : ২৭)

জনাব আব্বাস আলী খান থেকে আমি শুনেছি, ১৭ এপ্রিল জেনারেল এরশাদের সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে এরশাদ খান সাহেবকে একটু রাগতস্বরে বললেন, "কোথায় পেলেন কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির কথা? শুধু আপনারই এটা বলছেন। আর কোনো দল তো এ কথা বলেনি।"

সংলাপে সবাই একসাথে না যাওয়ার পরিণাম

১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোট পৃথক পৃথকভাবে এরশাদের সাথে এবং মন্ত্রী পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। এরশাদ তাদের সাথে বিতর্ক খেলার মহাসুযোগ পেয়ে গেলেন। যাদের সাথে যেভাবে কথা বললে দুই জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়, সেভাবে নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন। জামায়াতের সাথে শুরুতেই তিনি বললেন, 'আপনারা ১৫ দলের সাথে কেমন করে মিলে গেলেন?' ১৫ দলের সাথে শুরুতে বললেন, 'আপনারা স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতের সাথে মিলে কেমন করে চলছেন?' এর দ্বারা বোঝা গেল, তিনি যুগপৎ আন্দোলনে শরীকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগটা কাজে লাগালেন। যদি সবাই এক সাথে সংলাপে বসতেন তাহলে তিনি এ সুযোগ কিছুতেই পেতেন না।

সংলাপ চলাকালেই আমরা ক্ষুব্ধ ছিলাম যে, দুই জোট কেন একসাথে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। একসাথে না গেলেও লিয়াজোঁ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য ছিল, যাতে সংলাপের মাধ্যমে আন্দোলনের টার্গেট অর্জন করা

যায়। এ বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তারা গুরুত্ব দিলেন না।

আন্দোলন সাফল্যের একটা পর্যায়ে পৌছার ফলেই তো এরশাদ বাধ্য হয়ে উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করে সংলাপে বসতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছেও দুই জোটের নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টি ও আন্তরিকতার অভাবে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা গেল না। এরশাদ তাদের সাথে সংলাপের খেলায় বিজয়ী হয়ে গেলেন। ১৯৯০ সালে সকল জোট ও দল কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সাফল্য '৮৪ সালেই অর্জন করা যেত। আরও ছয়টি বছর স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত হতো না।

এরশাদের দাপট

১০ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সংলাপ চলার পর ২৯ তারিখ রাতেই এরশাদ রেডিও ও টিভিতে চরম দাপট দেখিয়ে বক্তব্য রাখলেন। দুই জোটই এ জন্য দায়ী। এরশাদ জাতির সামনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হেয়প্রতিপন্ন করার সুযোগ নিলেন। বললেন, "তারা একসাথে আন্দোলন করলেন, অথচ একই রকম দাবি জানাতে ব্যর্থ হলেন। বিভিন্ন জোট ও দল বিভিন্ন ধরনের দাবি জানালেন। আমি কার দাবি গ্রহণ করব?"

ধুরন্ধর এরশাদ কয়েক সপ্তাহকাল সংলাপ চলাকালে সহজেই টের পেয়েছেন, যুগপৎ আন্দোলন করলেও ২৩ দলের মধ্যে সত্যিকার রাজনৈতিক ঐকমত্য নেই। সংলাপে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি আন্দোলনকে এ সময় দমন করা সম্ভব মনে করলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন, উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করা হবে না। বক্তব্যে ধমকের সুরে বললেন, উপজেলা নির্বাচনে বাধা দিলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন, আগামী সকাল (৩০ এপ্রিল) থেকে সামরিক আইন আরও মযবুত হবে। এর ফলে আন্দোলন মাঠে মারা গেল। সামরিক শাসন আরও মযবুত হয়ে গেল। উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করার দাবি নস্যাৎ করা হলো। এরশাদ সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিকে দাপটের সাথে অগ্রাহ্য করার সাহস পেলেন।

চাঙ্গা হওয়া আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে নতুন করে আবার চালু করা বড়ই কঠিন। রাজনৈতিক হতাশার কারণে কর্মীদের নতুন করে আন্দোলনমুখী করা সহজসাধ্য নয়।

নতুন করে যুগপৎ আন্দোলন

সংলাপের ব্যর্থতার গ্লানি বইতে মাস তিনেক গেল। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি আবার যোগাযোগ করে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৪ সালে আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের ডাকে ২৭ আগস্ট ঢাকায় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সারা দেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হয়। ১৪ অক্টোবর দুই জোট ও জামায়াতের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ডিসেম্বর সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালন করা হয়। ২১ ও ২২ ডিসেম্বর সারা দেশে একটানা দুই দিনের হরতাল পালন করা হয়। রাজশাহীতে পুলিশের গুলিতে দু'জন ছাত্র নিহত হয়। এ সত্ত্বেও '৮৪ সালের আন্দোলন সরকারের ওপর সামান্য চাপও সৃষ্টি করতে পারেনি।

২১৪.

গত ফেব্রুয়ারি মাসে (২০০৫) আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের আরলিংটন শহর থেকে জনৈক হাফিয আবুল হাসান আমাকে সম্বোধন করে লিখলেন, "আপনার লেখা আত্মজীবনী গ্রন্থ 'জীবনে যা দেখলাম' পড়লাম। ১৯৬৯ সালের অনেক ঘটনার কথাই লিখেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ঐ বছরে সংঘটিত শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের ঘটনাটি বইটিতে খুঁজে পেলাম না।"

তাঁর চিঠি পড়ে আমি সত্যি লজ্জিত হলাম। এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার লেখায় উহ্য থাকায় আমিও বিস্মিত হলাম। পত্র লেখককে লিখলাম, "আপনাকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। এমন একটি বিষয়ে আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিস্মিত যে, দেশে কেউ এমনকি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোনো নেতা-কর্মীও বিষয়টা লক্ষ্য করেনি। যাহোক, আপনি সুদূর আমেরিকা থেকে বিষয়টি উল্লেখ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। আশা করি আমি শিগগিরই এ বিষয়ে লিখে অতীত ভ্রান্তির অবসান ঘটাব।" এ ওয়াদা পূরণের উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আলোচনা করছি।

'প্রেরণার বাতিঘর' শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা

'প্রেরণার বাতিঘর' শিরোনামে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে শহীদ আবদুল মালেক স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। স্মরণিকাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শুরুতে ইসলামী আন্দোলনের কয়েকজন দায়িত্বশীলের পাঁচটি বিশেষ প্রবন্ধ রয়েছে। এরপর বেশ ক'জন চিন্তাবিদের পাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। 'শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া' শিরোনামে সেকালের পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা থেকে বহু সম্পাদকীয় স্মরণিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে। শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে অনেক মূল্যবান উদ্ধৃতি এ সংকলনে রয়েছে।

'স্মৃতিচারণ' শিরোনামে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবদুল মালেকের কয়েকজন সাথীর স্মৃতিচারণের মধ্যে বর্তমান আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও আছেন। শহীদের সাতজন সহকর্মীর সাক্ষাৎকার রয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৬ জন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতির লিখিত অনুভূতি সংকলনটিতে শামিল করা হয়েছে।

তাছাড়া শহীদের নামে নিবেদিত কবিতা, গান, গল্প, শহীদের অনেক উত্তরসূরির আবেগমিশ্রিত বক্তব্যে সমৃদ্ধ পৌনে ৩০০ পৃষ্ঠার এ স্মরণিকা থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

শাহাদাতের ঘটনা

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান পদত্যাগ করেন এবং পরদিন সেনাপ্রধান আগা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন। ইয়াহইয়া খান এবার মার্শাল নূর খানকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। নূর খান কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের সুপারিশ ছিল না।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত সেক্যুলার পদ্ধতি বহাল রেখেই তাতে কিছু ইসলামী শিক্ষা সংযোজন করার সুপারিশ ছিল। তাই সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছাত্র সংগঠনসমূহ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। অপরদিকে ইসলামী ছাত্রসংঘ শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের দাবিতে আন্দোলন করছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (NIPA)-এর উদ্যোগে শিক্ষাব্যবস্থার উপর এক বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সেক্যুলার শিক্ষার পক্ষে যারা বক্তৃতা করে তাদের যুক্তি খণ্ডন করে ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি আবদুল মালেক এমন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, যার ফলে উপস্থিত ছাত্ররা বিপুলসংখ্যায় ইসলামী শিক্ষার পক্ষে রায় দেয়। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এতে ভয়ঙ্করভাবে খেপে যায়।

'নিপা'য় অনুষ্ঠিত বিতর্কে শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা ডাকসু'র উদ্যোগে টিএসসিতে (ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে) ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরেকটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ইসলামবিরোধীরা মঞ্চ দখল করে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভাষায় বক্তব্য দিতে থাকে। আবদুল মালেকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র আলোচনায় অংশগ্রহণের দাবি জানায় এবং ইসলামবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। এতে বিরোধীরা সংঘর্ষ বাধায়। ইসলামপন্থি ছাত্রদের ধৈর্যের ফলে সংঘর্ষ থেমে যায়।

আবদুল মালেক ও তার সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী টিএসসি থেকে ফিরে আসার সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পার হচ্ছিলেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের আট-দশ জন সন্ত্রাসী কাপুরুষের মতো তাদের উপর হামলা করে। তারা আবদুল মালেকের মাথার নিচে ইট রেখে আরেকটি ইট দিয়ে মাথা থেতলিয়ে দেয়, লোহার রড মগজে ঢুকিয়ে দেয়। তারা তার মৃত্যু নিশ্চিত ধারণা করেই ফেলে রেখে চলে যায়। ইদ্রিস আলীও মারাত্মক আহত হন।

হামলাকারীদের ফটো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাদের হাতে কাঠের টুকরা, লাঠি ইত্যাদি দেখা যায়। চেহারা চিহ্নিত করার মতো স্পষ্ট ছবি সত্ত্বেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আবদুল মালেক ও তার সঙ্গীরা মারামারি করতে যাননি। সে উদ্দেশ্য থাকলে খালি হাতে তারা সেখানে যেতেন না। তারা যুক্তির হাতিয়ারে তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম। কিন্তু যুক্তির মোকাবিলা করার সাধ্য যাদের নেই, তাদের পশুশক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় কী? তাই তারা হিংস্র জানোয়ারের মতোই আচরণ করল।

আমি তখন সিলেটে সুধী সমাবেশে

১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট সন্ধ্যার পর তখনকার জিন্নাহ হলে আমি সুধী সমাবেশে বক্তৃতা শেষে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। এক টুকরা কাগজ আমার হাতে দেওয়া হলো। তাতে লেখা– ঢাকা সিটি ইসলামী ছাত্রসংঘ সভাপতি আবদুল মালেক মারাত্মক আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার খবর

এসেছে। আমি লেখাটি পড়ে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে সমাবেশের সবাইকে জানালাম। আমার কথা বলা থেমে গেল। হলে উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

আমি জামায়াতের ট্রেনিং প্রোগ্রাম উপলক্ষে তিন দিনের সফরে সিলেট গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সাংগঠনিক প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু আবদুল মালেকের খবর জানার পর ঐ দিনই আমাকে ঢাকায় পৌছানোর জন্য বিমানে আসার ব্যবস্থা করা হলো। যদিও সেকালে ট্রেনেই সফর করা হতো। বিমানের ব্যয় বহনের সাধ্য সংগঠনের ছিল না। ঢাকা পৌছেই বিস্তারিত জানা গেল। হাসপাতালে গিয়ে অবস্থা যা জানলাম, তাতে কোন আশা আছে বলে ধারণা হলো না।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা-কর্মীগণ এ আকস্মিক ঘটনায় এতটা মর্মাহত ছিল যে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব সময় ভিড় লেগেই থাকত। অবস্থা জানার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে ১৫ আগস্ট বিকেল পর্যন্ত কাটানোর পর যখন শহীদ হওয়ার খবর পৌছল তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ইসলামের পক্ষে কথা বলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-গুণ্ডাদের হাতে ইসলামের এক সৈনিককে এমন নৃশংসভাবে নিহত হতে হলো। ঢাকা শহরে এ খবর সর্বমহলে ক্ষোভের সঞ্চার করল।

শহীদের জানাযা

১৬ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে শহীদ আবদুল মালেকের জানাযা হয়। ইমামতি করেন আওলাদে রাসূল মাওলানা সাইয়েদ মাহমূদ মুস্তাফা আল-মাদানী। আমার এখনও চোখে ভাসে। জানাযার পূর্বে মাওলানা মাদানী মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগময় বক্তব্য রাখেন। তাঁর হাতে এক বিরাট লাঠি ছিল। এ লাঠি হাতে নিয়েই তিনি চলতেন। সফরে গেলে লাঠির সাথে কাঁধে বন্দুকও রাখতেন।

তিনি লাঠি উঁচিয়ে তাঁর বক্তব্যে ইসলামবিরোধীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, আল্লাহর দীনের জন্য আবদুল মালেকের মতো আমরা সবাই শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি আরও বললেন, আবদুল মালেকের বদলে আমি শহীদ হলে বেশি ভালো হতো।

মাওলানা মাদানী ইসলামবিরোধীদের সতর্ক করে এমন জোরালো বক্তব্য রাখেন, মসজিদে উপস্থিত ভাইস চ্যান্সেলর ও কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, না জানি শহীদ আবদুল মালেকের উপর হামলাকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এ শঙ্কা একেবারেই অমূলক ছিল।

জানাযায় ইমামতি করার সময় মাওলানা মাদানীর কণ্ঠ আবেগাপ্লুত ছিল এবং জানাযায় শরীক আমরা সবাই অশ্রুসিক্ত হই।

মাওলানা সাইয়েদ মাহমূদ মুস্তফা আল-মাদানী মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশে থাকায় তিনি উর্দু খুব ভালোই বলতে পারতেন। বরিশালে এদেশী মহিলা বিয়ে করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। বাংলা ভাষা আয়ত্ত না করা সত্ত্বেও বাংলায় তাঁর সহজ-সরল ওয়াজ জনগণ খুব মজা করে শুনত। তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির সহসভাপতি

ছিলেন। '৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী মুন্সিগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ওয়াজরত অবস্থায় মঞ্চেই তাকে গুলি করে হত্যা করে। লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর মাজার অবস্থিত।

মায়ের কাছে লাশ প্রেরণ

জানাযার পর লাশ বহন করে মিছিলসহকারে জামায়াত ও ছাত্রকর্মীগণ বিরাট সংখ্যায় উক্ত মসজিদ থেকে কমলাপুর রেল স্টেশনে নিয়ে যায়। লাশের জন্য বরাদ্দকৃত বগীতে লাশ তুলে দেওয়া হয়। লাশের সাথে শহীদের একদল সহকর্মী উক্ত বগীতে আরোহণ করেন। আমি জামায়াতের সিটি আমীর ইঞ্জিনিয়ার খুররম মুরাদকে দোআ করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি এমন আবেগপূর্ণ মুনাজাত করলেন, সমবেত সবার কণ্ঠ থেকে আমীন আমীন শব্দের সাথে আকুল কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বিধবা মায়ের কোলে শহীদের লাশ

শহীদ আবদুল মালেকের জন্মস্থান বগুড়া জেলার ধুনট থানার খোকসাবাড়ী গ্রাম। ১৯৪৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ১৯৬৩ সালে ইন্তিকাল করেন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট বলে সবারই আদরের ছিলেন। একমাত্র বোন তার চেয়ে ছোট।

যে মেধাবী ছেলে কৃতিত্বের সাথে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে মায়ের কাছে ফিরে যাবে বলে বিধবা মা দিন গুনে যাচ্ছিলেন, সে আদরের সন্তান লাশ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে গেল। বিধবা মায়ের এ প্রচণ্ড বেদনার গভীরতা পরিমাপ করার সাধ্য কার!

মেধাবী ছাত্র হিসেবে আবদুল মালেক গোটা থানায় খ্যাত ছিলেন। প্রাইমারি ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী) যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে লাভ করেছেন, সেসবের ছাত্র-শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট প্রশংসিত থাকায় এলাকার জনগণের নিকটও আবদুল মালেক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই দাফনের পূর্বে তার জানাযায় জনগণ বিরাটসংখ্যায় শরীক হয়। তাঁর গ্রামে অবস্থিত শহীদ আবদুল মালেকের কবরটি যিয়ারত করতে অনেকেই যায়। শহীদ আবদুল মালেক ট্রাস্ট পরিচালিত ধুনট আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়টি গোটা থানায় শহীদের স্মৃতির সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া

১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামের দুশমনদের অতর্কিত ও কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলায় ঢাকার ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের শাহাদাতের খবর গোটা পাকিস্তানে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) মন্তব্য করেছিলেন, এক মালেকের রক্ত থেকে লক্ষ মালেক জন্ম নেবে।

২. ছাত্র মহলে অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে এটাই প্রথম শাহাদাত। অদ্ভুত জনপ্রিয় ছাত্রনেতাকে হারিয়ে সারা দেশের ছাত্রকর্মীদের মধ্যে শাহাদাতের এমন জযবা পয়দা হলো, সর্বত্র সংগঠনে জোয়ার সৃষ্টি হলো। প্রবল শহীদী জযবা নিয়ে কর্মীরা ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা চালাল। দেখা গেল, ছাত্রসংগঠনে কর্মী সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

৩. করাচিতে একটি রাস্তার নাম রাখা হয় শহীদ আবদুল মালেক রোড।

৪. সারা পাকিস্তানে বহু দৈনিক পত্রিকায় এ শাহাদাতের ঘটনায় সম্পাদকীয় লেখা হয়। এখানে শুধু ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। করাচি ও লাহোর থেকে প্রকাশিত বিশিষ্ট পত্রিকাগুলোর নাম উল্লেখ করছি ঃ দৈনিক জং, হুররিয়াত, মাসরিক, নাওয়ায়ে ওয়াকত্ ও ভেফাক, সাপ্তাহিক চাটান, মাসিক উসওয়া।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে

"শুভ বুদ্ধির জয় হউক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আলোচনাসভার দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র আবদুল মালেক গত ১৫ আগস্ট রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একটি কৃতী ছাত্র এইভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করিবে, ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। স্বভাবতই, মালেকের বিধবা মাতার মনে আজ যে ব্যথা ও বেদনা, সেই একই ব্যথা ও বেদনায় প্রদেশের প্রত্যেকটি মানুষের মন ভারাক্রান্ত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

আমরা বা এ দেশের অভিভাবকমহল ছাত্রসমাজকে কোন দল বা মতের প্রেক্ষিতে বিচার করি না। ছাত্র মাত্রেই আমাদের সন্তান, জাতির ভবিষ্যৎ। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াই আমরা মনে করি, যেমন করিয়া যে কোন অভিভাবকও মনে করিবেন, মালেকের মৃত্যু আমাদেরই সন্তানের মৃত্যু। তাই মালেকের মৃত্যুতে আমরা তার শোকাতুর মাতা ও আত্মীয়-পরিজনের প্রতি কেবল সমবেদনা জানাইয়াই কর্তব্য শেষ করিব না; বরং বলিব, যে দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়া মালেককে মৃত্যুবরণ করিতে হইল, তজ্জন্য আমরা সকলেই আজ অনুতপ্ত।

কায়মনোবাক্যে আমরা কামনা করি, এক মালেকের রক্ত তরুণ ছাত্রসমাজ তথা এ দেশের বার কোটি মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করুক, প্রেরণা জোগাক পরমত সহিষ্ণুতার এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠার।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ আগস্ট, ১৯৬৯)

"একটি কলঙ্কজনক ঘটনা

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত গোলযোগে গুরুতররূপে আহত ছাত্রনেতা জনাব আবদুল মালেক গত পরশু রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহার জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি করাচী হইতে প্রখ্যাত মস্তিষ্করোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জুম্মাকেও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই কৃতী ও বিশেষ নেতৃত্বগুণের অধিকারী তরুণটিকে বাঁচানো গেল না। উন্মত্ত হানাহানির শিকার হইয়া একটি অমূল্য ও সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল অবসান ঘটিল।

ছাত্রসমাজ আমাদের জাতীয় আশা-ভরসার স্থল। সেই ছাত্রসমাজেরই আচরণে যদি এরূপ বিয়োগান্ত ঘটনা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয়, তবে জাতির দুঃখ রাখিবার আর স্থান কোথায়? ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর দায়িত্ব প্রদানের কথা শিক্ষানীতি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। এটাই কি তাহাদের দায়িত্ববোধের নমুনা? অভিভাবকগণ কি এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই তাহাদিগকে এত অর্থ ব্যয় করিয়া শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনে পাঠাইয়াছিলেন? এভাবেই কি তাহারা মাতা-পিতার আশা পূর্ণ করিতেছেন এবং দেশ ও জাতির ভরসাস্থল হইয়া উঠিতেছেন? আবদুল মালেক বাহিরের কোন গুণ্ডার আক্রমণে প্রাণ হারান নাই। হারাইয়াছেন তাহারই মতো ছাত্রের হয়তোবা সহপাঠীর নিষ্ঠুর হস্তের নির্মম আক্রমণে। ছাত্র তরুণের শুভবৃত্তির এই কি বিকাশ? হইতে পারে একজন বা কতিপয় ছাত্র এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, কিন্তু তবু এই কলঙ্কের বোঝা প্রতিটি ছাত্রের মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। আর যদি তাহা তাহারা লইতে পারেন, অনুশোচনার অশ্রুতে যদি প্রতিটি ছাত্রের বক্ষ সিক্ত হয়, যদি তাহারা গুণ্ডামীর পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তবেই এ কলঙ্ক কালিমা কিছুটা মুছিয়া যাইতে পারে। যে উন্মত্ত হানাহানিতে এরূপ একটি বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা যেমন আমাদের নাই, তেমনই একটি বিধবা মাতার আশা-ভরসার স্থল আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশেরও ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিজনকে জানাই গভীর সমবেদনা। এই প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজকে আজ আত্মানুসন্ধান করিয়া অশান্তি ও হানাহানির সর্বনাশা পথ পরিহার করিতে এবং সর্বপ্রথমে শিক্ষায়তনের এ্যাকাডেমিক পরিবেশ রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাই।" (দৈনিক আজাদ, ১৮ আগস্ট, ১৯৬৯)

"বিবাদ নয়, ঐক্যমত গঠন করুন

গত ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুঃখজনক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পরিণতিতে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। সেদিনের গোলযোগে আহত ছাত্র আবদুল মালেক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের নিকট আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ২২ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি, আলোচনা-সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিয়াছে। এই অসহিষ্ণুতা যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, তেমনি বিদ্যার্জন ও জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব ডাকিয়া আনিয়াছে। বস্তুত সংকীর্ণতা ও সহনশীলতার অভাব রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যাঙ্গনে অধিকতর ক্ষতিকারক। কেননা, রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আশুক্ষতির কারণ বিদ্যালয়ে সংকীর্ণতা জাতির গোটা ভবিষ্যতের পক্ষেই ক্ষতিকারক।" (দৈনিক সংবাদ)

"খাঁটি শহীদ

ইসলামের জন্যে বাঁচা ও ইসলামের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে গৌরব ও সম্মানজনক কাজ মুসলমানদের জন্যে আর কিছুই হতে পারে না। আবদুল মালেক তাই করেছেন। তিনি ইসলামের জন্যেই বেঁচে ছিলেন এবং ইসলামের জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এ ধরনের খাঁটি ঈমানদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানরাই চূড়ান্ত কোরবানীর মাধ্যমে সেই অমর জীবন লাভ করেছেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, যারা আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে, তাদের মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা জান না।

তাঁর হন্তাদের চোখে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আবদুল মালেকের অপরাধ ছিল এই যে, তিনি এয়ার মার্শাল নূর খান প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষা পাকিস্তানে কায়েম করতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর দুশমনরা নিরস্ত্র, অরক্ষিত, বিনয়ী ও নম্র মালেককে ক্ষিপ্ত পশুর মতো তাড়িয়ে (Ferociously chased) নিয়ে পৈশাচিকভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে মৃতপ্রায় করে ফেলে। একদিকে এক নিষ্পাপ ভিকটিম (Victim) ইসলামের গৌরব ও দেশের আদর্শের জন্য খাঁটি শহীদ হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা তাদের জংলী বিধানের (Jungle laws) পৈশাচিকতা প্রদর্শন করেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি দৃষ্টি উন্মীলন করে এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবেন না? ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীরা, জাতির উজ্জ্বলতম হীরকরা সেই আল্লাহর কাছে রক্তদান করেছে, যিনি তাঁর বিধানকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের এ দেশ দান করেছেন।

এই আত্মদান তথা খাঁটি শাহাদাত অবশ্যই মুসলমানদের অন্তর্নিহিত ঈমানী চেতনা জাগ্রত করবে। তাদের অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করবে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বস্ব কুরবানী দিতে, যার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতির ভবিষ্যৎ কর্মধারা হোক কবির সেই অন্তর নিঙড়ানো বাণী— 'শহীদ কি জো মওত হ্যায় ও কওম কি হায়াত হ্যায়' (শহীদের মৃত্যু মুসলিম জাতির নব জীবনকেই সূচিত করে।)" (Weekly Young Pakistan : Dhaka)

"ওদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে হবে

আমাদের প্রিয় ছাত্রবন্ধু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রনেতা জনাব আবদুল মালেক শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছেন। মানবরূপী শ্বাপদের হিংস্র আক্রমণের পরিণামে গত ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি চিরতরে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ দেশের ইসলামপ্রিয় ছাত্রজনতাকে অন্তহীন শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি উত্তরণ করেছেন এক মৃত্যুহীন মহাজীবনে। আল্লাহর পথে প্রাণ দান করে তিনি লাভ করেছেন দুর্লভ অমরত্ব। তাই আবদুল মালেকের দেহান্তর ঘটলেও শহীদ মালেকের মৃত্যু হয়নি। তাঁর প্রোজ্জ্বলিত আদর্শের দীপশিখা অনির্বাণ। সে দীপের আলোকরশ্মি জ্বালিয়ে তুলবে এ দেশের শত সহস্র দীপশিখা এবং তা ভস্ম করে দেবে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী জাহেলিয়াতের সকল দর্পকে।

কিন্তু শহীদ মালেকের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড একটি কারণে আমাদের কাছে অতীব মর্মান্তিক, অত্যন্ত অসহনীয়। পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত। ইসলামী শিক্ষা, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থাই এ দেশের মুসলিম জনগণের প্রাণের দাবি। এহেন পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানানোর অপরাধে (!) ধর্মবিরোধী ও সমাজতন্ত্রীরা ছাত্রনেতা মালেককে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে শুধু একটি বিরাট প্রতিশ্রুতিশীল সম্ভাবনাময় জীবনেরই অবসান ঘটায়নি, বরং মূলত দেশের কোটি কোটি ইসলামী জনতাকেই তারা হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ড আজ প্রতিটি ইসলামপ্রিয় ছাত্রজনতার পক্ষে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ধর্মবিরোধী ও সমাজতন্ত্রী শ্বাপদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলার জন্যে আজ তাদের কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।" (সাপ্তাহিক জাহানে নও, ঢাকা)

'শহীদ আবদুল মালেক' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে

'প্রেরণার বাতিঘর' নামক স্মারকে 'শহীদ আবদুল মালেক' শিরোনামে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরও অনেকের লেখাই ঐ সংকলনে রয়েছে। এসব লেখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের জন্য প্রেরণার স্থায়ী উৎস। শুধু ছাত্রদের জন্যই নয়, ঐ সংকলনটি ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের জনশক্তিকেই প্রেরণা জোগায়। আমার লেখাটির শুরু থেকে কয়েক প্যারা ও শেষ দিকের দুটো প্যারা এখানে উদ্ধৃত করছি।

ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আমি 'শহীদী কাফেলা' বলে থাকি। এ দীনী সংগঠনটি এ অভিধায়ই পরিচিত। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে এখানে ইসলামের কাজ করতে গেলে শহীদ হওয়ার কথা নয়। জনগণের ময়দানে যেসব ইসলামী দল আল্লাহর আইন কায়েমের আন্দোলন করছে তাদেরকে এমন ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না, যেমন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে হতে হয়। এর কারণ এটাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ জনগণের পরিবেশ থেকে ভিন্ন।

দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন ও পরবর্তীকালে ইংরেজদের তৈরি শোষকদের শাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ছাত্রদের অনেককেই ধর্মনিরপেক্ষ বানিয়ে ছেড়েছে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে যারা উগ্র তারাই সংগঠিত হয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে শিক্ষাঙ্গন থেকে উৎখাত করতে চায়।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের যুক্তির সামনে টিকতে না পেরে পেশি ও পশুশক্তির আশ্রয় না নিয়ে তারা শিবিরের মোকাবেলা করতে অক্ষম।

ইসলামী ছাত্রশিবির জ্ঞানচর্চা ও চরিত্র গঠনের আন্দোলন। ঐ ব্যাপারে এসব ছাত্রসংগঠন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ারই অযোগ্য। যেসব ছাত্রসংগঠন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ক্ষমতার রাজনীতিতে লিপ্ত তাদের জ্ঞানচর্চা ও চরিত্র গঠনের কোন প্রয়োজন হয় না। সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে হলে সিট দখল, হল দখল এবং বিশ্ববিদ্যালয় হল ও কলেজ ছাত্রসংসদ দখল ইত্যাদিই তাদের কর্মসূচি। আর ইসলামী ছাত্রশিবির

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠন, আন্দোলন ও নির্বাচনে বিশ্বাসী। তাই ঐ জাতীয় কোন ছাত্রসংগঠনই শিবিরকে সহ্য করতে পারে না।

পাকিস্তান আমলের শেষদিকে ১৯৬৯ সালে সন্ত্রাসী ছাত্রদের কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলার শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক শহীদ হন। তিনিই এ দেশের শহীদী কাফেলার প্রথম শহীদ। যারা ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তারা শহীদ হওয়াকেই সর্বোচ্চ সাফল্য মনে করে। তাই আবদুল মালেকের শাহাদাত ঐ সময়ই শত শত নতুন কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এ পর্যন্ত শতাধিক শহীদ হয়েছেন। এ শাহাদাতের পথ বেয়েই এ শহীদী কাফেলা মজবুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

এ দেশের জনগণ এ পর্যন্ত যে কয়টি সরকারের শাসনামলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাতে হতাশ হওয়ারই কথা। চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ শাসকের অভাবে মানুষ পেরেশান। দুর্নীতিমুক্ত শাসক কোথায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্ন সবার।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে চরিত্র ও সৎ লোক তৈরি হচ্ছে না। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোর মাধ্যমে চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে না। একমাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরই চরিত্র গঠনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শিবিরের গড়া নেতৃত্বের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরি হিসেবে শহীদী কাফেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রগতি ও সাফল্যের উপরই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এছাড়া আর কোনো আশার আলো দেখা যায় না।

প্রবন্ধের শেষদিকের লেখা থেকে

এখন আমি শহীদ আবদুল মালেকের উত্তরসূরিদের ব্যাপারে একথা বলতে চাই যে, শহীদ আবদুল মালেক এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, যেখানে যে দায়িত্ব আন্দোলন এবং ইসলামী আদর্শের মর্যাদার জন্য পালন করা উচিত তা পালন করতে হবে, তার প্রতিক্রিয়ায় যদি জীবন যায় তো যাবে, জুলুম-অত্যাচার হলে সহ্য করতে হবে। এ যে আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন পরবর্তীতে আন্দোলনে যারা এসেছে তাদের উপর এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা গেছে। আর তার ফলে আর কিছু ব্যক্তি শহীদ হতে আমরা দেখছি। যদি এ প্রভাব তাদের ওপর না পড়ত তাহলে তারা বাতিলের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে চলে যেত এবং আন্দোলন বন্ধ করে কেটে পড়ত, যদি এ ঘটনার পর আন্দোলন থেকে সবাই সরে যেত তাহলে বোঝা যেত, এর কোনো ভালো প্রভাব আন্দোলনে পড়েনি। অথচ এক্ষেত্রে আন্দোলনের গতি আরো বেড়েছে। নতুন নতুন লোক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, আবদুল মালেকের উত্তরসূরিদের মধ্যে খুবই কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। যার দ্বারা আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ঐ শাহাদাত থেকে এ শিক্ষাই কর্মীদের সামনে এসেছে, আবদুল মালেক জীবিত থেকে এই আন্দোলনের জন্য যে অবদান রাখতে পারতেন, শহীদ হয়ে যেন তার চাইতে বেশি অবদান রেখে গেলেন।

তাহলে আমরা তার শাহাদাত থেকে এটাই শিক্ষা পেলাম যে, আমাদের কেউ শহীদ হয়ে গেলে তা আন্দোলনের জন্য ক্ষতির কারণ নয়, আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দেওয়ার কারণ এটা হতে পারে না। আবদুল মালেকের শাহাদাত থেকে আমরা এই শিক্ষাও পেয়েছি যে, একজন লোক শহীদ হয়ে অগণিত লোকের মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং একজন লোক জীবিত থাকলে আন্দোলনকে যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার চাইতে বেশি এগিয়ে নিয়ে যায় তার শাহাদাত। একজন লোক সমস্ত প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করে আন্দোলনের জন্য যতটুকু অবদান রাখতে পারে, তার শাহাদাত তার চাইতে অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে। এটা আবদুল মালেকের শাহাদাতে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, তার শাহাদাতের কয়েক যুগ পরেও তার নাম ছাত্র-অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, তার স্মৃতি রক্ষার প্রয়োজন মনে করে এবং তার কথা স্মরণ করে বই-পুস্তক বের করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

২১৫.

ইরান বিপ্লব

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখে এক মহা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরানে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান কায়েম হয়।

ইরানের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৬৪ সালের আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করে গোটা পাকিস্তানে জামায়াতের ৬০ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও আমি ঐ সময় লাহোর ছিলাম। মাওলানা মওদূদী ও অন্য কয়েকজন নেতার সাথে আমরা দু'জনও লাহোর জেলে পৌঁছলাম।

দু'দিন পর জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করার যুক্তি প্রদর্শন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে অভিযোগপত্র জেলখানায় পৌঁছল তা থেকে জানা গেল, জামায়াত পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইরানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক বিনষ্ট করার বিরাট অপরাধ (!) করেছে। বেআইনি ঘোষণার অন্যান্য কারণের সাথে এ কারণটিকে প্রধান অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আমরা তো আসামি হিসেবে জেলখানায় আটক আছি। আমাদের বিরুদ্ধে সরকারি চার্জশিট পাওয়ার পর এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনায় বসলাম। মাওলানা এর যে ব্যাখ্যা দিলেন তা থেকে আসল ব্যাপার জানতে পারলাম। আমরা যখন গ্রেপ্তার হই তখন শা'বান মাস ছিল।

জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা সম্পর্কে মাওলানার ব্যাখ্যা

বিগত মহররম মাসে মাসিক তারজুমানুল কুরআনের সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'মহররমের শিক্ষা' নামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয় তাতে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হোসাইন (রা) যে মহান উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পর ৫০ বছর খিলাফত ব্যবস্থা চালু ছিল। ইয়াজিদের সময় থেকে খেলাফত ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ায় কী কী পরিবর্তন আসল তা ঐ সম্পাদকীয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে খিলাফত ব্যবস্থার ৭টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং ঐ সাতটির বদলে রাজতন্ত্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী তাও উল্লেখ করা হয়।

এ সম্পাদকীয়টি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে ক্ষিপ্ত করে বলে জানা গেল। কারণ ইয়াজিদের স্বৈরশাসনের যে ৭টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এর সব ক'টিই আইয়ুব খানের শাসনের সাথে হুবহু মিলে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই আইয়ুব খান ধরে নিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সুকৌশলে ইয়াজিদের নাম নিয়ে লেখা হয়েছে।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্সের সুস্পষ্ট শরীয়াতবিরোধী ধারাগুলোর সংশোধনের দাবি জানিয়ে মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বে ১৪ জন বিশিষ্ট আলেমের স্বাক্ষরে যুক্তবিবৃতি দেওয়া হয়। মাওলানা মওদূদীকে এ ধৃষ্টতার কারণে গ্রেপ্তার করে এক জেল থেকে অপর জেলে স্থানান্তর করে হেরাস করা হয়। তখন থেকেই আইয়ুব সরকার মাওলানা মওদূদীকে দুশমন গণ্য করতে থাকে। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে 'মহররমের শিক্ষা' নামে ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর দুশমনি প্রকাশ পেতে আরম্ভ হয়।

১৯৬৩ সালের অক্টোবরে জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজনে সরকার পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। সম্মেলন অনুষ্ঠানের উপযোগী কোনো ময়দানেরই অনুমতি পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত লাহোর-পিন্ডি মহাসড়কের পাশে এক কিলোমিটার দীর্ঘ স্থানের অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু মাইক ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হলো না। 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডে ঐ সম্মেলনের বিবরণ রয়েছে। মাইক না থাকায় এক অভিনব পদ্ধতিতে মঞ্চের বক্তব্য ডেলিগেটদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দু'দিন সম্মেলনে উপস্থিত হাজার হাজার ডেলিগেট ৮/১০ জনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিশাল লাহোর শহরে দাওয়াতী অভিযান চালায়। হাজার হাজার মানুষ সংগঠনভুক্ত হয়। গোটা শহরের লাখ লাখ লোক সরকারের বৈরী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। সম্মেলনের সাফল্যে সরকার আরও ক্ষিপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল হাবীবুল্লাহ খান জামায়াত ও মাওলানার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক বিবৃতি দিতে থাকেন। ঐ সময় ইরানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনীকে ইরান সরকার দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। এর

প্রতিবাদে মাওলানা মওদূদী মাসিক তারজুমানুল কুরআনে সম্পাদকীয় লিখেন। এটাকেই প্রধান অপরাধ দেখিয়ে জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এতদিনের ক্ষোভের জ্বালা মেটানোর প্রয়োজনীয় উপলক্ষ হিসেবে উক্ত সম্পাদকীয়কে ব্যবহার করা হয়।

জেলখানায় উক্ত আলোচনা বৈঠকের পর মাওলানা মওদূদীর নিকট থেকে ইরানের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তাঁর থেকে শিয়াদের সম্পর্কে মোটমুটি একটা ধারণা পেলাম। এর আগে শিয়াদের আমি কাফির মনে করতাম। আমার এ বিষয়ে সরাসরি কোনো জ্ঞান ছিল না। শোনা কথার ভিত্তিতেই মনে করতাম, সুন্নীরাই মুসলমান, আর শিয়াদের সুন্নীরা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না।

ইরান বিপ্লব কি শিয়া বিপ্লব?

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব কি ইসলামী বিপ্লব, না শিয়া বিপ্লব? সুন্নী আলেমগণের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন সুন্নী আলেম এ বিষয়ে বই লিখে ইরান বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব না বলে শিয়া বিপ্লব বলে রায় দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত দায়িত্বে পুস্তক রচনা করেছেন। কোনো ইসলামী উল্লেখযোগ্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ জাতীয় কোনো ঘোষণা হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। সুন্নী ওলামায়ে কেরাম কোন ফোরামে এ বিষয়ে কোন ফতোয়া দিয়েছেন বলেও শুনিনি। তাই ইরান বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা যায় কি-না এর মীমাংসা কে করবে? এত বড় বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করার যোগ্য নই। এটা নিয়ে আমাদের দেশে বিরাট কোনো বিতর্কও সৃষ্টি হয়নি।

তবে ইরান বিপ্লবের নায়কগণ তাদের বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব বলেই দাবি করেন। ইরান বিপ্লবের পূর্বে যে রাজতন্ত্র ছিল তা ইসলামী সভ্যতার বদলে পাশ্চাত্য সভ্যতারই ধ্বজাধারী ছিল। সেটা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার তলপিবাহক ছিল।

ইরানের শাহ ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেন। সরকার আন্দোলনের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। সরকারের ধারণা ছিল, নেতার অনুপস্থিতিতে আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে। নেতাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে সরকার জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য জঘন্য অপপ্রচার চালায়। এর প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন আরও বেগবান হয়। সরকারের নির্যাতন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইসলামের নামে জীবন বাজি রেখে জনগণ দলে দলে শহীদ হতে এগিয়ে আসে। তাই জনগণ এ বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব বলেই বিশ্বাস করে।

শিয়াদের সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা

শিয়া মতবাদ সম্পর্কে বেশ কয়েকজন সুন্নী আলেমের লেখা বই পড়েছি। শিয়াদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ ঐসব বইতে রয়েছে। বিশেষ করে আকীদাগত এমন সব অভিযোগ আছে, যা সত্য হলে তাদেরকে মুসলিম মনে করা যায় কি-না সে সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। শিয়া আলেমগণ ঐসব অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করেন।

'তোহফায়ে ইসনে আশারিয়া' নামে উর্দু ভাষায় রচিত একটি বিরাট গ্রন্থে দেখলাম, শিয়াদের মধ্যে ৭২টি ফেরকা আছে। অবশ্য এমন কতক ফেরকা আছে, যাদের মুসলিম গণ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুজতাহিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর ছেলে মাওলানা শাহ আবদুল আযীয।

সকল শিয়াকে কাফির মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। সুন্নী আলেমগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো রায় দেননি। বিশ্বের সকল সুন্নী ও শিয়া আলেম এবং বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু শিয়াদের সম্পর্কে এ জাতীয় কোনো ফতোয়া দেওয়া হয়নি।

মক্কা শরীফে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। প্রতি বছর হজ্জের সময় বিরাট সংখ্যায় শিয়া-মুসলিম হজ্জ করতে যান। সৌদি সরকার তাদেরও আল্লাহর মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৫০ সালে করাচিতে সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে ৩১ জন প্রখ্যাত আলেম ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করার দাবি জানান। উক্ত সম্মেলনে হানাফী ও আহলে হাদীসের ২৭ জন আলেমের সাথে চার জন শিয়া আলেমও ছিলেন। ঐ ৩১ জন আলেমের তালিকা আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। চার জন শিয়া আলেম সম্মেলনে শরীক হওয়ায় ২৭ জন সুন্নী আলেম আপত্তি করেননি।

২০০২ সালে পাকিস্তানের যে ৬টি ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুত্তাহিদা মজলিসে আমল (এমএমএ) গঠন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে, এর মধ্যে শিয়াদের দলও শামিল রয়েছে।

এর দ্বারা প্রমাণ হয়, সুন্নী আলেম সমাজ সকল শিয়াকে পাইকারিভাবে অমুসলিম মনে করেন না। শিয়াদের মধ্যে কোন্ কোন্ ফেরকা কাফের তাও তাঁরা চিহ্নিত করেননি। তাই শিয়ামাত্রই কাফির বলা মোটেই উচিত নয়। তবে শিয়াদের আকীদার মধ্যে ঈমানবিরোধী যা আছে তা চিহ্নিত করে বলা যায় যে, এ জাতীয় আকীদা যাদের আছে তারা কাফির।

কোনো ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত প্রমাণ ব্যতীত কাফির বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ রাসূল (স) বলেছেন, কেউ কোনো লোককে কাফির বললে যাকে কাফির বলা হলো সে যদি আল্লাহর বিবেচনায় কাফির না হয়, তাহলে যে কাফির বলেছে সেই আল্লাহর নিকট কাফির বলে গণ্য হবে। তাই কাফির বলাটা কোনো সস্তা গালি হতে পারে না।

রাসূল (স) কাফিরদের মুসলিম বানানোর উদ্দেশ্যে আজীবন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর কাদিয়ানী নবী(?) এবং যারা রাসূল (স)-কে নবী মানতে রাজি নয়, তাদের সকলকে কাফির ঘোষণা করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

ইরানে ১৯৭৯ সালে বিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা আসার পর ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা যদি ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে এ বিপ্লবকে 'শিয়া ইসলামী বিপ্লব' বললেও ইসলামবিরোধী তো বলার উপায় নেই।

ইরান বিপ্লবে পরাশক্তির প্রতিক্রিয়া

১৯৭৯ সালে যখন ইরানে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয় তখনও সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বে কর্তৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। রাজনৈতিক পরিভাষায় এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'ঠাণ্ডা লড়াই' নামে খ্যাত। ইরান বিপ্লবে তাদের মধ্যেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ইরানের শাহকে আমেরিকার দালাল হিসেবে ইমাম খোমেনীর আন্দোলন অনেক দিন থেকে প্রচারণা চালাচ্ছিল। তাই শাহের রাজতন্ত্রের পতনকে আমেরিকা নিজেদের অপমানজনক পরাজয় বলে কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিশেষ করে তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস অবরোধ করে বিপ্লবীরা ৫২ জন কূটনীতিককে জিম্মি করে রাখলে আমেরিকা তাদের উদ্ধারের জন্য কমান্ডো স্টাইলে হামলার পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হওয়ার পর তারা চরম স্থায়ী দুশমনে পরিণত হয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট-প্রতিবেশী দেশ ইরান। ইরান ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হোক তা কিছুতেই সোভিয়ত রাশিয়ার বরদাশত করার কথা নয়। কিন্তু ইরান বিপ্লব ঠেকাতে আমেরিকা ব্যর্থ হওয়ার কারণে সোভিয়েত রাশিয়া কোন বিরূপ ভূমিকা অবলম্বন করা সমীচীন মনে করেনি; বরং আমেরিকার দুশমন হিসেবে ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রয়োজনবোধ করে। হয়তো ইরানী তেল পাওয়ার আশাও করে থাকতে পারে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ার সুযোগও পাওয়া যেতে পারে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিপুল সমর্থনে যে বিপ্লবী সরকার ইরানে কায়েম হলো তাদের সাথে শত্রুতা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলেই হয়তো রাশিয়া পরিস্থিতি অবলোকন করাই সঠিক মনে করেছিল।

বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের প্রতিক্রিয়া

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে নিবেদিত নেতৃবৃন্দ ও জনশক্তি এমনকি মুসলিম জনগণ সর্বত্র ইরানের ইসলামী বিপ্লবে দারুণভাবে আনন্দে উদ্বেলিত হয় ও আন্তরিকভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সবাই নিজ নিজ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার উদগ্র বাসনা নিয়ে জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই তাদের অন্তরের আবেগপূর্ণ স্বপ্ন। তাই ইরানে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তাদের জন্য প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

এ যুগেও আমেরিকার মতো পরাশক্তিকে অগ্রাহ্য করে এবং আধুনিক উন্নত সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীকে ঈমানের বলে পরাজিত করে ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ী হওয়া সম্ভব— এ কথা ইরানে প্রমাণিত হওয়ায় সকল ইসলামী আন্দোলনই ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ

হয়। ইসলামের জন্য শহীদ হওয়ার জযবা সেনাবাহিনীর অস্ত্রকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম— এ কথা হাজার হাজার ইরানী নারী-পুরুষ প্রমাণ করে ছেড়েছে।

সুদানে ইসলামী আন্দোলনের তৈরি যুবকগণ বহু বছর থেকে সে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার ফলে একসময় সেনা অফিসাররাই ইসলামী সরকার গঠনে এগিয়ে আসায় বিনা রক্তপাতেই সুদানে ইসলামী শাসন কায়েম হয়। কিন্তু ইরানে শাহের সেনাবাহিনীর গুলিতে তাদেরই মা-বোনদের শহীদ হতে দেখে তারা সরকারের পক্ষে ও জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অসম্মত হয়। ইমাম খোমেনী সশস্ত্র বিপ্লব করে বিজয়ী হননি। ইসলামী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই তিনি অস্ত্রকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

ইসলামী নেতৃবৃন্দের ইরান সফর

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেনীর আন্দোলন বিজয়ী হয়। আর ২৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের নেতৃবৃন্দ একটি বিশেষ বিমানযোগে করাচি থেকে তেহরান পৌঁছেন। আরব দেশসমূহে কর্মরত ইখওয়ানুল মুসলিমূনের উদ্যোগে বিশ্বের বেশক'টি দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ইসলামের নামে সংঘটিত ইরান বিপ্লবকে সমর্থন করা প্রয়োজন, যাতে ইসলামবিরোধী শক্তি বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে না পারে।

তখন জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি ইসলামী আইন কায়েমের চেষ্টা করছেন বলে দাবি করায় নেতৃবৃন্দ করাচিতে সমবেত হন এবং প্রেসিডেন্ট তাদের জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানের এ বিরাট সহযোগিতার কারণে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে ডেলিগেশনের নেতা মনোনীত করা হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিপ্লব সফল হওয়ার সাথে সাথে আরবে কার্যরত ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমূন বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের একটি মিটিং আহ্বান করে। মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরবের ইখওয়ানুল মুসলিমূন, তুরস্কের সালামাত পার্টি, পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী, ভারতের জামায়াতে ইসলামী, ফিলিপাইনের জামায়াতে ইসলামী, ইন্দোনেশিয়ার মাসুমী পার্টি, মালয়েশিয়ার মুসলিম ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইরানে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের নেতৃত্বে বিশ্ব-ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধি দল এক বিশেষ বিমানে করাচি থেকে তেহরান যাত্রা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন তুরস্কের সালামাত পার্টির সহসভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান পার্লামেন্ট সদস্য জনাব ফাহাম আওবাক, সুদানের ইখওয়ানুল মুসলিমূনের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান ড. তিবানী আল আজদিয়ী, জার্মানির ইসলামী কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট গালেব হাসমাত, মালয়েশীয় মুসলিম ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সভাপতি আনোয়ার ইবরাহীম, উত্তর আমেরিকার মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন ও ইসলামিক

মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. আহমদ আল-রাজী, বৃটেনের মুসলিম ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলী আল শামস এবং জামায়াতে ইসলামীর শোবায়ে দারুল আরাবিয়ার ভারপ্রাপ্ত মাওলানা খলিল হাদিদি।

এই প্রতিনিধি দলের ইরান সফরের অভিজ্ঞতা থেকে ইরানের ইসলামী নেতৃত্বের পরিকল্পনা ও প্রকৃতির আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

ইরান সফরের পর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'এশিয়া'তে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, এর অনুবাদ ঢাকার দৈনিক সংগ্রামে মুদ্রিত হয়। রিপোর্টটি দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদের রচিত 'ইরানে বিপ্লব : খোমেনি' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। মাত্র ৫৮ পৃষ্ঠার বইটি ১৯৭৯ সালের জুন মাসেই 'শতাব্দী প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

"প্রতিনিধি দল ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে করাচি থেকে তেহরান রওয়ানা হয়। রওয়ানার পূর্বে ইরান সরকারের সাথে যথারীতি যোগাযোগ করে প্রতিনিধি দলের ইরান প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। জবাবে ইরান সরকার শুধু অনুমতি নয়, সরকারিভাবে আমন্ত্রণও জানায়।

প্রতিনিধি দল তেহরান পৌছলে তাদেরকে সরকারিভাবে জাঁকজমকপূর্ণ অভিনন্দন জানানো হলো। পরিকল্পনা ছিল, প্রতিনিধি দলটি পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশি তেহরানে অবস্থান করবে না এবং ঐ পরিমাণ সময়ের জন্যই একটি বিমান ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইরান সরকার প্রতিনিধি দলকে কিছুতেই আসতে দিল না। ফলে নির্দিষ্ট সময় পরে খালি বিমানটি করাচি ফিরে গেল।

প্রতিনিধি দল তেহরানে পৌছার পরই 'বেহেশতে জেহরা' কবরস্থানে গমন করল। এই ঐতিহাসিক কবরগাহে শহীদরা শুয়ে আছেন। কবরস্থানের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কবর আর কবর। কবরের উপর শহীদদের ছবি লাগানো। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, শহীদদের অধিকাংশই তরুণ। বলা হয়ে থাকে, ইরানের সাম্প্রতিক আন্দোলনে বিশ থেকে বাইশ হাজার তরুণ শহীদ হয়েছে এবং এক দিনেই শহীদ হয়েছে চার হাজার। শাহের গোটা শাসনামলে কয়েক লাখ লোক শাহাদাতবরণ করেছে।

প্রতিনিধি দলটি পরে বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর দফতরে গমন করলেন। ইমাম খোমেনী প্রতিনিধি দলটির আসার সংবাদ পেলে নিজেই তাঁর দফতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিয়া তোফায়েল প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ইরানে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ইমাম সাহেবকে মোবারকবাদ জানালেন। ... ইমাম খোমেনী বললেন, 'আপনাদের এই আগমন আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির কারণ। আমি আপনার এবং যাদের আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের প্রতি আমার নিজের এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাকিস্তানে ইসলামী আইন-কানুন জারি হওয়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি দোআ করি আল্লাহ

তাআলা যেন পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইসলামের ওপর আমল করার তৌফিক দেন।'

প্রতিনিধি দলের সাথে আরও আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম খোমেনী এক সময় তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বললেন, 'আমরা দুনিয়ার সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প পোষণ করি এবং গোটা বিশ্বে ইসলামের সঠিক ধারণা পেশ করতে চাই।'

ইমাম সাহেব দুঃখ করে বললেন, "আমাদের আলেম সমাজ ও চিন্তাশীলদের ধ্যান-ধারণা ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট নয়। এঁরা ইসলামকে মসজিদ, চাটাই, কতকগুলো কেতাবের দীন বলে মনে করে। অথচ ইসলাম একটা গতিশীল জীবন বিধান, যা গোটা জীবন সমস্যার সমাধান দেয়।'

ইরানের সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইমাম খোমেনী বললেন, "আল্লাহর সাহায্য ও ঈমানী শক্তিই শুধু ছিল আমাদের সম্বল। আমাদের শূন্য হাত জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকদের ট্যাংকের শক্তিকেও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।"

ইমাম খোমেনী এই প্রসঙ্গে একটি অতি মূল্যবান কথা বললেন। তিনি বললেন, 'অত্যাচারকে যত বেশি দিন বরদাশত করা হয়, তা থেকে মুক্তি পেতে তত বেশি কোরবানী স্বীকার করতে হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের উচিত নয় অন্যায়কে বরদাশত করে চলা।'

এই সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধি দল ইমাম খোমেনীকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর একটি চিঠি পৌছে দেন।

এক ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকার শেষে প্রতিনিধি দলটি সেদিনের মতো চলে এলেন।

ইরানের নতুন ইসলামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ড. বাজারগানের সাথে প্রতিনিধি দল দু'বার সাক্ষাৎ করলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি দলটি যেখানে অবস্থান করেছিলেন সেখানেই। প্রতিনিধি দলটি প্রধানমন্ত্রী বাজারগানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সে সময় ড. বাজারগান নিজেই সেখানে এসে হাজির হলেন। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে।

প্রধানমন্ত্রী বাজারগান তাঁর বাসভবনে প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনাকালে একসময় বললেন, 'আমি চাই, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনসমূহের সাথে ইরানী ইসলামী আন্দোলনের যোগাযোগ রক্ষিত হোক। অতীতে ইরান সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ব্রিটেন, আমেরিকা ও কানাডায় শিক্ষারত ইরানী ছাত্ররাই শুধু বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সাথে কিছুটা জড়িত ছিল। সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলার অবাধ সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই লক্ষ্যে পৌছার জন্য ফারসি ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপকভিত্তিক অনুবাদের ব্যবস্থা করছি।'

প্রধানমন্ত্রী ড. বাজারগান তাঁর আলোচনাকালে প্রতিনিধি দলের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন ইরানের ইসলামী আন্দোলন এবং ইরানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের পরামর্শ তাকে দেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধি দল তাদের পরামর্শ ও প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী বাজারগানের হাতে তুলে দেন।

ইমাম খোমেনী ও ড. বাজারগান ছাড়াও ইরানের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ড. ইবরাহীম ইয়াজদির সাথে প্রতিনিধি দলের আলোচনা দেড় দিন ও পুরো এক রাত ধরে চলে। ইবরাহীম ইয়াজদি প্রতিনিধি দলের সাথে মেঝেতে শুয়ে ঐ রাত কাটান। জামায়াতে ইসলামী লেবাননের আমীর উস্তায ফয়সলের নেতৃত্বে চল্লিশ সদস্যের একটি লেবাননী প্রতিনিধি দলও ইরান সফরে এসেছিলেন। তাদের সাথেও বিশ্ব ইসলামী প্রতিনিধি দলের বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রতিনিধি দলটি তিন দিন তেহরানে অবস্থান করার পর ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচী ফিরে আসেন।

প্রতিনিধি দলের নেতা তার তেহরান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আজকাল তেহরান জান্নাতী মোজাহিদদের দৃশ্যই উপস্থাপিত করছে। পুলিশ বাহিনী তার নিজের অপরাধের জন্যই আজ ভেঙ্গে গেছে। তেহরানে যে ৫০ হাজার মোজাহিদ নিয়োজিত রয়েছে তাদের শতকরা ৭০ ভাগের বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। এক আলোচনায় ড. বাজারগান বলেন, 'ইরানের সাম্প্রতিক বিপ্লবে ড. মুহাম্মদ ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, উস্তায হাসানুল বান্না এবং উস্তায সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব প্রমুখের লিখিত গ্রন্থাবলির অমূল্য ভূমিকা রয়েছে।'

বিশ্ব ইসলামী নেতৃবৃন্দের এই সফরের ফলে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সাথে ইরানের আন্দোলনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ইরান অনুভব করেছে, বিশ্বে ইরান একা নয়, বিশ্বব্যাপী এক বিরাট কাফেলা তার পেছনে রয়েছে। আর বিশ্ব ইসলামী নেতৃবৃন্দ ইরানকে আশ্বাস দিয়েছেন, বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনগুলোর পক্ষে দেওয়া সম্ভব, এমন সব রকমের সাহায্য দেওয়ার জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।" (পৃষ্ঠা : ৪৭-৫১)

২১৬.

ইরান বিপ্লবের পর্যালোচনা

রেযা শাহ পাহলভীর শাসনামলের ইরান ও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বিপ্লবোত্তর ইরানের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তা সবাই স্বীকার করে। রেযা শাহের উপাধি ছিল শাহানশাহ। এর অর্থ হলো বাদশাহর বাদশাহ। হাদীসে এ জাতীয় নাম রাখতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। বিপ্লবোত্তর ইরান হলো ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠন ও পরিবর্তন হয়।

আমার ইরান যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, যদিও সুযোগ ছিল। বাংলাদেশে ইরানের একাধিক রাষ্ট্রদূত আমাকে ইরান সফরের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন কারণে আমার যাওয়া সম্ভব হয়নি।

যারা বিভিন্ন সময় ইরান সফরে গিয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই তাদের সফরের অভিজ্ঞতা লিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। এ রকম তিনটি পুস্তক আমার নিকট রয়েছে।

১. 'ইরান বিপ্লব : একটি পর্যালোচনা'। লেখক জনাব মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন। তিনি ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারি আমন্ত্রণে ইরান গিয়েছিলেন। করাচির দৈনিক 'জাসারাত' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই দাওয়াত পেয়েছিলেন। উক্ত পত্রিকায় ১৩ কিস্তিতে উর্দু ভাষায় তিনি ইরান বিপ্লব সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা আমি পড়েছি। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১ কে এম দাস লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৯১ পৃষ্ঠার এ বইটির প্রকাশক শহীদ স্মৃতি প্রকাশনীর পক্ষে মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ। বাংলা অনুবাদকের নাম উল্লেখ নেই। জনাব সালাহুদ্দীন ইরান বিপ্লবের অবদান সম্পর্কে যেমন লিখেছেন, ইসলামদরদির মন নিয়ে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কতক শঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

২. 'সাংবাদিকের চোখে ইসলামী বিপ্লব' শিরোনামে ১২০ পৃষ্ঠার বইটি ঢাকার ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃক ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত। বইটিতে সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক স্বদেশ, সাপ্তাহিক জাহানে নও, নিউজ লেটার, দৈনিক দেশ ও দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকা থেকে মোট ছয়জন সাংবাদিকের লেখা প্রবন্ধে ইরানের বিপ্লব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ পেয়েছে।

৩. তৃতীয় বইটি লিখেছেন মুহতারামা হাফিযা আসমা খাতুন। ৮৮ পৃষ্ঠার বইটির নাম 'ঘুরে এলাম ইরান'। ১৯৯২ সালে তিনি ইরান সফর করেন। তখন তিনি জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যা এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। এ বইটি জানুয়ারি ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মুহাম্মদ নিয়াজ মাখদুম, সাফওয়ান পাবলিকেশন্স, ৪৪৫/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।

এসব বই থেকে উদ্ধৃতি

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ খপ্পর থেকে ইরানকে উদ্ধার করার পর ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানে জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে এ সম্পর্কে উপরিউক্ত বইগুলো থেকে বেশ কিছু জানা যায়। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য বইগুলোর প্রকাশকদের পরিচয় উল্লেখ করলাম, যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বইগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আমি শুধু দুটি বই থেকে কতক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সাংবাদিকদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলে কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে আশঙ্কায় তা থেকে বিরত রইলাম।

জনাব মুহাম্মদ সালাহুদ্দীনের লেখা থেকে নিম্নে যা উদ্ধৃত করছি, তাতে ইরান বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

"যে চিন্তা ও মতবাদ কোনো দেশে সংঘটিত বিপ্লবকে শক্তিদান করে তারই আলোকে সেখানকার বিপ্লব ও বিপ্লব-পরবর্তী ঘটনাবলি পর্যালোচনা করা হয়। ইরান বিপ্লবের ব্যাপারেও এ নীতি অবলম্বন করলে আর কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না। এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে, ইসলামের শিয়া আকীদাই এ বিপ্লবের মূল পরিচালিকা শক্তি। কাজেই এই আকীদা-চিন্তার আলোকে এ বিপ্লবের ঘটনাবলির পর্যালোচনা হওয়া উচিত। আমাদের নিজেদের আকীদা-চিন্তা যাই হোক না কেন, ইরান বিপ্লবের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন মনে করতে হবে। আর শিয়া আকাঈদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, এক্ষেত্রে তার সমালোচনাও অপ্রাসঙ্গিক ও অবৈধ। আমাদের বিচার্য হচ্ছে, ইরানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে বিপ্লবী শক্তিগুলোর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ কী ভূমিকা পালন করেছে? এ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার দশ মাস আগে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে যখন এ বিপ্লবের সাফল্যের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি এবং যখন শাহের কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যাকাশে বিরাজ করছিল ও তাঁর পতনের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি, তখনই আমরা এ বিপ্লবের পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ করেছিলাম। তখন ইরানের বিপ্লবী শক্তিগুলোর অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব ছিল আয়াতুল্লাহ্ শরীআত মাদারীর হাতে। আমরা ইরানে রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের একটি অংশ এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করতাম। এ কথা আমাদের কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ছিল যে, শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে তা নিঃসন্দেহে শিয়া আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। কাজেই আমরা শিয়া বাদশাহের পরিবর্তে শিয়া জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ইসলামী সরকারকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। দুনিয়ার সমস্ত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইরানী জনগণকে সমর্থন জানিয়েছিল।

এ বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর এর ফলাফল দেখে সারা দুনিয়া হতবাক হয়ে গেছে। আমাদের মতে, এ বিপ্লবের নিম্নোক্ত দিকগুলো অস্বাভাবিক গুরুত্বের দাবিদার :

১. ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি ছিল ধর্মদ্রোহিতার ওপর। অন্যদিকে ইরান বিপ্লবের ভিত গড়ে উঠেছে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের ওপর। তাওহীদে বিশ্বাস ও ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে প্রবর্তিত করার সংকল্পই এ বিপ্লবের সার নির্যাস। নিছক অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধার এর চালিকাশক্তি নয়। এ বিপ্লব উৎসারিত হয়েছে ঈমানী শক্তির উৎস থেকে এবং এর ফলে বস্তুবাদের এই প্রাধান্যের যুগে বস্তুবাদী উপকরণের ওপর এ বিপ্লব ঈমানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. খিলাফতে রাশেদার পর থেকে মুসলিম সমাজ রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে আসছে। আমাদের ইতিহাস রাজদরবার ও মাদরাসার দীর্ঘকালীন সংঘাতের ইতিহাস। মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম রাজদরবারকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগত রাখার জন্য অনবরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। আবার রাজদরবার দীনকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সীমানার মধ্যে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ভালো

ও খারাপ বাদশাহদের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংঘাত কখনো ছিল কম আবার কখনো ছিল বেশি। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগ এ সংঘাতমুক্ত থাকেনি। এভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে রাজতন্ত্র স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতোমধ্যে বহু মুসলিম দেশে উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার অবসানে পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রচলন হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত লোকেরাই সর্বত্র ক্ষমতার মসনদ দখল করে। বর্তমানে বহু মুসলিম দেশে বাদশাহদের পরিবর্তে ডিকটেটর ও সামরিক একনায়করা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। আর যেসব দেশ উপনিবেশবাদের কবলে আসেনি, সেখানে যথারীতি রাজতন্ত্র কায়েম রয়েছে। ইরান দুনিয়ার প্রথম মুসলিম দেশ, যেখানে মাদরাসার ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ইসলামের পতাকাতলে একটি পূর্ণাঙ্গ গণবিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং রাজতন্ত্র ও ডিকটেটরশিপ শোচনীয় পরাজয়বরণ করেছে।

৩. ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অরেকটি বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, এ বিপ্লব পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নওজোয়ান ও মাদরাসার ওলামায়ে কেরামকে একই প্লাটফরমে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতামূলক সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে পরস্পরের সহযোগী বানিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছে। তারা নিজেদের দ্বিতীয় সারিতে রাখতে রাজি হয়েছে।

৪. খোমেনীর নেতৃত্বে ইতিহাসের সম্পূর্ণ একটি অভিনব দৃশ্য দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। একদল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ শুধু নিজেদের ঈমান, ঐক্য ও সংকল্পের জোরে এবং শাহাদতের জযবায় উদ্দীপিত হয়ে দুনিয়ার একটি বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করেছে। এ নতুন অভিজ্ঞতাটি দুনিয়ার সমস্ত ইসলামী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। তাদের হিম্মত বেড়ে গেছে। দুনিয়ার সমগ্র মজলুম-নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর বুকে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তাদের হতাশা ও নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যাচ্ছে। প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের নতুন প্রাণবন্যায় তাদের হৃদয় প্লাবিত হয়েছে। তাদের মনে জাগছে সাফল্যের নতুন আশা।

৫. ইরান বিপ্লব বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করে আমেরিকার দম্ভ চূর্ণ করার এবং ছোট দেশগুলোর স্নায়ুর ওপর থেকে তার অস্বাভাবিক চাপ কমানোর ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

৬. এতদিন ধর্মকে 'রক্ষণশীল' বলে গালি দেওয়া হতো এবং কমিউনিজমের দাবি ছিল একমাত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। পশ্চিমের সেক্যুলার দুনিয়াও ধর্মকে কোনো রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইরান বিপ্লব উভয়কেই ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ইরান বিপ্লব ইসলামের রাজনৈতিক শক্তির এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিশ্রুতিশীল প্রদর্শনী

করেছে, যার ফলে সমস্ত মনগড়া মতবাদের তেলেসমাতি হাওয়ায় উবে গিয়েছে। বর্তমানে ইরান বিপ্লব ও আফগানিস্তানের জিহাদ ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের ধারণাই পাল্টে দিয়েছে। তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থই নিশ্চিতভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করবে, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদের বেশির ভাগ ভুল ধারণার নিরসন হয়ে গেছে।

৭. ইরান বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী বর্তমান যুগে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করার এবং একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চতুর্মুখী লড়াই পরিচালনায় নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন। তার মধ্যে দীনী ইলম ও দূরদর্শিতা, ইসলামের বিজয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, কুরবানী, দৃঢ়তা, অবিচলতা, সরলতা, ভোগবিমুখতা, নিজের নীতির ওপর অচলায়তন পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি, শত্রুর কলা-কৌশল বোঝার ও সেগুলো যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেওয়ার যোগ্যতা, রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তিকে ভয় না করার মতো মযবুত ও অপরাজেয় স্নায়বিক শক্তি একত্রিত হয়ে গেছে। এসবের কারণে তিনি নিজের যুগের সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক নেতা গণ্য হয়েছেন। তাঁর জানী দুশমনরাসহ সারা দুনিয়া তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৬৩ সালে তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেন, ১৬ বছরের অনবরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে সাফল্যের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেন।

৮. বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল থেকে ইসলামী বিপ্লবের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু একমাত্র ইরানই সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এদিক থেকে বলা যায়, ইরান প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের এই একটি দিকই তাকে বিশ্ব ইতিহাসের বিশিষ্ট আসন দান করেছে। ১৪০০ বছর পর মুসলমানরা আজ ইসলামের বিস্ময়কর শক্তির প্রদর্শনী ও তার বিজয় অভিযান দেখে হৃদয়ে শান্তি অনুভব করছে। জালেমের ওপর মজলুমের এত বড় বিজয়, তাও শুধু ঈমানের শক্তির বলে— এই সফল বিপ্লবে একমাত্র শাহের তলপিবাহকরা এবং রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বের ধ্বজাধারীরা ছাড়া আর কে না খুশি হয়েছে।

ইরান বিপ্লবের পক্ষে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতার এ দিকগুলো সামনে রেখে এবার এ মূল প্রশ্নে ফিরে আসুন যে, বিগত তিন বছরে ইরান কী হারিয়েছে ও কী পেয়েছে এবং যা কিছু পেয়েছে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু। এই স্বল্প সময়ে ইরান নিঃসন্দেহে অনেক কিছু হারিয়েছে এবং তার ভবিষ্যৎও শত বিপদের লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তবে সঙ্গতভাবে এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা তার সাফল্যগুলো পর্যালোচনা করব। এজন্য প্রথমে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো আলোচনা করতে চাই।

১. খোমেনীর নেতৃত্ব ছিল সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন ইরানী জনগণের অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু তিনি বৈধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য জনগণের আস্থাভোট লাভ করা অপরিহার্য গণ্য করলেন এবং ৩১ মার্চের রেফারেন্ডামের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব ও মর্যাদার সপক্ষে আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে তুললেন।

২. গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হলো। তারা যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন, রেফারেন্ডামের মাধ্যমে তার পক্ষে জনগণের সম্মতি নেওয়া হলো।

৩. দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং মজলিসে মুশাওয়ারাত কায়েম করা হলো। এটি হচ্ছে দেশের আইন প্রণয়ন পরিষদ।

৪. তিন বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সংঘটিত হলো আর ১৫ নভেম্বর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সমস্ত পর্যায় সুচারুরূপে অতিক্রান্ত হলো। মাত্র নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব হয়নি। অথচ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, একে সহজেই 'প্রতিকূল' গণ্য করে রেফারেন্ডাম, নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সবকিছু মুলতবি করার জন্য বৈধ হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা যেত। (পৃষ্ঠা : ১৮-২১)

পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি

জনাব মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন উক্ত পুস্তকে উপরিউক্ত শিরোনামে সভ্যতার নামে পাশ্চাত্যের নোংরামির বিবরণ দিয়ে তা থেকে ইরানের সমাজ যে সম্পূর্ণ মুক্ত, তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

'কৃষক-শ্রমিকদের জীবনে বিপ্লব' শিরোনামে তিনি ইরানের সর্বসাধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের যে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে এর বিবরণ ও পরিসংখ্যান দিয়েছেন।

'যুব-বিপ্লবীদের হতাশ কণ্ঠস্বর' শিরোনামে তিনি তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন, যারা পূর্ণ শক্তি ও আবেগ নিয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক সময় তারা ইমাম খোমেনীর ডান হাত ছিলেন। বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইমাম খোমেনীর আস্থার ভিত্তিতে তারা প্রশাসনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর কোনো মতবিরোধের কারণে তারা সরকারি পদে বহাল থাকতে পারেননি।

এদের মধ্যে রয়েছেন বিপ্লবী সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট বনি সদর, প্রথম প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাজারগান, প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবরাহীম ইয়াজদী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদেক কুতুবজাদা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আলী রেজা নওবারী এবং আরো অনেকে।

এঁরা ইউরোপ ও আমেরিকায় ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ব্যতীত পাশ্চাত্যে অবস্থানরত

ইরানী নাগরিকদের আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। তাদের প্রতি ইমাম খোমেনীর বিরূপ আচরণে মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, না জানি এ পলিসির দরুন ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

হাফিযা আসমা এমপি'র পুস্তক থেকে

মুহতারামা হাফিযা আসমা রচিত 'ঘুরে এলাম ইরান' পুস্তকে অনেক বিষয়ই লিখেছেন, যা থেকে ইরানে ইসলামী সভ্যতার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। আমি তাঁর লেখা থেকে শুধু ইরানে মহিলাদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"খোমেনীর মেয়ের বাড়ি

ইন্টারভিউর পরপরই আমাদের বেরুতে হবে। বেলা ৩টায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে হযরত ইমাম খোমেনীর মেয়ের বাড়িতে। সেখানেও রেডিও তেহরানের সাংবাদিক, রিপোর্টার মেয়েরা মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর রেডিও-টেলিভিশনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। মেয়েদেরই অনুষ্ঠান, তাই ভিডিও করার জন্য মেয়েরা এসেছে। বর্তমানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মেয়েরা হিজাব পরে সব কাজ করছে।

ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান

ইমাম খোমেনীর মেয়ে ইরানের একটি মহিলা সংস্থার সভানেত্রী। তিনি একটি বড় চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে এবং মুখমণ্ডলও প্রায় বেশির ভাগ আবৃত করে ডেলিগেটদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এ মহিলা সংস্থায় ২৫৫ জন সদস্যা রয়েছেন। তাঁরা তেহরানে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। তেহরানের বাইরে এ মহিলা সংগঠনের কোনো শাখা নেই। আমার প্রশ্ন ছিল :

১. এ সংস্থার সদস্যা হওয়ার কোনো নীতিমালা আছে কি না?

২. সংস্থার সদস্যাসংখ্যা বাড়ানোর কোনো প্রচেষ্টা সংস্থার সদস্যাদের আছে কি না?

৩. তেহরানের বাইরে এ মহিলা সংগঠনের কোনো শাখা আছে কি না?

৪. মহিলাদের ইসলামী জ্ঞানদানের কোনো ব্যবস্থা এ সংস্থা করে কি না?

এ প্রশ্নগুলো আমাদের গাইড মানছুরা ইরানী ভাষায় লিখেছে। এগুলো রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের ইন্টারভিউতে দেওয়া হবে।

ইমাম খোমেনীর মেয়ের বাড়িতে আমরা একটা হলরুমে বসেছি। হলরুমে, কার্পেট বিছানো। শীতের দেশ। কার্পেট ছাড়া বসার বা থাকার চিন্তাই করা যায় না। হলের চারদিকে চেয়ারে মেহমানদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়াল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রচুর ফল, কোক ও চা পরিবেশন করা হলো সংস্থার পক্ষ থেকে। মহিলা সংস্থাটির নাম জানা গেল 'ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান'। ইমামের মেয়ে ইরানী ভাষায় প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিচ্ছিলেন। একজন মেয়ে ইংলিশে ট্রান্সলেট করছিলেন।

আজাদী হোটেল

ইমামের মেয়ের বাড়িতে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রাতের ডিনারের জন্য আজাদী হোটেলে। আজাদী হোটেলও বিশাল হোটেল। বিদেশী মেহমানদের ইরান সরকার এক-এক দিন তেহরানের এক-একটি বড় বড় হোটেলে ডিনার দিয়ে সারা তেহরান শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন।

হোটেলে ইরানের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রথমে ফল ও চা পরিবেশন করা হলো। তারপর ইরানী বাদকের দফ জাতীয় বাদ্যের তালে তালে একজন বয়স্ক গায়ক খুব জোরে কাসিদা গাইলেন। স্টেজের কোনো গানের অনুষ্ঠানে কোনো মেয়ে নেই। লক্ষ্য করলাম, হোটেলে সব ডিনারেই মেয়েদের জন্য পৃথক খাবার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েরা যে কাউন্টার থেকে খাবার নেয় সেখানে কোনো পুরুষ খাবার নিতে আসে না। পুরুষের খাবারের কাউন্টার সবসময়ই পৃথক করা হয়। মেয়েরা যার যার খাবার নিয়ে টেবিলে বসছে। আস্ত খাসি ভাজা, বড় মাছ আস্ত সেদ্ধ, সাথে মুরগির রোস্টও সাজানো রয়েছে। ইরানী বোনরা এবং অনেক ডেলিগেট সেদ্ধ মাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন, খাসি ভাজা ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। কেমন একটা বোটকা গন্ধ। দেখলেই আমার কেমন জানি বমি বমি লাগত। কোনো মসল্লা তো নেই-ই। সালাদ, সস, আচার, পিপার সস লেখা থাকে ছোট ছোট বোতলে। আমি সামান্য একটু পিপার সস, সালাদ এবং সস নিয়ে রোস্ট পোলাও দিয়ে খাবার সেরে নিই। অন্যকিছু খাচ্ছি না দেখে একজন বয়স্ক বেয়ারা আরেকটু চিকেন ফ্রাই দিয়ে গেল। এরপর পুডিং, বরফের আইসক্রিম ও কোক আছে। এগুলো খেলেই পেট ভরে যায়। আমার কোনো অসুবিধা হয় না।

অনেক দিন পর দেশী খাবার

মাওলানা আবদুস্ সোব্হান সাহেবের মেয়ে আমাদের শাক রান্না করে খাওয়াল। ইরানে এই ১০/১২ দিন কোনো দেশী খাবার খাইনি। তাই হঠাৎ দেশী খাবার, ভাত, মাছ পেয়ে সবাই পেট ভরে মজা করে খেলাম। পাশাপাশি দুটি রুমে আমি সুব্হান সাহেবের মেয়ে এবং নাতিরা একত্রে আহার এবং গল্পগুজব করছিলাম। পাশের রুমে আমাদের বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী ভাইয়েরা জামাইর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া এবং গল্পগুজব করে কাটাচ্ছেন।

মেয়ের বর্ণনায় ইরানী বিপ্লব

আবদুস্ সুব্হান সাহেবের মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইরানে আছে। সে বিপ্লব-পূর্ব ইরানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলল– 'বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার কথা কি আর বলব, আশপাশেই মদের আড্ডা ছিল। খারাপ মেয়েলোক ছিল, যাদের কাছে পুরুষরা যাতায়াত করতো। মদের আড্ডাখানা সব মিসমার করে দেওয়া হয়েছে। সারা ইরানে কোনো মদের দোকান নেই। সুদের ব্যবসা, সুদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নেই। বেপর্দা মেয়ে নেই। যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলি-বন্টন হওয়ার ফলে দরিদ্র নারী-পুরুষ চোখে পড়ে না। ছোট-বড় সব মেয়ে পর্দা করার কারণে সারা ইরানে কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনা নেই।

মেয়ে আরও গল্প করল, সমাজের খারাপ লোকেরা এখনো সমাজে চোরের মতো ঘাপটি মেরে আছে। গোপনে আনাচে-কানাচে বলাবলি করে যে, 'আগে ইরানী তরুণী-তন্বী মেয়েরা তাদের টুকটুকে গোলাপি উরু, হাতের বাহুগুলো বের করে হাঁটত, কী সুন্দরই না দেখাত! আর এখন সেই মনোলোভা মেয়েগুলোকে বোরকা পরিয়ে কালো কাক বানিয়ে ছাড়ছে।'

হ্যাঁ, দুষ্ট লোকেরা মেয়েদের বোরকা পরাকে কাকের সাথে তুলনা করলে কী আসে যায়? বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার চিত্র দেখিয়েছে ইরান সরকার আমাদের। সেখানে মেয়েরা রেপ হয়ে পড়ে আছে, মাতাল হয়ে পড়ে আছে, মেয়েরা ফ্রাস্টেশনে ভুগে ওভার ডোজ ইনজেকশন নিয়ে মরে পড়ে আছে। বর্তমানে ইরানে এ ধরনের কোনো ঘটনা নেই। মেয়েরা ইরানে এখন সম্মানিতা। ইসলাম মেয়েদের যে সম্মান দিয়েছে, বিশেষ করে ইসলামী পর্দার বিধানটুকু মেনে চলার কারণে ইরানী মেয়েরা আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র সম্মানিতা। পুরুষরা তাদের সাথে শ্রদ্ধার সাথে, সম্মানের সাথে কথা বলে।"

মহিলা অঙ্গনে ইরান বিপ্লবের প্রভাব

২০০৩ সালের শুরুতে আমি বাহরাইন গেলাম। ইতঃপূর্বে এক কিস্তিতে লিখেছিলাম, সৌদি আরব যাওয়ার পথে সস্ত্রীক বাহরাইন যেতে হলো। আমাদের ছোট ছেলে সালমানের পরিবার তখন তার শ্বশুরের বাসায় বাহরাইনে ছিল। আমার বেহাই সাহেব ড. আবু জাফর মুহাম্মদ সুফিয়ান বাহরাইন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।

বেহাই সাহেব আমাকে গাড়িতে নিয়ে ইউনির্ভাসিটির বিশাল সুন্দর সুসজ্জিত ক্যাম্পাস দেখালেন। ক্যাম্পাসে দলে দলে কালো বোরকা পরিহিতা ছাত্রীদের দেখে বিস্মিত হলাম। সৌদি আরব ছাড়া আর কোনো আরব দেশে তরুণী ও যুবতীদের এত সংখ্যায় বোরকা পরা অবস্থায় দেখিনি।

বেহাই সাহেব বললেন, এরা সব শিয়া। বাহরাইনের জনসংখ্যার নাকি শতকরা ৮০ জন শিয়া, অবশ্য শাসক গোষ্ঠী শিয়া নয়। আরো জানলাম যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে শিয়া মেয়েরাও এত বোরকা পরত না। এখন কোনো শিয়া মহিলা হিজাব ছাড়া চলে না।

এটা সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার মনে হলো। মেয়েদের নগ্ন করা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান অবদান। ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হলেও সেখানে মহিলাদের নগ্নায়ন অব্যাহতভাবে চলছে। মহিলা মহলে ইরান বিপ্লবের এত বড় প্রভাব ইসলামী বিপ্লবেরই কৃতিত্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শোচনীয় পরাজয়।

ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে জানতাম না যে, সে দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই শিয়া। সাম্প্রতিক নির্বাচনে শিয়ারাই পার্লামেন্টে মেজরিটি। ফলে প্রধানমন্ত্রীও শিয়া। সুন্নীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বয়কট না করলেও তারা মেজরিটি হতো না। দুবাইতেও শিয়াদের সংখ্যা বিরাট। কুয়েতেও বিরাটসংখ্যক শিয়া রয়েছে। কুয়েতের দোকানপাট বিশেষ করে কাঁচা বাজার প্রধানত শিয়াদের হাতে।

কে. এম. আমীনুল হকের ইরান সফর

কে. এম. আমীনুল হক কিশোর বয়সেই ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। ইরান বিপ্লব সফল হওয়ার সময় তিনি রাজবন্দি হিসেবে ঢাকায় কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই পরম অনুপ্রেরণা বোধ করেন। এক ইরানী ছাত্রনেতার দাওয়াতে ১৯৮২ সালের আগস্টে তিনি ইরান সফর করেন। তাঁর লেখা 'ইরান সফরের অভিজ্ঞতা' থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করছি :

"আমেরিকা ও তার দোসররা দু'ভাবে তাদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করল। প্রথমত, পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্যক্তিত্বসমূহের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো, যেন ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের অনুচরদের হাতে এসে পড়ে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হলো একই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী নেতৃবর্গ, যারা অনমনীয় ও আপসহীন, যাদের বিবেককে কেনা সম্ভব হবে না, তাদের জীবননাশের পরিকল্পনা নেওয়া হলো। বিপ্লবের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই ইসলামী ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম চিফ অব স্টাফ জেনারেল কারানীকে খুনীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারীকে খুন করা হয়। শহীদ হলেন মোফাত্তেহ, কাজী তাবাতাই, ডক্টর বেহেশ্‌তী, রেজাই ও বাহোনার-এর মতো প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। রাতের অন্ধকারে খুন হলো বহু বিপ্লবী রক্ষী, তেহরান পরিণত হলো সন্ত্রাসবাদের আখড়ায়।

বনী সদর ক্ষমতাসীন হয়ে আমেরিকার নীলনকশা মতো কাজ শুরু করল। সুপরিকল্পিতভাবে ইমামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্যোগ নিল। বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র হনন করে এতে জাতীয়তাবাদী চরিত্র আরোপের চেষ্টা করা হলো। জনগণকে লক্ষ্যচ্যুত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিআইএ'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্রান্ত উপলব্ধি করতে ইরানের বিপ্লবী জনতার বাকি রইল না। বিপ্লবী ছাত্ররা গোয়েন্দাবৃত্তির আড্ডাখানা তেহরানস্থ আমেরিকান দূতাবাস দখল করল। আমেরিকার জন্য ছিল এটা প্রচণ্ড আঘাত। যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা তৎপরতার দ্বারা বিস্তৃত প্রচারণা চালিয়ে আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে আরব্য উপন্যাসের দানব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই ভাবমূর্তি ভেঙ্গে পড়ল। যেন হিন্দুশাস্ত্রের বিশ্বসংহারী কালী মূর্তির বিসর্জন হলো দূতাবাস দখলের মাধ্যমে। আমেরিকা ইরানের সম্পদ আটক করল। এতেও বরফ গলল না। জিম্মি উদ্ধার ও ইরানের কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্র খোদার মেহেরবানীতে তাবাসের মরু বালুকায় সমাধিস্থ হলো।

এরপর আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠল। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অবস্থান আর দৃশ্যের বাইরে রইল না। একদিকে উপর্যুপরি অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে এবং বনি সদরের কর্মকাণ্ড দিয়ে ধাপে ধাপে গোটা দেশকে অরাজকতার দিকে এবং অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল, অন্যদিকে ইরাককে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ইরানকে শায়েস্তা করতে চাইল। ঘরে-বাইরে সবখানে সবদিক দিয়ে ইরানকে বিপর্যস্ত করে তুলল আমেরিকা।

আশির সেপ্টেম্বরে ভয়ঙ্কর আক্রমণের মধ্যদিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সূচনা করল ইরাক। বোমা আর গোলার আঘাতে বড় বড় শহরগুলো বিধ্বস্ত হলো। কাসরে শিরিন, আবাদান, খুররম শহর, ইলম সামামচে, দেজফুল এবং নাফত শহরের ২০ লাখ মানুষ হলো বাস্তুহারা। বিরাট বিরাট দালান গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। বোমা ও গোলার আঘাতে ধ্বংসের অবশিষ্টটুকুও বুলডোজার দিয়ে ধূলিসাৎ করা হলো। চেঙ্গিশ আর হালাকুর প্রেতাত্মা যেন সাদ্দামের ওপর ভর করল। তাতারী আক্রমণের মুখে যেমন বাগদাদ জনমানবহীন বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হয়, সীমান্তের সমৃদ্ধ শহরগুলোতে ইরাক তেমনই নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখল। এইসব ধ্বংসস্তূপ আমি ব্যাপকভাবে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছি।

ইরানের কারাগারগুলো এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিপথগামীদেরকে এখানে বিভিন্নভাবে পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার অব্যাহত প্রয়াস আমরা কারাগারগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দেখেছি মুজাহেদীনে খালকের সদস্যদের ও তুদেহ পার্টির তরুণ কর্মীদের ওপর বল প্রয়োগ করে নয় বরং সদাচারের মাধ্যমে এদের মন-মগজে ইসলামী চিন্তা-চেতনা প্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। আবেগ আর প্ররোচনার পথ পরিহার করে ক্রমশ তারা ইসলামী জীবনবোধের দিকে ফিরে আসছে। বেশ কিছু কারাবাসীর সাথে আমাদের কথা হয়েছিল। তাদের সবার বক্তব্য ছিল প্রায় একই। তা হলো– 'আমরা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি, পুরান মদের বোতল ভাঙতে আমাদের একটুও সংকোচ নেই। বিদেশী আর বিজাতীয় গোলামী আর নয়, বিভ্রান্তির দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। ইমামের নির্দেশে আমরা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাব।'

সবচেয়ে বড় কথা, কারাবাসীদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অপরাধী পুত্র অথবা স্বামীর কারাদণ্ড হলে সরকারই সেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকে অথবা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। একটা অপরাধীকে শায়েস্তা করার জন্য আর পাঁচটা অপরাধীর জন্ম দিতে চায় না ইরান।

একাশির ২৮ জুন আমেরিকার চরেরা বোমা মেরে ড. বেহেশ্‌তীসহ ৭২ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে একই দিন একই জায়গায় শহীদ করল। জুমুআর নামাযের ইমাম আয়াতুল্লাহ মাদানী, আয়াতুল্লাহ যাদুকী, আয়াতুল্লাহ দস্তগীর, আয়াতুল্লাহ ইস্পাহানীসহ অগণিত দেশপ্রেমিক দীনী আলেম ও গণনেতাকে হত্যা করা হলো। শহীদী রক্তে সঞ্জীবিত হয়ে গর্জে উঠল সমগ্র জাতি। আমেরিকার দালাল বনি সদরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল। প্রতিঘাতের সম্মুখীন হলো ইরাকের আগ্রাসী বাহিনী। ইসলামের সৈনিকরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল ইরাকের মাটিতে। কুচক্রীরা তখন শান্তির সপক্ষে যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মাধ্যমসমূহ, যারা এতদিন আগ্রাসনের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল, তাদের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন গান। আশির ১৩ জানুয়ারি দি টাইমসের সম্পাদকীয়তে লেখা হলো– Never invade a revolution তথা বিপ্লবকে আঘাত

করো না। একই সম্পাদকীয়তে বলা হলো- Unexpected resistance offered by the Iranian in the face of Iraqui armoured advances. অর্থাৎ ইরাকী গোলন্দাজের আক্রমণের মুখে ইরানের প্রতিরোধ অপ্রত্যাশিত।

ইরানে আমরা সপ্তাহ দুয়েক অবস্থান করেছি। এ সময়গুলোতে মনে হয়েছে আমি আত্মীয়-পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছি আমার আপন গৃহে। ইরানের মানুষগুলোকে মনে হয়েছে আমার আত্মার আত্মীয়। মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি ২ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত এই দেশটিতে আমি একজন অতিথি। এখানে স্পন্দিত হতে দেখেছি আমার আত্মার প্রতিধ্বনি, দেখেছি আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বিমূর্ত প্রকাশ। কত সৌভাগ্যবান এ দেশের মানুষ। এদের জীবন, এদের মৃত্যু, এদের সংগ্রাম, এদের সাধনা এক মহান লক্ষ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই মাটিতে মরণেও সুখ, বেঁচে থাকায় নিবিড় প্রশান্তি, সংগ্রামে অপূর্ব শিহরণ। আমার মনে হয়েছে, আমৃত্যু এখানে যদি থাকতে পারতাম! কিন্তু আজকেই ইরানে আমার অবস্থানের শেষ দিন। আগামীকাল ২২ আগস্ট (১৯৮২) স্বদেশের উদ্দেশে বিমানে চাপতে হবে।

আবার ভালো করে দেখার ইচ্ছা জাগল। শেষ বারের মতো দেখার ইচ্ছা হলো এ দেশের স্বাধীন মানুষগুলোর দৃপ্ত পদচারণা। পথে নামলাম। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটছি। শোহাদা স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো ইমামের প্রতিচ্ছবি। কত বিচিত্র শৈল্পিক আখরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে দেয়ালগুলো। ইংরেজি-ফারসিতে লেখা অজস্র স্লোগান। 'আল্লাহু আকবার' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়াও অজস্র কুরআনের উদ্ধৃতি যেদিকে তাকাই সেদিকে চোখে পড়ে। ইংরেজিতে লেখা Neither East nor West, Islam is the best. এ শুধু দেয়ালের লিখন নয়। দুই পরাশক্তিকে ইরানীরা দুই কনুইয়ের গুঁতোয় দুই প্রান্তে সরিয়ে রেখেছে। ঐশী নির্দেশকেই তারা মনে করে তাদের একমাত্র পথ। ইতিহাসের গতিধারায় মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক পথ পরিক্রম করে ইসলাম আজকের ইরানে যেন সেনথিসিসের অনিবার্য পরিণতি হয়ে এসেছে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে তো এটা এমনিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ থিসিস, সমাজতন্ত্র এন্টিথিসিস, ইসলাম সেনথিসিস। যে কোন বিচার-বিশ্লেষণে ইসলাম একটি তৃতীয় স্রোত, আল কুরআনের ভাষায় মধ্যপথ।

একটা দেয়ালের লিখন চোখে পড়ল। ইরানের বিপ্লবী জনতার এই লিখন সমাজতন্ত্রের আবেগে তাড়িত দুনিয়ার নিগৃহীত মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। জুলুম-নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা অবসানে সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া ইজারাদারির বিরুদ্ধে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ বলতে হয়। দেয়ালে লেখা ছিল- Mr. Marks, Is religion opium of the society! Arise and see, the religion has created a revolution, not economic forces. অর্থাৎ মি. মার্কস, ধর্ম কি সত্যি আফিম! উঠো, উঠে দেখ, অর্থনৈতিক শক্তি নয়; ধর্মই সৃষ্টি করেছে একটি বিপ্লব। আমি পড়লাম। বারবার পড়লাম। মনে হলো আমার দেশের বিপ্লবী তরুণদের জন্য অনেক কিছু পেয়ে গেছি। এক নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। আগামীকাল ঢাকায় ফিরে যাব।"

২১৭.

ইরান বিপ্লবের প্রধান তথ্যাবলি

ইরান বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনী প্রথমে ১৯৬১ সালে, পরে ১৯৬৩ সালে গ্রেফতার হন। ১৯৬৪ সালে নির্বাসিত হয়ে প্রথমে তুরস্কে এক বছর, ইরাকে ১২ বছর এবং ফ্রান্সে এক বছর অবস্থান করেন।

১৯৭৮-এ ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে ইরানে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ২৮ জানুয়ারি তেহরানে ১০ লাখ লোকের মিছিল হয়।

১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেনী ১৪ বছরের নির্বাসন জীবনের পর তেহরান পৌছেন। তাঁর সাথে ছিলেন ৫০ জন উপদেষ্টা ও ১৫০ জন সাংবাদিক। ৫০ হাজার বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক তেহরান বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণ করে।

১১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী কমিশনের নেতা বনি সদর বিপ্লবী সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।

১৯৭৯ সালের ৩০ ও ৩১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং শতকরা ৯০ জন লোক বিপ্লবকে সমর্থন জানায়।

ইমাম খোমেনীর সাথে মতবিরোধের কারণে ১৯৮১ সালের ২২ জুন বনি সদরকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

কয়েক দিন পরই ২৮ জুন এক বিরাট বিস্ফোরণে আয়াতুল্লাহ বেহেশতীসহ ৭২ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহীদ হন।

১৯৮১ সালের ২৪ জুলাই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর মুহাম্মদ আলী রাযাই প্রেসিডেন্ট ও মুহাম্মদ জাভেদ বাহনূর প্রধানমন্ত্রী হন। ৩০ আগস্ট আরেকটি বোমা বিস্ফোরণে এ দু'জন নেতাসহ ১৫ জন শহীদ হন।

১৯৮০ সালে ইরাক কর্তৃক ইরানের উপর হামলা, যুদ্ধে আমেরিকা ও কয়েকটি আরব দেশের ইরানের বিরুদ্ধে ইরাককে সাহায্য করা আর অভ্যন্তরীণ দুশমনদের বারবার বোমা হামলায় বিরাটসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শহীদ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে ইসলামী বিপ্লব বহাল রয়েছে।

ইরান বিপ্লব কি ইসলামী বিপ্লব?

যেসব আকীদার ভিত্তিতে সুন্নী মুসলমানদের থেকে শিয়ারা একটি ভিন্ন ফেরকা, সেসব আকীদার পক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয় তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমার নিকট মোটেই যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ঐসব আকীদার কারণে শিয়াদের ইসলাম থেকে খারিজ বলা যায় কি না তা বিবেচনা করার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। ঐসব আকীদা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতেও আমি চাই না। সুন্নী আলেম সমাজ শিয়াদের কাফির ঘোষণা করেনি বলে আমি তাদের শিয়া মুসলিমই মনে করি।

ইরানে যে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা শিয়া ইসলাম হলেও তা ইসলামেরই একটি সংস্করণ। ইরান বিপ্লবের ফলে জনগণের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যা কিছু হয়েছে, তা ইসলাম সম্মত কি না সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

বিপ্লবের পূর্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ ও পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার যত নোংরামি ও শয়তানি চালু ছিল তা সমূলে উৎখাত করা হয়ে থাকলে এখন সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধ কায়েমের প্রচেষ্টা চলছে কি-না সেটাই দেখার বিষয়। বিপ্লবোত্তর ইরান সফর করে যারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাদের লেখা পড়ে আমার এ ধারণাই হয়েছে যে, ইরান বিপ্লবে এমন কিছুই করা হয়নি, যা ইসলামবিরোধী। ইসলামী আদর্শকে তারা কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তা আমার দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তারা যে পরিবর্তন এনেছেন তা সবই ইসলামসম্মত হয়ে থাকলে ইরান বিপ্লবকে অন্তত শিয়া ইসলামী বিপ্লব বলে স্বীকার করতেই হয়। ইরানে যে জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল তা থেকে শিয়া ইসলাম কি হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ নয়?

ইরান বিপ্লবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনো ইসলামী বিপ্লবই সফল হতে পারে না। ইসলামী আন্দোলন যেভাবে ইরানে বিজয়ী হলো তা নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্যেই হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই অপাত্রে সাহায্য দেন না।

'রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা' শিরোনামে আমার লেখা পুস্তিকায় আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছি। যারা ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন আল্লাহ তাদের সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। তবে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে–

১. আন্দোলনের নিয়ত সহী হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের নিয়তে নয়; আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে হবে।

২. একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপরই ভরসা করতে হবে। নিজেদের জনবল, অস্ত্রবল, কৌশল ও বস্তুগত সম্বলের ওপর নির্ভর করলে সাহায্য পাওয়া যাবে না। হুনাইনের যুদ্ধে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

   বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জনবল ও অস্ত্রবলে কাফিরদের চেয়ে অনেক দুর্বল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ বিজয় দিলেন। আর হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমদের জনবল বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে পরাজয় হলো। কারণ মক্কা বিজয়ের পর নতুন মুসলমান যারা হুনাইনের যুদ্ধে ছিলেন তারা সংখ্যার কারণে বিজয়ের আশা করেছিলেন।

   বদরের যুদ্ধে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলাকে সামনে রেখে যুদ্ধ করেছেন। কাফিরদের তিন গুণ জনবল ও অস্ত্রবল দেখে তাঁরা ঘাবড়াননি। তাঁদের ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহর ওপর, আল্লাহকে পরাজিত করার সাধ্য কারো নেই। তাই মুসলিমদেরই বিজয় হলো।

৩. আন্দোলনকারীদের মধ্যে শাহাদাতের জযবা থাকা চাই। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের উদ্দেশ্যে জীবন কুরবান করার উদগ্র বাসনা থাকতে হবে। গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলা নয়, জীবন উৎসর্গ করার জযবা নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি গুণ থাকলেও যদি জনগণ বিপ্লবের বিরোধী হয় তাহলে বিজয় সম্ভব হবে না। রাসূল (স)-এর সময় মক্কার জনগণ সক্রিয় বিরোধী হওয়ায় মক্কা শরীফে বিজয়ী হওয়া গেল না। এ শর্তটি মদীনা শরীফে পাওয়া গেল বলে সেখানে বিজয়ের সূচনা হলো।

ইরান বিপ্লবে উপরিউক্ত সকল শর্ত পূরণ হয়েছে বলে মনে হয়, যার ফলে আল্লাহর সাহায্যে বিপ্লব সফলতা লাভ করল।

আল্লাহর সাহায্যের কয়েকটি উদাহরণ

ইরানে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য শাহের নিকট সৈন্যবল, অস্ত্রবল, শাসনক্ষমতা তো ছিলই; আমেরিকার মতো বিরাট পরাশক্তির পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল।

প্রথম উদাহরণ : মনে হয় ইসলামী আন্দোলনের নিরস্ত্র মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি গুণ ও বিপুল জনসমর্থন থাকায় তাঁরা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার হকদার হয়ে গেলেন। তা না হলে এ বিজয় কেমন করে সম্ভব হলো? ঈমান ও শাহাদাতের জযবা এমন অমোঘ অস্ত্র যে, বস্তুগত অস্ত্র এর মোকাবেলা করতে অক্ষম। দলে দলে নারী-পুরুষ শাহাদাতের জযবা নিয়ে শাহের সৈন্যবাহিনীর গুলিতে যখন শহীদ হতে থাকলেন তখন তাদের অস্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল। সৈনিকরা নিজেদের দেশের নির্দোষ মানুষকে এভাবে হত্যা করতে অস্বীকার করল।

আল্লাহর সাহায্যের দ্বিতীয় উদাহরণ হলো : ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে ইরান বিপ্লব সফল হওয়ার সাড়ে আট মাস পর ৪ নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্ররা এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে মার্কিন দূতাবাস ভবনটি দখল করে নেয় এবং ৫২ জন কূটনীতিককে জিম্মি করে রাখে।

দূতাবাস থেকে ছাত্ররা যেসব দলিলপত্র জব্দ করে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইরান সরকারবিরোধী সকল নাশকতামূলক অপকর্মে মার্কিন দূতাবাস সরাসরি জড়িত।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার প্রশাসন তাদের জিম্মি উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কমান্ডো হামলার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার গানশিপ সশস্ত্র কমান্ডো বাহিনী নিয়ে ইরানের তাবাস মরুভূমি এলাকায় প্রবেশ করে। প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে হেলিকপ্টারগুলো অস্ত্র ও কমান্ডো বাহিনীসহ আকাশেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নিউজউইক সাময়িকী ঘটনাটিকে 'অলৌকিক' বলে আখ্যায়িত

১৯৮০ সালের এপ্রিলে আটটি হেলিকপ্টার ও অস্ত্রবোঝাই একটি যুদ্ধ বিমান তেহরানে অবতরণ করার সময় প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে চারটি হেলিকপ্টার ও অস্ত্রবাহী বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং কমান্ডোরাও নিহত হয়। তখন জিমি কার্টার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

তৃতীয় উদাহরণ : ১৯৮১ সালের ২৮ জুন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে আয়াতুল্লাহ বেহেশতীসহ ৭০ জন নেতা শহীদ হন। এত বড় নাশকতামূলক ঘটনায় সরকার অচল হয়ে পড়ার কথা। ৩০ আগস্ট অপর এক বিস্ফোরণে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আলী রাযাই এবং প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ জাভেদ বাহনূরসহ ১৪/১৫ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহীদ হন। মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে এত বড় দুটো ঘটনায় বোঝা গেল যে বিপ্লবী সরকারকে ব্যর্থ করে দিয়ে ক্ষমতা দখলের বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আল্লাহর রহমতে এমন মারাত্মক ধকলও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলো।

এত বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনার পর বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকাই অসম্ভব হতে পারত। বিপ্লববিরোধী কয়েকটি শক্তি তখনও খুব তৎপর ছিল। শাহের আমলের গোয়েন্দাবাহিনী 'সাভাকের' অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত গ্যারিলারা, ক্ষমতাচ্যুত সরকারের এজেন্টরা, কমিউনিস্ট তুদেহ পার্টি ইত্যাদি কর্মতৎপর ছিল বলেই এত বিরাট রকমের নাশকতা সংঘটিত করতে সক্ষম হলো।

চতুর্থ উদাহরণ : আমেরিকার মতো দাম্ভিক পরাশক্তি ইরান বিপ্লবের সফলতায় চরমভাবে অপমাণিত ও ক্ষুব্ধবোধ করছিল। তাদের কমান্ডো হামলার শোচনীয় ব্যর্থতার পর ইরানের উপর সরাসরি হামলার আর কোনো পথ না থাকায় ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনকে ইরান আক্রমণে সর্বাত্মক সাহায্য করল। ইরাকে বিরাটসংখ্যক শিয়াসম্প্রদায়ের অবস্থানের কারণে ইরানের ইসলামী সরকার সাদ্দামের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা তো অবশ্যই ছিল। বিশেষ করে ইমাম খোমেনী অন্যান্য মুসলিম দেশে বিপ্লব রফতানি করার ঘোষণা দিয়ে সাদ্দাম হোসেনের শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিলেন। সাদ্দাম হোসেনকে আমেরিকা বিপুল পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহ করল। নিকটবর্তী রাষ্ট্র কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতও বিপ্লব রফতানি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সাদ্দামকে বিরাট অংকের অর্থ সাহায্য করেছে বলে ব্যাপক গুজব রয়েছে। এত কিছু করেও ইরানকে পরাজিত করা গেল না।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের সূচনা

পঞ্চাশের দশকে ইরাক ও সিরিয়াতে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতা দখল করা হয়। উভয় দেশেই বাথ পার্টি কায়েম করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আদলেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দলীয় পরিচয় দেয়। ঐ সময় দুনিয়ার যত দেশে যারাই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে, সকলেই সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীর অভিনয় করেছে। ক্ষমতাকে সংহত, কেন্দ্রীভূত ও স্থায়ী করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও দখল করা অত্যন্ত সহায়ক। সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়েই এ কর্মটি সহজে করা যায়।

যারাই সমাজতন্ত্রকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে তারা প্রথমেই ইসলামের উপর হামলা করা অত্যাবশ্যক মনে করে। তাই ক্ষমতাসীন হয়েই ইরাকে সাদ্দাম হোসেন ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে উৎখাত করে। যারা কোনো রকমে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়

তারা ছাড়া ইখওয়ানের সকল নেতা ও কর্মীকে হয় হত্যা, আর না হয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এভাবেই সাদ্দাম হোসেন ইরাকে আল্লাহর গযব হিসেবে নাযিল হয়।

১৯৬৩ সালের শেষদিকে যখন ইরান সরকার আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তখন তিনি নিকটবর্তী দেশ হিসেবে ইরাকের 'নাযাফ' এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ইরাকের শিয়া সম্প্রদায় তাঁকে পেয়ে খুব খুশি হয়। তিনি ইরাকে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব মনে করেননি। তবে ইরাক থেকেই ইরানের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১২ বছর পর যখন ইরানে ইসলামী আন্দোলন অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন ইমাম খোমেনী প্রকাশ্যে ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন। এতদিন তিনি নীরবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এখন প্রকাশ্যে বক্তব্য দিতে শুরু করলে সাদ্দাম হোসেন তাঁকে ইরাক থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন। ইমাম ফ্রান্সে চলে যান। ফ্রান্স থেকেই তিনি ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিজয়ী বেশে তেহরান পৌছেন। তেহরান পৌছার পূর্বে প্যারিস থেকে তিনি তাঁর দু'জন প্রতিনিধিকে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের জন্য লাহোর পাঠান।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পরপরই ইমাম খোমেনী মুসলিম বিশ্বে ইসলামী বিপ্লব রফতানির প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন। ইরানে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ে সফলতা অর্জনের পর আবেগের বশবর্তী হয়েই হয়তো তিনি এমন ঘোষণা দিয়ে থাকবেন। আমার ধারণা যে, এ ঘোষণা বিপ্লবের স্থায়ীত্বের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়নি। ইরানে বিপ্লব সফল হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন তিনি পেলেন, তাকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহের নৈতিক সমর্থন হাসিলের চেষ্টা করলেই ভালো হতো।

তিনি বিপ্লব রফতানির হুমকি দিয়ে ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমীরাতকে আতঙ্কিত করে ফেললেন। বিশেষ করে ইরাক ও কুয়েতে বিরাটসংখ্যক শিয়া নাগরিক থাকায় এ আশঙ্কা করা অস্বাভাবিক ছিল না যে, শিয়াদের মাধ্যমেই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হতে পারে। দীর্ঘ বার বছর ইমাম খোমেনী ইরাকে অবস্থানকালে ইরাকি শিয়াদের সাথে ইমামের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে সাদ্দাম হোসেনের পেরেশান হওয়ারই কথা।

ইরানে সাদ্দামের হামলা

এটা সত্যিই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সাদ্দাম হোসেন সরাসরি ইরানের উপর সামরিক হামলা করে বসলেন। ইরানী জনগণের চরম আবেগময় সমর্থন নিয়ে যে বিপ্লব সফল হলো সে বিপ্লবীদের পরাজিত করে ইরান দখল করার সাহস কেমন করে হলো তা সত্যি রহস্যময়। খোদ ইরাকেই শিয়াদের বিরাট জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও এমন হামলা করা আরও বিস্ময়কর।

হয়তো সাদ্দাম আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকবেন। হয়তো সৌদি আরব, কুয়েত ও আরব আমীরাতের সমর্থনের আশ্বাসও তিনি পেয়ে থাকবেন।

ইরানের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত যে সামান্য দূরদর্শিতারও পরিচায়ক ছিল না তা সুস্পষ্ট। সাদ্দাম হোসেন কি ইরান দখল করে সেখানে তাঁর শাসন কায়েম করা সম্ভব মনে করেছিলেন? কী পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলেন তা বোধগম্য নয়।

ইরানকে শায়েস্তা করার জন্য সাদ্দাম হোসেনকে আমেরিকার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সাহায্য করা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু প্রতিবেশী আরব দেশগুলো সাদ্দামকে কোন্ নেক নিয়তে সাহায্য করল তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইসলামী আন্দোলনের প্রকাশ্য দুশমন সাদ্দামকে অর্থ সাহায্য করে তাঁরা কোন্ মহান উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইলেন, তা অন্তত আমার বুঝে আসেনি।

দীর্ঘ আট বছর দুই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলল। এত সাহায্য পেয়েও সাদ্দাম যুদ্ধে সুবিধা করতে পারলেন না। যেসব আরব সরকার তাঁকে সাহায্য করেছে ঐসব দেশের জনগণের নৈতিক সমর্থন ইরানের পক্ষেই ছিল। তা ছাড়া ইরানীরা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ও শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর ইরাকী সৈন্যরা কোনো নৈতিক প্রেরণা ছাড়াই দায়সারা যুদ্ধ করছিল। ইরান হামলার কোনো নৈতিক যুক্তি না থাকায় ইরাকী সৈন্যদের মনে ইরানীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কোনো ভিত্তি ছিল না। যুদ্ধে অস্ত্রের ভূমিকা আসল নয়, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তাদের আবেগই আসল যুদ্ধ করে। ফলে সাদ্দাম যুদ্ধে যখন মার খেতে থাকলেন তখন জাতিসংঘ ইরানের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ১৯৮৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ বন্ধ করে। ইমাম খোমেনী সাদ্দামকে পরাজিত করে ইরাকে বিপ্লব সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার সময় বললেন, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষ পান করতে বাধ্য হলাম।'

সাদ্দামের কুয়েত দখল

ইরানের উপর হামলা করে সাদ্দাম হোসেনের একটি বিরাট লাভ হলো। গোটা আরবে ইরাক সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তিতে পরিণত হলো। শক্তির নিজস্ব একটা প্রেরণা থাকে। শক্তি থাকলেই এর প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। কোনো এককালে কুয়েত ইরাকের অংশ ছিল– এ দাবি করে হঠাৎ ১৯৯০-এর ২ আগস্ট দিবাগত রাতের মধ্যে কুয়েত দখল করে নিল। কুয়েতের আমীর, উর্ধ্বতন সরকারি অনেক কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যবসায়ীরা কোনো রকমে পালিয়ে সৌদি আরবে আশ্রয় নেন।

পত্রিকায় পড়েছিলাম, সাদ্দাম হোসেন ইরাকস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে জানালেন, কুয়েত এক সময় ইরাকের হিস্যা ছিল। তাই কুয়েতকে আবার ইরাকে শামিল করায় ইরাকের হক রয়েছে। রাষ্ট্রদূত বললেন, এ বিষয়ে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকবে। এতে সাদ্দাম নিশ্চিন্ত হলেন যে, আমেরিকা হস্তক্ষেপ করবে না। তাই নিশ্চিন্তে ছোট্ট দুর্বল দেশটি তিনি বিনা বাধায় দখল করে নিলেন।

কুয়েত দখলের পর সৌদি আরব ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। সৌদি আরব যে বিরাট অংক দিয়ে সাদ্দামকে মহাশক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দিল, সে অর্থ ব্যয় করে নিজের দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করলে এতটা ঘাবড়ানোর প্রয়োজন হতো না। আরববিশ্বে শুধু নয়,

গোটা মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরবের যে বিশাল নৈতিক মর্যাদা রয়েছে, প্রধানত সে কারণেই আমেরিকা সৌদি আরবের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।

সৌদি আরব উপলব্ধি করল যে, সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে স্থিতিশীল হতে পারলে নিশ্চিতভাবেই সৌদি আরবের তৈলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চল দখল করে নেবে। তাকে প্রতিহত করার সাধ্য সৌদি আরবের নেই। তাই সৌদি সরকার বন্ধুরাষ্ট্র কুয়েতকে অন্যায় দখল থেকে মুক্ত করার জন্য আমেরিকার দরবারে ধরনা দিল।

মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি কায়েমের এমন মহাসুযোগ গ্রহণ করে সাত মাসের মধ্যেই সাদ্দামের দখল থেকে কুয়েতকে মুক্ত করে আমেরিকা আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর উপর সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। তখন থেকেই আরব দেশগুলোর অর্থেই আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বহাল রয়েছে। এসব ঘাঁটি তাদের উপর বিরাট আর্থিক বোঝা।

কুয়েত সাদ্দাম হোসেনের দখলে থাকাকালে সৌদি আরব ও কুয়েতের কতক দীনি বন্ধুর সাথে আমার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। সবার সাথে আমার আলোচনার ধরন একই ছিল। তাই একজনের কথাই উল্লেখ করছি। তিনি ড. মানে আল জোহানী। তিনি ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (WAMY)-এর সেক্রেটারি জেনারেল এবং রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির প্রফেসর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সৌদি সরকারের মজলিসে শূরার সদস্যও হন। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

তিনি ঢাকায় এসে ফোনে যোগাযোগ করলে আমি হোটেলে তাঁর সাথে দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাদ্দামকে সৌদি আরব ও কুয়েত যে অর্থ সাহায্য করল তা কি ইসলামের স্বার্থে? জওয়াবে বললেন, অবশ্যই নয়। বললাম, সাদ্দামের মতো ইসলামের দুশমনকে সাহায্য করার পরিণামে আল্লাহ তাআলা কুয়েত ও সৌদি আরবকে উচিত শাস্তিই দিলেন। তিনি নীরবে মাথা নেড়ে আমার কথা সমর্থন করলেন। আরও বললাম, সাদ্দাম হোসেনের বাড়াবাড়ির ফলে আজ আরব উপসাগর ও পার্শ্ববর্তী সকল আরব দেশ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দুশমন আমেরিকার সামরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে পড়েছে।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্গতিতে সাদ্দামের অবদান

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাতিসংঘকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেভাবে ইরাকে পাশবিক হামলা চালিয়ে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে, বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলিম সে জন্য অন্তর থেকে আমেরিকাকে ঘৃণা করে। গোটা মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে। সকল মুসলিম দেশে মুসলিম নামধারী শাসকদের উপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে আমেরিকার আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করছে। ইসলামের পুনর্জাগরণকে প্রতিরোধ করার জন্য ঐ শাসকদের মাধ্যমে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যে কয়টি দেশের শাসকরা আমেরিকার গোলামি মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না, তাদের উপর হামলার হুমকি দিচ্ছে।

এ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সাদ্দাম হোসেনের বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি যদি ইসরাইলের উপর হামলা করতেন তাহলে মুসলিম উম্মাহর নিকট গাজী সালাহুদ্দীনের মর্যাদা

পেতেন। তাঁর সামরিক শক্তি ইরানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আমেরিকা ও আমেরিকার পোষ্যদের নিকট প্রিয় হলেও মুসলিম উম্মাহর নিকট ইসলামের দুশমন হিসেবেই চিহ্নিত হলেন। অবশ্য এ অপকর্মটি করার কারণে তিনি আমেরিকা ও কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের সহায়তায় তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হওয়াই তাঁর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ইরানের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি কুয়েত দখল করলেন আর এটাই তার পতনের পথ প্রশস্ত করল।

কুয়েত দখল করে তিনি আমেরিকাকে সরাসারি সামরিক হস্তক্ষেপ করার মহাসুযোগ করে দিলেন। হয়তো ইরানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে তিনি মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রও আমেরিকা থেকে পেয়ে থাকবেন। আর ঐসব অস্ত্র থাকার অভিযোগেই ইরাকে হামলা করার অজুহাত সৃষ্টি হলো। হয়তো কুয়েত থেকে উৎখাত হওয়ার পর তিনি ঐসব অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে থাকবেন, যার ফলে অস্ত্র তালাশ করে পাওয়া যায়নি। আমেরিকার নির্দেশে ও সহযোগিতায় পূর্বেই Missile ধ্বংস করা হয়েছিল।

আমেরিকার কুয়েত উদ্ধারকালে মুসলিম উম্মাহর আবেগ

সাদ্দাম হোসেন মুসলিম উম্মাহর নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না; বরং ইরানের উপর হামলার ফলে তিনি নিন্দিতই ছিলেন। তাঁর কুয়েত দখল করাও কোনো প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছিল না।

কিন্তু কুয়েত উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা অত্যন্ত কৌশলের সাথে সকল মুসলিম দেশ থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তা চেয়ে সাদ্দাম হোসেনকে মুসলিম উম্মাহর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইল।

সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত চালাকির সাথে ইসরাইলের প্রতি কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রমাণ করতে চাইলেন, তিনি ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চান বলেই আমেরিকা মুসলিম উম্মাহর দুশমন ইহুদি রাষ্ট্রটিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ফিলিস্তিনে দেড় হাজার বছর থেকে বসবাসকারী আরব মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে দুনিয়ার ইহুদিদের জন্য সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করা ও সকল আরব দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসরাইলকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা যে জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে এর ফলে মুসলিম উম্মাহ আমেরিকাকে ঘৃণা করে। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে ইসরাইল আমেরিকার সরাসরি আনুকূল্যে মিসরের বিরাট এলাকা দখল করায় ঐ ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পায়।

মুসলিম দেশগুলোতে ইরাকের দূতাবাসসমূহ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে আমেরিকার বিরুদ্ধে উম্মাহর ঐ ঘৃণাকে পুঁজি করে সাদ্দাম হোসেনকে ফিলিস্তিন উদ্ধারকারী গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর ভূমিকা পালনে সমর্থন করার আবেদন জানায়। বাংলাদেশেও জনগণ দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং সাদ্দামের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল হয়, এমনকি অনেক মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলন সাদ্দাম হোসেনকে প্রকাশ্য সমর্থন করে। দেখতে দেখতে সাদ্দাম হোসেন বিরাট হিরো হয়ে যান। অবশ্য কুয়েত থেকে সাদ্দাম বিতাড়িত হওয়ার পর ঐ আবেগ দমে যায়।

২১৮.

আমেরিকার আফগানিস্তান দখল

আমেরিকা ইরাক দখলের পূর্বে আফগানিস্তান দখল করে নেয় এবং সেখানে তাদের পুতুল সরকার কায়েম করে। আমেরিকা কর্তৃক ইরাক দখল সম্পর্কে আলোচনার সাথে আফগানিস্তান দখল সম্পর্কেও লেখা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহকে উৎখাত করে বামপন্থি শক্তিগুলো রাশিয়ার সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু তাদের ব্যর্থতার কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনী ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সরাসরি আফগানিস্তান দখল করে নেয়। তখন এ দেশ থেকে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিদের একটি ডেলিগেশন কাবুল সফর করে এ দেশে কাবুল স্টাইলে বিপ্লব সাধন করার সংকল্প ঘোষণা করে। আমি পত্রিকায় জনাব আবদুর রাজ্জাকের মুখে এ ঘোষণার কথা জানতে পারি।

আফগানিস্তানের ছোট বড় সাতটি ইসলামী দল ও লাখ লাখ মুসলমান শরণার্থী হয়ে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় নেয়। তখন জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি শরণার্থীদের খেদমত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, পাকিস্তানের জনগণের আবেগপূর্ণ সমর্থন ও উপসাগরীয় আরব দেশের বিপুল সাহায্যে দশ বছর যুদ্ধ করে রাশিয়াকে পরাজিত করে। ১৯৯২-এর ২৮ আগস্ট কাবুলে মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীকে প্রেসিডেন্ট করে মুজাহিদদের কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়।

যাদের নেতৃত্বে আফগানিস্তান রাশিয়ার খপ্পর থেকে মুক্ত হলো তাদের মধ্যে নেতৃত্বে কোন্দলের ফলে সেখানে সুশাসন কায়েম হতে পারল না। কান্দাহারের অধিবাসী মোল্লা মুহাম্মদ ওমর নামক এক আফগান মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রের নেতৃত্বে প্রথম কান্দাহারে মাদরাসা ছাত্রদের শাসন কায়েম হলো। সারা আফগানিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। কান্দাহারে সুশাসন কায়েম হওয়ায় আফগান জনগণের মধ্যে ছাত্রদের নেতৃত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

বিপুল জনসমর্থনের ফলে তালেবানরা অল্প সময়ের মধ্যেই রাজধানী কাবুলও দখল করতে সমর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রাব্বানী কাবুল থেকে পালিয়ে যান। সরকারবিরোধী নেতা ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমত ইয়ারও তালেবানদের বাধা দেননি।

১৯৯৬-এর সেপ্টেম্বরে মোল্লা মুহাম্মদ ওমর আমীরুল মুমিনীন হিসেবে আফগান সরকারের প্রধান হন। সারা দেশে জনগণের মধ্যে ইসলামী জযবার জোয়ার সৃষ্টি হলো। ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়ায় দেশে আইন-শৃঙ্খলার প্রচুর উন্নতি হলো। রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা তাদের থাকার কথা নয়। তাঁরা দীনী মাদরাসায় যে শিক্ষা লাভ করেছেন তাতে মযবুত ঈমান, উন্নত ব্যক্তিগত চরিত্র ও নেক নিয়তের অধিকারী অবশ্যই ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিতদের সহযোগিতা তাঁরা কতটুকু নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা আমার জানা নেই।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত দুটো টাওয়ার বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর এর জন্য প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ওসামা বিন লাদেনকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবেই বিনা প্রমাণে দায়ী করে অভিযোগ করলেন, লাদেন আফগান মুক্তিযুদ্ধে স্বয়ং শরীক ছিলেন এবং তালেবান সরকারকে সফল করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি সৌদি নাগরিক হলেও সৌদি সরকারের নিকট অবাঞ্ছিত হওয়ায় আফগানিস্তানেই বসবাস করছিলেন।

আমেরিকা লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানালে মোল্লা ওমরের সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য লাদেন দোষী বলে প্রমাণিত হলে সরকার তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে সম্মত বলে জানানো সত্ত্বেও বিনা প্রমাণে লাদেনকে সন্ত্রাসী হিসেবে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে প্রবল চাপ দিতে থাকে। এ চাপে আফগান সরকার নতি স্বীকার না করায় আমেরিকা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আফগানিস্তান দখল করে গণহত্যা চালায়। ২০০১ সালে ১২ নভেম্বর মোল্লা ওমর কাবুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আমেরিকান বাহিনী কাবুল দখল করে নেয়।

২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর আফগানিস্তান সম্পর্কে আমার একটা প্রবন্ধ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। ২০০২ সালের নভেম্বরে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তাক্ত আফগান' নামে ৮০৮ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থে আমার ঐ লেখাটি শামিল করা হয়েছে। এতে ১৪৪ জন লেখকের প্রবন্ধ রয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বর্তমানে দৈনিক নয়াদিগন্তের অন্যতম সম্পাদক জনাব মাসুদ মজুমদার। সম্পাদকের একটি দীর্ঘ মুখবন্ধও রয়েছে। আমার ঐ লেখাটিই এখানে পরিবেশন করছি ঃ

পাশ্চাত্য সভ্যতা রক্ষার দোহাই দিয়ে এবং জাস্টিসের নামে আমেরিকা জাতিসংঘের একটি সদস্য দেশ আফগানিস্তানের সরকার ও জনগণের উপর যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে তা মানবজাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। পাশব শক্তির দাপটে যা ইচ্ছা তাই করা যায়, কিন্তু ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে সব কিছুই যাচাই করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ, সাধারণ ন্যায়বিচার, বিবেক, মানবতাবোধ, নৈতিক চেতনা ইত্যাদির দৃষ্টিতে এত বড় অপরাধ করা হলো, যার প্রতিবাদ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলও করতে সাহস করলেন না। তাহলে জাতিসংঘ কি লীগ অব নেশনের পরিণতির দিকেই এগোচ্ছে?

গত অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ম্যানচেস্টার শহরে টেলিভিশনে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের চরম আবেগময় বক্তৃতা শুনলাম। সারকথা টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ও ওয়াশিংটনে হামলার উদ্দেশ্যে চারটি বিমানের ১৯ জন আত্মঘাতী হাইজ্যাককারীর তিনজন যে ওসামা-বিন-লাদেনের লোক তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। অবশ্য তা আমরা প্রকাশ করছি না। তাই তালেবান সরকারের নিকট আমাদের দাবি "Either surrender Usama or Surrender Power" (হয় ওসামাকে দাও, না হয় ক্ষমতা ছাড়)।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য এটুকু অস্পষ্ট কারণের দোহাই দিয়ে দুনিয়ার অন্যতম দরিদ্র ও অসহায় একটি দেশের উপর বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের নেতৃত্বে এত বিরাট রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনা করা কি সত্যিই সমর্থনযোগ্য হতে পারে? অথচ জাস্টিসের নামে এত বড় ইনজাস্টিস করা হলো। জাস্টিসের সংজ্ঞাই বদলে গেল। শক্তিমানের জুলুমই কি জাস্টিস?

টুইন টাওয়ার গলে যেতে দেখলাম

১১ সেপ্টেম্বর সকাল পৌনে নটায় নিউইয়র্ক থেকে সড়কপথে দশ ঘণ্টার পথ দূরে ডেট্রয়েট শহরে টেলিভিশনে দেখলাম একটা টাওয়ারের উপরিভাগে আগুন জ্বলছে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে। দেখতে দেখতেই আর একটি বিমান অপর টাওয়ারে লেগে ভেঙে পড়ল এবং তা থেকেও আগুন ও ধোঁয়া উঠছে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি। ১৫ মিনিটের মধ্যেই ১১০ তলা উঁচু টাওয়ার দুটোই গলে নিচে নেমে মাটিতে ঢুকে গেল। হতবাক হয়ে গেলাম। টিভি থেকে খবরে যা জানলাম তাতে মনে হলো অলৌকিক ঘটনা। এ টাওয়ার দুটোকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইড, প্রেসটিস ও ওয়েলথের প্রতীক মনে করা হতো। এত বড় ঘটনা কেমন করে ঘটল? সন্ধ্যায় এক ডিনারের দাওয়াতে গেলাম। তিন-চারটি দেশের মেহমান ছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে চাইলে বললাম, 'এত বড় ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা ইসরাঈল ও আমেরিকা ছাড়া আর কারো নেই।'

যে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের চারটি বিমান হাইজ্যাক হলো ঐ এয়ারলাইন্সের টিকেট আমি ঢাকা থেকে নিয়ে গেলাম সস্তা হওয়ায়। ৩১ আগস্ট থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার বহু শহরে 'মুসলিম উম্মাহ-ইন-আমেরিকা'-এর সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুযায়ী আমার সফর চলছিল। এ ঘটনার পরই সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল।

জনগণের মুখে ও পত্রপত্রিকায় প্রশ্ন উঠল, বিশ্বের গোটা মহাশূন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। তাদের সামরিক কেন্দ্র পেন্টাগনে বিমান কেমন করে আঘাত হানল? আমেরিকা কি তাহলে প্রতিরক্ষায় অক্ষম? চারটি আমেরিকান বিমান আমেরিকান পাইলটই চালাচ্ছিল। বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কেন টের পেল না?

এসব প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল

আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, জনগণের এসব প্রশ্নের সদুত্তর প্রেসিডেন্ট বুশের নিকট না থাকায়ই কি কল্পিত অপরাধী আবিষ্কার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল? এত বড় ঘটনা ঘটানোর সাধ্য বিন লাদেনের থাকলে তিনি আগেই তার শত্রুর বিরুদ্ধে হয়তো তা প্রয়োগ করতেন। উপসাগরীয় যুদ্ধকে উপলক্ষ করে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি সৌদি আরবে গড়ে ওঠে। ঐ ঘাঁটিতে বোমাবিস্ফোরণে অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। এরপর সোমালিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলা হয়। এতেও লাদেনকে দায়ী করা হয়। বিন লাদেন এ দায়িত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু এ হামলা সমর্থন করেন। এ থেকেই আমেরিকা বিশ্বের সর্বত্র সন্ত্রাসী হামলার সাথে বিন লাদেনকে জড়িত করতে থাকে।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য লাদেন বাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করে বুশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা থেকে আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়। বুশ বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। তালেবান সরকার টুইন টাওয়ার হামলায় বিন লাদেন জড়িত বলে প্রমাণ দাবি করে। প্রমাণ দিতে পারলে লাদেনকে হস্তান্তর করতে রাজি তাও জানায়। প্রেসিডেন্ট বুশ ঐ ঘটনাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে দাবি করেন এবং এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ বিন লাদেনকে সাব্যস্ত করেন। লাদেনকে তাদের হাতে তুলে না দিলে আফগানিস্তানের উপর হামলার হুমকি দেন। তালেবান সরকারের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান সরকারের উপর হামলা যাতে না হয় সেজন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকার লাদেনকে ঐ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তালেবান সরকারের সাথে দু-তিন সপ্তাহ ধরে কূটনৈতিক যোগাযোগ চালায়। এতে ব্যর্থ হওয়ার পর আফগানিস্তানের উপর হামলায় পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করতে সম্মতি দিতে পাকিস্তানকে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তান তালেবান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করে।

তালেবান সরকারের বক্তব্য

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের যুদ্ধে বিন লাদেনের বিরাট অবদান রয়েছে। বিন লাদেন স্বয়ং এ জিহাদে মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর বিপুল সম্পদ ব্যয় করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের বাহানায় সৌদি আরবে আমেরিকা বিরাগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে আশ্রয় নেন। এ অবস্থায় তিনি তালেবান সরকারের সম্মানিত মেহমান।

লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা চালানোর জন্য আফগানিস্তানে বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন বলে আমেরিকার দাবি তালেবান সরকার অস্বীকার করে। এ অবস্থায় বিনা অপরাধে তাদের মেহমানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় মনে করে। তাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক চাপের মুখে ঘোষণা করে যে, ওসামা বিন লাদেন নিজের ইচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগ করলে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারা মেহমানকে তাড়াতে পারে না।

একটি সঙ্গত প্রশ্ন

বিন লাদেন নিজেকে নির্দোষ দাবি করে 'হেগ'-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে নিজেকে পেশ করলেন না কেন? ওখানে যুগোস্লাভ নেতা মিলোসেভিচের বিচার হচ্ছে। বিনা বিচারে ও বিনা দোষে সেখানে শাস্তি হয় না। তিনি একটি দেশকে এভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে কি রক্ষা চেষ্টা করতে পারতেন না? এ দেশটিকে আমেরিকার হামলা থেকে তিনি এভাবে বাঁচানোর চিন্তা করলেন না কেন? নিজের নিরাপত্তার জন্য একটি দেশকে বলি হতে দিলেন কেন?

এ প্রশ্নের জওয়াবে কেউ-ই বলতে পারেন না যে, লাদেন আফগানিস্তান থেকে সরে গেলেও তার সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ধ্বংসের দোহাই দিয়ে আমেরিকা সেখানে হামলা চালাত না। এটা তখন অবশ্য সহজ হতো না। পাকিস্তান নিজের স্বার্থেই হয়তো তালেবান সরকারকে

রক্ষার জন্য কথিত নেটওয়ার্ক বন্ধ করার ব্যবস্থা করত। জাতিসংঘের মিশনকে দিয়ে তদন্ত করার দাবি জানানো সম্ভব হতো। যা হোক, যা ঘটে গেল এর পরিণাম কী?

আফগানিস্তানে পুতুল সরকারের ভবিষ্যৎ

জাতিসংঘের সহায়তায় জার্মানির 'বন'-এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কায়েমের যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রফেসর বোরহানুদ্দীন রাব্বানীর নেতৃত্বে পরিচালিত নর্দান এলায়েন্সের হাতে দেওয়া হয়েছে। প্রফেসর রাব্বানী তালেবান সরকার কায়েম হওয়ার পর পূর্ব পর্যন্ত দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কেমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা কারো অজানা থাকার কথা নয়।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সাত দলীয় মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান দুটো দলের একটির নেতৃত্বে তিনিই ছিলেন। অপরটির নেতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার। জিহাদে রাশিয়ার পরাজয়ের পর আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে সরকার গঠনের ব্যাপারে চুক্তি হয়, তাতে কয়েক মাস একটি ক্ষুদ্র দলের নেতা মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হন। এরপর প্রফেসর বোরহানুদ্দীন রাব্বানী প্রেসিডেন্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী রাব্বানী প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে নানা বাহানায় বিলম্ব করতে থাকেন। পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে এবং সৌদী বাদশার সহযোগিতায় মক্কা শরীফে আফগান নেতাদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাব্বানী প্রেসিডেন্ট এবং হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। এরপরও রাব্বানী হেকমতিয়ারকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেননি।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামের নামে ১০ বছর এ দুই নেতা একসাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। ইসলামের জন্যই বহু পাকিস্তানি ও আরব মুজাহিদ এ যুদ্ধে শরীক হন। পাকিস্তানে মাদরাসায় শিক্ষারত বাংলাদেশী ছাত্ররাও জিহাদে শরীক হয় এবং বেশ কয়েকজন শহীদ হয়। অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় যে, উজবেক নেতা রাব্বানী ইসলামের চেয়ে গোত্রীয় স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়ে পাখতুন হওয়ার দোষে হেকমতিয়ারকে সরকারি ক্ষমতায় শরীক হতে দিলেন না। তাই রাব্বানী ৫/৬ বছর শাসনকালে রাজধানী কাবুলেও আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করতে ব্যর্থ হন।

তালেবান সরকার

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে শরীকদের মধ্যে আফগানিস্তানের মাদরাসাগুলোর ছাত্ররা অত্যন্ত মুখলিস মুজাহিদের ভূমিকা পালন করে। রাব্বানী সরকারের কুশাসনে গোটা দেশে যখন বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতায় জনগণ অতিষ্ঠ, তখন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর খাঁটি ইসলামী জযবা নিয়ে ছাত্র সমাজকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার ডাক দেন।

দশ বছর আফগান জিহাদে শরীক ছাত্র মুজাহিদ মোল্লা ওমর যুদ্ধে একটি চক্ষু কুরবানী দেন। রুশদের পরাজয়ের পর তিনি নিজ এলাকা কান্দাহারে এক মাদরাসায় শিক্ষকতা

করছিলেন। ইসলামী সরকারের বদলে গোত্রীয় সরকারের কুশাসনে অতিষ্ঠ জনগণের মধ্যে মোল্লা ওমরের ডাক সাড়া জাগায়। প্রথমে তিনি তার ছাত্র এবং আফগান জিহাদে শরীক ছাত্রদের নিয়ে কান্দাহার শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের উদ্যোগ নেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জনগণ সাড়া দেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই কান্দাহার তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

মাদরাসার ছাত্রদের 'তালেবে ইলম্' বলা হয়। এটা আরবী পরিভাষা। এর অর্থ হলো বিদ্যান্বেষী। তালেব মানে তালাশকারী বা আকাঙ্ক্ষী। ইলম্ তালাশকারীরাই তালেবে ইলম্। তালেব শব্দের বহুবচন উর্দুতে তালেবান। মোল্লা ওমর তালেবানদের নিয়েই ইসলামী হুকুমত কায়েমের সূচনা করেন। তাই তাঁর সরকার তালেবান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আফগান জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই স্বাধীন মনোভাবের লোক। সাথে অস্ত্র বহন করা তাদের অভ্যাস। রাব্বানী শাসনে জনগণ সন্তুষ্ট না থাকায় এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ায় রীতিমতো অরাজকতা সৃষ্টি হয়। জনগণ নিরাপদে থাকতে চায়। তাই কান্দাহারে মোল্লা ওমরের আবেগময় নেতৃত্বে এবং তার তালেবান বাহিনীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে জনগণ এমন সাড়া দেয় যে, মোল্লা ওমরের নির্দেশে তাদের ব্যক্তিগত সব অস্ত্র তার হাতে জমা দেয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কান্দাহার প্রদেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয়ে যায়। জনসাধারণের এটাই তো সবচেয়ে বড় এবং প্রথম দাবি। কান্দাহার তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিদ্যুৎগতিতে গোটা দেশে মোল্লা ওমরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশের প্রদেশেও ব্যাপক জনসমর্থনের খবর পাওয়া যায়। দলে দলে ছাত্র ও যুবকরা মোল্লা ওমরের তালেবান বাহিনীতে শরীক হতে থাকে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কয়টি প্রদেশ তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। রাব্বানী সরকার জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলায় এবং তারা তালেবানদের সক্রিয় সমর্থক হওয়ায় তালেবানদের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়।

হেকমতিয়ারের বিরাট বাহিনী যে এলাকায় অবস্থান করছিল তা কাবুল থেকে খুব দূরে নয়। তালেবানদের এ বিজয় অভিযানে হেকমতিয়ার পূর্ণ নিরপেক্ষতা পালন করে নীরব সমর্থনই দান করেন। এমনকি তালেবান বাহিনী যখন কাবুল দখলের জন্য এগিয়ে আসে তখন হেকমতিয়ার বাহিনী তাদের উৎসাহই দেয়। ফলে রাব্বানীর বাহিনী কাবুল থেকে পালিয়ে উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়। বিনা যুদ্ধে রাজধানী কাবুল তালেবানদের দখলে চলে আসে। মোল্লা ওমরের এ সফল গণবিপ্লব বিস্ময়কর।

উজবেক নেতা রাব্বানী ও তাজিক নেতা রশীদ দোস্তামেরা জোট বেঁধে রাশিয়া ও ভারতের সাহায্যে উত্তরাঞ্চলে টিকে থাকে এবং মাযারী শরীফকে রাজধানী বানিয়ে তালেবান সরকারকে বিব্রত করতে থাকে। এক সময় তালেবানরা মাযারী শরীফও দখল করে নেয়। দেশের ৯৫ ভাগ তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পরও গণধিকৃত রাব্বানী-দোস্তাম জোট ইসলামের চরম দুশমনদের পুতুল হিসেবে টিকে থাকে। আফগানিস্তানের উত্তরে পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান ভাষা

ও গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে রাব্বানী-দোস্তাম জোটকে সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়া ও ভারতের এত সহযোগিতা সত্ত্বেও এ জোট যা 'নর্দার্ন এলায়েন্স' নামে এখন পরিচিত, তালেবান সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনো এলাকাই তাদের দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। এখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর চাপিয়ে দেওয়া চরম অন্যায় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমেরিকার পুতুল সরকার কাবুলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাব্বানীরা আফগানিস্তানে রাজত্ব করার যে স্বপ্ন দেখছে তা কি কখনো জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে?

তালেবান সরকারের মূল্যায়ন

তালেবান সরকারের সামগ্রিক নেতৃত্ব দিয়েছেন মাদরাসায় পড়া ওলামায়ে কেরাম। তাদের ঈমান ও ইখলাস প্রশ্নাতীত। মোল্লা ওমর ও তার সাথীগণ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করেননি। সত্যিকার ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার জন্যই তারা সরকার গঠন করেছিলেন। তাই তারা আল্লাহ তাআলার অলৌকিক সাহায্য ও জনগণের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিলেন। হেকমতিয়ার বাহিনীতে যেমন ইসলামপন্থি অনেক আধুনিক শিক্ষিত লোক ছিল, তালেবানদের মধ্যে যদি তা থাকত তাহলে মাদরাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষিতদের সমন্বয়ে আফগানিস্তানে একটি আধুনিক ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হতো। কারণ ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইলম ও হিকমত অপরিহার্য। এদিক দিয়ে তালেবান সরকার পরিচালকদের মধ্যে হেকমতের অভাব ছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

গত শতাব্দীর শেষ দু'দশকের মধ্যে প্রথমে ইরানে, এরপর সুদানে এবং সর্বশেষে আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার কায়েম হয়। ১৯৯৯ সালে লন্ডন ও নিউইয়র্কে বিশ্বের বেশ কয়টি দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগে আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের একটা ডেলিগেশন ঐ তিনটি দেশে সফর করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম করতে গিয়ে তারা যদি সফল হন তাহলে যত দেশে 'ইকামাতে দীনের' আন্দোলন সক্রিয়, সেসব দেশেও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি তারা ইসলামকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হন, তাহলে গোটা বিশ্বের সব দেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে।

তাই এমন একটি ডেলিগেশন এসব দেশে গেলে জানা যাবে যে, তারা ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য বাস্তবে এমন কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন যা যথার্থ এবং এমন কিছু করা হচ্ছে কিনা যার ফলে ইসলামের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে ক্ষুণ্ন হতে পারে। এ ধরনের ডেলিগেশনকে তারা অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। তাদের সঠিক পদক্ষেপসমূহকে ডেলিগেশন বিশ্বময় প্রচার করলে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং তাদের ভুলটুকু দরদের সাথে ধরিয়ে দিলে তারা এর গুরুত্ব দেবেন। এটা করতে পারলে ডেলিগেশনের পরামর্শ ভবিষ্যতেও তারা চাইবেন।

দুঃখের বিষয় এ প্রস্তাবটিকে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও এ কাজটি এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বছর (২০০১) আগস্ট মাসে ইংল্যান্ডে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের

ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষনেতার সাথে সাক্ষাৎ হলে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয় কি না জানতে চাইলাম। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন যে, তারা পরামর্শকে গুরুত্ব দেন না। আমি বললাম যে, সকল নেতার একটা ডেলিগেশন গেলে অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। তিনি এ কথার সাথে একমত হলেন। ইতোমধ্যে তো আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার উৎখাতই হয়ে গেল।

ডেলিগেশন যেতে পারলে ওসামা বিন লাদেনকে রাজি করা সম্ভব হতো যে, আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে রক্ষার স্বার্থে তার সে দেশ থেকে চলে যাওয়া উচিত। মোল্লা ওমরকেও বোঝানো যেত যে, জবরদস্তি করে মহিলাদের চেহারা ঢাকতে বাধ্য করা, মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করা, বিশেষ মাপে দাড়ি রাখতে বাধ্য করা ও পাহাড়ে বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়। প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করা হলে চাপ প্রয়োগ করা ছাড়াই মহিলারা পর্দা করবে ও পুরুষেরা দাড়ি রাখবে।

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে ফিকহ্ বা আইন শাস্ত্রের নীতি হলো (গুরুত্ব বিবেচনা করে একটার পর একটা বিধান চালু করা)। এদিক দিয়ে প্রথম জরুরি কাজ হচ্ছে, জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, জনগণের বেঁচে থাকার মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, যাতে জনগণ উপলব্ধি করে যে, এ বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাহলে প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ না হলেও জনগণ সরকারের প্রতি আস্থাশীল থাকে। ইসলামী সরকারের তৃতীয় প্রধান দায়িত্ব হলো, নারী ও পুরুষকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ঈমান, ইলম্ ও আমলের দিক দিয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া। চতুর্থ দায়িত্ব হলো, নারী ও পুরুষ সবার অধিকার রক্ষার জন্য সর্বস্তরে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম দায়িত্ব হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা সরকারি উদ্যোগে চালু করা এবং যা ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত করা।

ঐ তিনটি সরকারের মধ্যে ইরান ও সুদান এ দিক দিয়ে যতটুকু ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে, তালেবান সরকার তা করতে পারেনি। না পারার প্রধান কারণ হলো, হিকমাতের অভাব। দ্বিতীয় কারণ হলো, রাব্বানী-দোস্তামদের সর্বাত্মক বিরোধিতা। সরকারকে সব সময় যুদ্ধাবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। তৃতীয় কারণ হলো, তালেবান সরকার পাকিস্তান ও সৌদি আরবের স্বীকৃতি ছাড়া জাতিসংঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো, এমনকি মুসলিম দেশগুলোরও স্বীকৃতি পায়নি। বিন লাদেন ইস্যুতে তালেবান সরকারের একগুঁয়েমির ফলে সৌদি আরব এবং পাকিস্তানও বিরূপ হয়ে আমেরিকার হামলায় আপত্তি করেনি। তালেবান সরকার একঘরে হয়ে আন্তর্জাতিক মহা সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হলো, আর ওআইসিসহ সকল মুসলিম দেশ নীরবে তামাশা দেখল। অবশ্য মুসলিম জনতা সকল গণতান্ত্রিক দেশে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আফগানিস্তানে ইসলামের ভবিষ্যৎ

জাতিসংঘ ও ইঙ্গ-মার্কিন চক্র হয়তো আশা করে যে, তাদের পুতুল সরকার সে দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে এবং তাদের নির্দেশ মতো দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা আফগানিস্তানে দীর্ঘকাল অশান্তি জিইয়ে রাখারই ব্যবস্থা করল। বৃহত্তর পাখতুন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যে সরকারে অনুপস্থিত, সে সরকার কী করে সফল হবে? তাদের পুতুল সরকার সে দেশে নির্বাচনের প্রহসনও করতে সাহস করবে কি? আফগানিস্তান এখন থেকে দিল্লি ও মস্কোর নির্দেশেই চলবে। আমেরিকা সেখানে খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করবে।

এ পরিস্থিতি স্বাধীনতাপ্রিয় আফগান জনগণ কতদিন বরদাশত করবে? ইসলামী আন্দোলন জনগণের আস্থা হারায়নি। যথাসময়ে আবার ইসলামী শক্তি সংগঠিত হয়ে পুতুল সরকারকে রুখে দাঁড়াবে। সেখানে তুরস্ক ও আলজিরিয়ার মতো সুসংগঠিত ধর্মনিরপেক্ষ সেনাবাহিনী নেই।

রাব্বানীদের বাহিনী আগেও ব্যর্থ হয়েছে, আবারও হবে

তালেবান সরকার দেশ গড়ার কাজ করার সুযোগ পায়নি। অন্যায়ভাবে আমেরিকার পরাশক্তি সে সরকারকে উৎখাত করেছে বলেই সে দেশের জনগণ নিজ চোখে দেখল। জনগণ তালেবানদের ব্যর্থ মনে করছে না। তাদের পূর্ণ সমর্থন এখনো বহাল আছে। তাই আজ হোক কাল হোক এ আগুন এক দিন পুতুল সরকারকে উৎখাত করে ছাড়বে, ইনশাআল্লাহ।

পাকিস্তানই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো

আফগানিস্তানে এ ট্র্যাজেডির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো পাকিস্তান। আর সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো ভারত। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকেই আফগানিস্তানের বাদশাহ জহীর শাহ ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাখতুনিস্তান কায়েমের ষড়যন্ত্র করে। সীমান্ত গান্ধী নামে কুখ্যাত গাফফার খানের নেতৃত্বে পশতুভাষী পাঠানদের বিদ্রোহী বানানোর অপচেষ্টা চলে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করে নজীবুল্লাহর পুতুল সরকার কায়েমের পর আফগানিস্তানের ইসলামপন্থি ছোট-বড় সাতটি দলকে পাকিস্তান সরকার সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় দেয়। পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকায় তারা ১০ বছর জিহাদ করে রাশিয়াকে পরাজিত করে। এরপর থেকে কাবুলের প্রতিটি সরকার পাকিস্তানের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে, বিশেষ করে তালেবান সরকার পাকিস্তানের সাহায্যেই টিকেছিল।

২৫ বছর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার আফগানিস্তানের জন্য যে বিরাট কুরবানী দিল তা ভেস্তে গেল। এখন কাবুলে পাকিস্তানের চরম বৈরী এবং ভারতের পুতুল সরকার কায়েম হলো। জেনারেল মোশাররফ আফগান ইস্যুতে পাকিস্তানের জনগণের আস্থা হারালেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর প্রভাব কতটুকু পড়বে তা দেখার বিষয়। উপমহাদেশে

ভারতের শক্তি বৃদ্ধি পেল। কাশ্মীরে ভারত আরো হিংস্র ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে, এমনকি আযাদ কাশ্মীরেও ভারত সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ভাবনার বিষয়

তালেবান সরকারের পতনের ফলে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন দু'দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলো। একদিক হলো এই যে, ইরান ও সুদানে ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ায় বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন প্রেরণাবোধ করেছিল, তালেবান সরকারের পতনে ঐ প্রেরণা বিরাট এক ধাক্কা খেল। অপরদিকে মহিলাদের ব্যাপারে তালেবানদের পলিসিকে ব্যবহার করে বিশ্বের ইসলামবিরোধী মাস-মিডিয়া ইসলামকে নারী অধিকারবিরোধী হিসেবে প্রোপাগান্ডা করার বিরাট সুযোগ পেয়ে গেল। তালেবানরা ইসলামী শাসনের যেটুকু সুফল জনগণকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বিশ্ববাসী জানতেই পারল না। ফলে নতুন করে কোনো দেশে ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এ ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ইরান ও সুদানকে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা প্রয়োজন, যাতে তালেবান সরকারকে ইসলামের প্রতিনিধি দেখিয়ে ইসলামকে হেয় করার সুযোগ যারা নিচ্ছে তাদের হামলা থেকে সত্যিকার ইসলামকে রক্ষা করা যায়।

তা ছাড়া গণতান্ত্রিক যেসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে, সেসব দেশের ইসলামী আন্দোলন যাতে ক্ষমতাসীন হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আরো কয়েকটি দেশে ইসলামী সরকার কায়েম হলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বের দরবারে ইসলামের সত্যিকার কল্যাণময় রূপ বাস্তবে তুলে ধরা সহজ হবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়ায় পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যও ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা আবারও ইসলামের মানবিক ও নৈতিক সভ্যতার নিকট পরাজিত হতে পারে, যদি ইসলামের আসল রূপ বাস্তবে কায়েম করে দেখানো যায়।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।